মহাস্থবির জাতক

(চতুর্থ পর্ব)

"মহাস্থবির"

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭

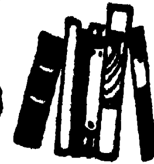
প্রথম সংস্করণ :
৭ই আষাঢ়,
১৮৯১ শকাব্দ

ছয় টাকা

প্রচ্ছদসজ্জা :
বিশ্বনাথ দাস

প্রকাশক : শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়,
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭

মুদ্রাকর : শ্রীত্রিদিবেশ বসু,
কে. পি. বসু প্রিন্টিং ওয়ার্কস্,
১১, মহেন্দ্র গোস্বামী লেন, কলিকাতা-৬



উপহার দিলুম

[illegible]



নিবেদন

'মহাস্থবির জাতক'-এর চতুর্থ পর্ব প্রকাশিত হল। এইটিই শেষ পর্ব। প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর মৃত্যুর পর তাঁর সম্বন্ধে যেসব কথা লেখা হয়েছে তার মধ্যে একটি কথা এই যে, তিনি 'মহাস্থবির জাতক' সম্পূর্ণ ক'রে যেতে পারেননি। এ-কথা কিন্তু একেবারেই ঠিক নয়। অবশ্য তাঁর মৃত্যুকালে 'মহাস্থবির জাতক'-এর চতুর্থ পর্ব পাণ্ডুলিপি-আকারেই আমার কাছে ছিল। এই পাণ্ডুলিপি থেকে কিছু কিছু অংশ 'শারদীয়া দেশ' ও 'শনিবারের চিঠি' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় এবং পরে 'দেশ'-পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে সম্পূর্ণ চতুর্থ পর্ব প্রকাশিত হয়। চতুর্থ পর্ব লেখবার সময় প্রায় দশবছর কাল তিনি ব্যাধিতে শয্যাশায়ী ছিলেন। সেই সময় প্রতিদিন সন্ধ্যার পর তাঁর কাছ থেকে মুখে-মুখে শুনে, আমি চতুর্থ পর্বের কথা লিপিবদ্ধ ক'রে নিতুম ও পরে তাঁকে প'ড়ে শোনাতুম। এই পর্বের প্রথম-দিকের কিছু অংশ তিনি স্বহস্তেই লিপিবদ্ধ করেছিলেন। কিন্তু পরে আর তাঁর কলম ধরবার মতো জোর আঙুলে ছিল না ব'লে মুখে-মুখেই তিনি ব'লে যেতেন। এই সময়ে তাঁর শারীরিক বৈকল্য এমন ছিল যে, তাঁর সমস্ত চিঠিপত্রও আমাকেই লিখে দিতে হ'ত—তিনি কোনোমতে কখনো নিজে সই করতেন, কখনো-বা আমাকেই নামটা বসিয়ে দিতে বলতেন। 'মহাস্থবির জাতক' প্রথম পর্ব যখন লেখা হচ্ছিল তখন একদিন কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন যে, পঁচিশবছর বয়স পর্যন্ত সময়ের কথাই তিনি লিপিবদ্ধ করবেন। কিন্তু কিছুদিন পরেই তিনি সে-ইচ্ছা পরিত্যাগ করেন। এমনকি এই পর্বের শেষের দিকের 'সুভগার কাহিনী'-টিও তাঁর লেখবার ইচ্ছা ছিল না, আমার আগ্রহাতিশয্যেই এই কাহিনীটি তিনি লিপিবদ্ধ করেন। তৃতীয় পর্বের মতন এই পর্বেরও প্রেস-কপি আমি তৈরি ক'রে দিয়েছি। এই পর্বটি তিনি আমাকে উৎসর্গ করবেন—বলেছিলেন, এবং লিখেও রেখে গেছেন। তাঁর হাতের লেখার একটি প্রতিলিপি (ব্লক্) উৎসর্গ-পত্রে মুদ্রিত হল। প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর আশ্চর্যসুন্দর 'মহাস্থবির জাতক' সম্পূর্ণাঙ্গরূপে রসিক পাঠকসমাজের সম্মুখে ধ'রে দেবার দুর্লভ সৌভাগ্যলাভ করার সুযোগ পেয়ে নিজেকে কৃতার্থ ব'লে মনে করছি।

উমা দেবী

অন্ধকার!

সম্মুখে অন্তহীন অন্ধকার সমুদ্র, মাথার ওপরে অনন্ত অন্ধকার আকাশ। আমার অন্তরেও অন্ধকার, নিবিড় অন্ধকার।

সমুদ্রে বড় ঢেউ নেই, ছোট ছোট ঢেউ এসে তটভূমিতে লাগছে; কিন্তু ঢেউ ছোট হলেও তার বুকজোড়া হাহাকার চলেছে অখণ্ড নিরবচ্ছিন্ন—স্তব্ধ গম্ভীর আকাশ লক্ষ কোটি চক্ষু মেলে অনিমেষে চেয়ে আছে নিচের দিকে। আমার পেছনে বিশাল নগরীর সহস্র রকমের শব্দ—একত্রে মিশে একটা অদ্ভুত ধ্বনি আকাশের দিকে উঠছে গম্‌গম্‌ ক'রে। সমুদ্রের হাহাকারের সঙ্গে সে আওয়াজ মিশে ওঙ্কারধ্বনিতে পরিণত হচ্ছে। সমুদ্রের কালো জলের মধ্যে চকচক ক'রে ভেসে বেড়াচ্ছে বিন্দু-বিন্দু আলোর স্ফুলিঙ্গ, দিগন্তব্যাপী নিবিড় নিরাশার অন্ধকারে যেন ক্ষণস্থায়ী আশার ক্ষীণ জ্যোতি। সমুদ্র যেন আমারই মনের মুকুর, আমারই মন যেন মূর্ত হয়ে উঠেছে এখানে।

আমার একটু দূরেই বন্ধু পরিতোষ ও কালীচরণ ব'সে আছে।

পাঠক-পাঠিকা হয়তো ইতিমধ্যেই বলতে আরম্ভ করেছেন, বাপু হে! অত ভণিতা করবার আর প্রয়োজন নেই। বুঝতে পারা গেছে তুমি আবার ভেগেছ! কিন্তু জিজ্ঞাসা করি বাপু, তোমার কি লজ্জা নেই! এত দুঃখকষ্ট পেয়ে আবার ভাগলে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনারা ঠিকই অনুমান করেছেন।

কিন্তু বৃহৎ বিচিত্রলোকের মধ্যে যে কিছুদিন কাটিয়েছে, সেখানকার দুঃখ-শোক হাসি-অশ্রু, অনির্দিষ্ট জীবনযাত্রার উত্তেজনার ঢেউ খাওয়ায় যার একবার মৌতাত ধ'রে গিয়েছে তার পক্ষে সুখে ঘরে ব'সে, নির্দিষ্ট সময়ে চারবার আহার ক'রে কিংবা গাড়ি-ঘোড়া চ'ড়ে প্রাসাদে বাস ক'রে রাজভোগও অতি তুচ্ছ। তার ওপরে, অতীতকালে আমার মতন অনেক ভাগ্যান্বেষী জীবনে সফলকাম হয়েছেন তারও নজীর রয়েছে। এই নজীরগুলিই সর্বনাশা—সৃষ্টি-কর্তার সবচেয়ে বড় প্যাঁচ এইখানে। ঘোড়দৌড়ের মাঠে গিয়ে সব লোকই

যদি সর্বস্বান্ত হয়ে বাড়ি ফিরত তা হ'লে ঘোড়দৌড়ের মাঠ পরদিন থেকে শ্মশানভূমিতে পরিণত হত। কিন্তু ওরই মধ্যে ঐ যে দু'-চারজন কিছু অর্থ নিয়ে বাড়ি ফেরে, তারই প্রেরণায় আজও সেখানে ঘোড়া ছুটছে, সঙ্গে সঙ্গে মানুষও ছুটছে। এই প্যাঁচের জোরেই সারা পৃথিবী চলেছে। দার্শনিকেরা এরই একটা ভদ্র নামকরণ করেছেন 'লীলা'। আজ্ঞে, এই প্যাঁচ অথবা লীলার পাল্লায় প'ড়ে আবার আমায় ভাগতে হল।

স্বদেশীর সময় নানারকম দেশী জিনিস আবিষ্কৃত হয়েছিল। দেশাত্মবোধের ঠেলায় প'ড়ে সে-সময় দু'-একজনকে দেশলাই-এর বদলে চকমকি পর্যন্ত ব্যবহার করতে দেখেছি। এইরকম সব স্বদেশী দ্রব্যের দোকানে দোকানে পাড়া একেবারে ভরে গিয়েছিল। এরই মধ্যে এক দোকানে চাকরি করত কালীচরণ।

দোকানে বিক্রি-বাটা কিছুই ছিল না বললেই হয়। খরচের মধ্যে ছিল কালীচরণের মাইনে, রাত্রি ন'টা অবধি গ্যাসের আলো আর দৈনিক দু'-আনা ক'রে ফৌজদারী বালাখানার তামাক। ব্যবসার মূলধন ছিল যৌথ, মালিকেরা ছিলেন দেশপ্রাণ। তাঁরা ভেবে রেখেছিলেন প্রথম তিন-চার বছর লোকসান হবার পর ব্যবসা জোর চলবে। কাজেই ঐ সামান্য খরচকে তাঁরা গ্রাহ্য করতেন না।

এই কালীচরণের দোকানে ছিল আমাদের আড্ডা। আড্ডার প্রধান আকর্ষণ ছিল তাম্রকূট-সেবন।

কালীচরণের চেহারাটিকে তিলোত্তমার উল্‌টোপিঠ বলা যেতে পারত। কারণ বিধাতা তিল তিল ক'রে কুৎসিত সংগ্রহ ক'রে কালীর দেহটিকে তৈরি করে-ছিলেন। সেই বয়সেই কপালের দুই কোণ ঘেঁষে টাক পড়তে শুরু করেছিল। চোখ-দু'টো গর্তে ঢোকা, খ্যাবড়া নাক, দাঁত এমন ক'রে বার করা যে ছোট ছেলেপিলে দেখলে আঁতকে উঠত। তার ঊর্ধ্বমুখী অধরে ছিল একজোড়া অদ্ভুত গোঁফ। সাধারণত মানুষের গোঁফ নিচের দিকে ঝোলে; কিন্তু কালীর গোঁফ ছিল সিধে—যেন সামনের দিকে ছুটে চলেছে। সেই অদ্ভুত গোঁফের ওপর কালীর অসাধারণ মমতা ছিল। আমরা বলতুম—কেলো, গোঁফটা কামিয়ে ফেল।

কালী শিউরে উঠে বলত—ওরে বাস্‌রে! বলিস কি!

গোঁফ-জোড়ার প্রতি এমন মমতার কারণস্বরূপ সে বলত—এইরকম গোঁফেই মেয়েমানুষ fallen হয়।

কালীর দোকানের সংলগ্ন রাস্তার দিকে একটা চওড়া বারান্দা ছিল। বিকেলবেলা এই বারান্দা ঝাঁট দিয়ে, জল ছিটিয়ে কালী রাস্তার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকত—হাজার ডাকাডাকি করলেও সে ভেতরে আসতে চাইত না। একদিন শোনা গেল কালীবাবু রোজ বিকেলে ওখানে দাঁড়িয়ে গোঁফের জালে মেয়েমানুষ আটকাবার চেষ্টা করেন। বলা বাহুল্য যে সে-যুগে বৃদ্ধা ও অতিবৃদ্ধা চাকরাণী ছাড়া কলকাতার পথে অন্য বয়সের মেয়ে প্রায় দেখাই যেত না।

কালীর আর একটি গুণ ছিল যার জন্যে আমাদের দলের সকলেই তাকে খাতির করত। সে তামাক টেনে কলকে ফাটিয়ে দিতে পারত। নতুন কলকে হ'লে তো কথাই নেই—বাজি রেখে সে পুরোনো কলকেও ফাটিয়ে দিয়েছে এমন দৃশ্য একাধিকবার আমরা দেখেছি। কিন্তু সৃষ্টিকর্তা সেই কুৎসিত আবরণের মধ্যে এমন একটি সুন্দর অন্তঃকরণ দিয়েছিলেন যার জোড়া জীবনে অতি অল্পই দেখেছি। সরল, মহাপ্রাণ, উদার, পরদুঃখকাতর কালীকে এইসব গুণের জন্য আমরা সকলেই ভালবাসতুম।

কালীচরণ এর পরে কলকাতার এক সওদাগরী আপিসে ভালো চাকরি করত। চাকরিতে বেশ উন্নতি করলেও সাংসারিক জ্ঞান তার একেবারে ছিল না বললেই চলে। বছর দশেক চাকরি করার পর বিয়ে ক'রে চাকরি ছেড়ে দিয়ে সে চলে গেল শ্বশুরবাড়ির গ্রামে। তাও একরকম ছিল ভালো; কিন্তু হঠাৎ তার বড় লোক হবার ইচ্ছা এমন প্রবল হল যে নিজেদের পৈতৃক এজমালী বাড়ি বিক্রি ক'রে নিজের অংশে দশ-পনেরো হাজার যা পেলে তাই দিয়ে চাষবাস করতে শুরু ক'রে দিলে। ব্যস্—আর কি! যেটুকু বাকি ছিল তাও হয়ে গেল। যে-যুগে চাষারা লাঙল ছেড়ে কলম ধরছে সেই যুগে আমাদের কালীবাবু কলম ছেড়ে লাঙল ধরলেন। অবশ্যম্ভাবী ফল ফলতে দেরি হল না। বাড়িবেচা টাকা শরতের মেঘের মতন কিঞ্চিৎ হাঁকডাক ক'রে হাওয়ায় উড়ে গেল। বছর তিন-চারেকের মধ্যে তিন-চারটি ছেলেমেয়ে নিয়ে একদম পথে এসে দাঁড়াল।

মাঝে আর তার সঙ্গে দেখা হয়নি। তেরশ' পঞ্চাশ সালের দুর্ভিক্ষের সময় গ্রীষ্মকালে একদিন পথে দেখা। বললে—দুর্দশার আর সীমা নেই। এখানকার এক প্রেসে টাইপিস্টের কাজ করি, মাইনে ত্রিশ টাকা। সকালবেলা যেদিন জোটে ফেনা-ভাত খেয়ে গ্রাম থেকে পাঁচ মাইল দূরে হেঁটে গিয়ে ট্রেন ধরি। ট্রেন এসে থামে হাওড়ায় বাঁধাঘাট না কোথায়—যেখান থেকে আপিস পাঁচ মাইল হবে—

নিত্য এই দশ মাইল হাঁটা। চালের দাম ত্রিশ টাকা মণ, কোনোদিন অন্ন জোটে, কোনোদিন জোটে না।

আর একদিন, বোধহয় সেদিন শনিবার, পথে কালীর সঙ্গে দেখা, সর্বাঙ্গ দিয়ে কালঘাম ছুটছে, একেবারে নুয়ে পড়েছে। কালীকে বললুম—তোকে পয়সা দিচ্ছি, ট্রামে ক'রে যা।

কালী বললে—ট্রামে যাবার দরকার নেই, তোর কাছে কয়েকটা টাকা যদি থাকে তো দে, চাল কিনব।

পকেটে যা ছিল বের ক'রে তার হাতে দিলাম। সেগুলো পকেটে পুরে কিছুক্ষণ এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল। জিজ্ঞাসা করলুম —কি রে, কি দেখছিস?

কোনো কথা না ব'লে সে আবার মন্থর গতিতে পা টেনে টেনে তার গন্তব্য-স্থানের দিকে অগ্রসর হল। এরপর আর তার সঙ্গে দেখা হয়নি। আমার পয়সায় কেনা চাল বোধহয় সে হজম করতে পারলে না।

এই কালীকে আমরা 'বাবা কালী' ব'লে ডাকতুম।

সে-সময় স্বদেশী আন্দোলনের উত্তেজনায় কিঞ্চিৎ ভাঁটা পড়েছে। নীতি-শিক্ষা দেবার জন্য যেসব ইস্কুল, কলেজ, ইউনিভারসিটি প্রভৃতি হয়েছিল সেগুলি উঠে গিয়েছে। ছাত্ররা সব মাকু হাতে ক'রে কলকাতা ও বাংলাদেশময় ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওরই মধ্যে যাদের ঘরে কিছু পয়সা ছিল তারা তাঁতের কারবার ক'রে তা ফুঁকে দিয়ে অন্যত্র চাকরির চেষ্টা করছে। নেতাদের মধ্যে যাঁরা ছেলেদের তাঁতের কাজ শেখাবার জন্য উৎসাহী ছিলেন তাঁরা নিজেদের ভ্রম বুঝতে পেরে মাথায় হাত দিয়ে ব'সে পড়েছেন।

ওদিকে বোম্বাই প্রদেশে একটার পর একটা কাপড়ের কল বেড়েই চলল।

আমার বন্ধু পরিতোষ তখন তাঁত-বিদ্যালয় থেকে ডবল-অনার্স নিয়ে বেরিয়ে কোথাও কিছু সুবিধে করতে না পেরে সারাদিন কালীর দোকানে তামাক পোড়াচ্ছিলেন। এইখানে আমরা দু'জনে ব'সে নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আলোচনা করতুম। শীগ্‌গিরই যে আবার ভাগ্য-অন্বেষণে বেরুতে হবে তা ঠিকই হয়ে গিয়েছিল, বাকি ছিল কিঞ্চিৎ পাথেয়-সংগ্রহের। আমাদের আলোচনা ও পরামর্শ খুব গোপনে চললেও কালী কিরকম ক'রে টের পেয়ে গেল। কালীকে

বললুম—খবরদার, এ-কথা যদি আর কেউ জানতে পারে তো এই থেলো হুঁকো তোমার মাথায় ভাঙব।

কালী প্রতিশ্রুতি দিলে যে অন্তত আমরা যাবার আগে পর্যন্ত এ-কথা সে গোপনে রাখবে। তখন থেকে কালীর সামনেই আমাদের পরামর্শ ও আলোচনা চলতে লাগল। সে-সময় কালীর গ্রহচক্র নিশ্চয় খুবই খারাপ ছিল। একদিন সে বললে—ভাই, আমাকেও এবার তোদের দলে নে।

—তথাস্তু! শুভ দিনক্ষণ দেখে একদিন তিন বন্ধু মিলে আবার দুর্ভাগ্যের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়া গেল—এবারকার লক্ষ্যস্থল বোম্বাই শহর।

তাঁতের ইস্কুল শুধু যে বাংলাদেশের ছেলেমেয়েদেরই গোল্লায় যাবার পথ পরিষ্কার করেছিল তা নয়, বাংলার বাইরের অনেক প্রদেশের অনেক বাঙালী ছেলেও এইসব তাঁত-ইস্কুলে কাজ শিখতে এসেছিল। এদের মধ্যে এলাহাবাদের দু'টি ছেলের সঙ্গে আমাদের পরিতোষের খুব ভাব হয়েছিল এবং তাদের সঙ্গে ওর পত্র-বিনিময়ও চলত। ঠিক ছিল বোম্বাই যাবার মুখে এদের ওখানে আমরা দিনকতক কাটিয়ে যাব।

যথাসময়ে এলাহাবাদে বন্ধুদের ওখানে গিয়ে তো ওঠা গেল। তারা খুবই খাতির-যত্ন করলে। বন্ধুদের বাড়ি ছিল সেখানকার এক বিখ্যাত বাঙালী-পাড়ায়। সারা দুপুর ঘুমিয়ে বিকেলে ফুটবল খেলতে যাওয়া গেল। সন্ধ্যেবেলা অনেকে মিলে বেশ জমাট আড্ডা দেওয়া গেল। গান-টানও বাদ গেল না। সকলের অনুরোধে স্থির করা গেল যে আমরা সেখানে অন্তত সপ্তাহখানেক থেকে যাব।

বোধহয় দিন-তিনেক কাটবার পর একদিন রাত্রে বন্ধুদের বাড়িতে ব'সে তাসখেলা হচ্ছে এমন সময় জন-দুয়েক ভদ্রলোক এসে আমাদের বন্ধু অর্থাৎ আমরা যার বাড়িতে অতিথি ছিলুম তাকে ডেকে একটু দূরে নিয়ে গিয়ে কি-সব বলতে লাগল। দেখলুম তারা কথা বলতে বলতে মাঝে মাঝে আমাদের দিকে তাকাতে লাগল। কিছুক্ষণ বাদে বন্ধুবর এগিয়ে এসে আমাকে বললে—একবার এঁদের সঙ্গে যাও তো!

জিজ্ঞাসা করলুম—কোথায়?

—এই একটু এঁদের বাড়ি।

—কেন?

এরই মধ্যে একজন প্রিয়দর্শন যুবক এগিয়ে এসে আমাকে বললেন—এই একটু আমাদের বাড়ি—বেশী দূরে নয়, এই এখানেই।

ব্যাপারটা বিশেষ সুবিধের নয় বুঝতে পেরে আমি ইতস্তত করছি দেখে ভদ্রলোকটি আমায় আশ্বাস দিয়ে বললেন—তোমার কোনো ভয় নেই।

ইতিমধ্যে যে বন্ধুর বাড়ি আমরা অতিথি হয়েছিলুম সে আমাকে আলাদা ডেকে নিয়ে বললে—যাও না, ভয় কি! কিছু হ'লে আমরা তো রয়েছি।

এদিকে পরিতোষ ও কালী দু'জনেই বললে—যা না, ভয় কিসের! আমরা তো আর খুন ক'রে আসিনি।

খুব শঙ্কিত মনে ভদ্রলোকের সঙ্গে চললুম। কি জানি কোথায় লোকটি নিয়ে যাবে, কার সামনে নিয়ে গিয়ে ফেলবে—চলতে চলতে মনের মধ্যে খালি এই চিন্তা খোঁচা দিতে লাগল।

এলাহাবাদের পুরোনো বাঙালীপাড়া—প্রায় কলকাতারই একটা পাড়ার মতন। এ-গলি ও-গলি দিয়ে শেষকালে আমরা একটা বাড়ির মধ্যে ঢুকলুম। বাড়ির দরজায় দু'টি-তিনটি ছোট ছেলেমেয়ে দাঁড়িয়ে ছিল—তারা যেন আমাদের জন্যই অপেক্ষা করছিল। আমরা দরজা পেরিয়ে বাড়ির মধ্যে ঢোকামাত্র তারাও নিজেদের মধ্যে গুজগাজ করতে করতে আমাদের পেছু পেছু আসতে লাগল। আমরা সিঁড়ি দিয়ে উঠে একটা ঢাকা বারান্দা পেরিয়ে বেশ বড় একটা ছাতে এসে পৌঁছলুম। ভদ্রলোক এখানে এসে দাঁড়িয়েই বড় গলায় বললেন—কৈ রে, এখানে একটা বসবার জায়গা-টায়গা দিস্‌নি?

বলামাত্র দু'টি ছোট ছেলে একখানা শতরঞ্চি নিয়ে এসে পেতে দিয়ে চলে গেল। সঙ্গের ভদ্রলোকটি বললেন—বোসো ভায়া।

আমি বসতেই ভদ্রলোকটি বললেন—তুমি বোসো, আমি এখুনি আসছি।

ব'সে পড়লুম। একটু পরেই একজন বালিকা একটি হ্যারিকেন-লণ্ঠন এনে আমার সামনে রেখে চ'লে গেল।

ভাবতে লাগলুম"—ব্যাপারটা যে ক্রমেই রহস্যময় হয়ে উঠছে। ভাবছি আর চারদিক দেখছি এমন সময় সমবেত নারী-কণ্ঠের গুঞ্জন কানে আসতে সামনের দিকে চেয়ে দেখি যে ছাতের একদিকে প্রায় হাত-কুড়ি-পঁচিশ দূরে অনেকগুলি নারী দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাদের মধ্যে বৃদ্ধা প্রৌঢ়া আধেড়া তরুণী বালিকা—সব বয়সেরই মেয়ে রয়েছে। সেই স্বল্পালোকেই নজরে পড়ল প্রায় পঁচিশ জোড়া চোখের দৃষ্টি আমার প্রতি নিবদ্ধ রয়েছে। এই চোখগুলির মধ্যে একজোড়া চোখের দৃষ্টি আজও আমার স্মৃতির ভাণ্ডারে সঞ্চিত রয়েছে।

তার মুখখানা আমার অস্পষ্ট মনে পড়ছে। সুন্দর বিষাদক্লিষ্ট অবসন্ন মুখ।

মাথার চুলগুলো রুক্ষ, কয়েকগাছা চুল চোখ-মুখের ওপরে এসে পড়েছে। উদ্বেগাকুল সজল চোখে সে আমার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে। আমি অবাক হয়ে সেই চোখ-দু'টির দিকে চেয়ে আছি সেও আমাকে দেখছে। এমন সময়ে এক বর্ষীয়সীর কণ্ঠস্বর শুনতে পেলুম—যাও না বউমা, এগিয়ে গিয়ে দেখ।

এই নির্দেশ পেয়ে মেয়েটি ধীর পদক্ষেপে একেবারে আমার সামনে এসে দাঁড়াল। মেয়েটির বয়স বাইশ-তেইশের বেশি হবে না। কয়েক সেকেণ্ড তার মুখের দিকে চেয়ে আমি মুখ অন্যদিকে ফিরিয়ে নিলুম। সঙ্গে সঙ্গে চিকারার তারের স্বরের মতন একটি করুণ কণ্ঠস্বর কানে এল—পণ্টু—পণ্টু ভাই—

আবার তার মুখের দিকে চাইতেই সে ছোট্ট একটি 'না' ব'লে ফিরে ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে সেই নারীদলের মধ্যে মিলিয়ে গেল।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ছাত হয়ে গেল ফাঁক।

যে ভদ্রলোক আমাকে সেখানে নিয়ে গিয়েছিলেন, একটু পরেই তিনি এসে বললেন—চল ভায়া, মিছিমিছি তোমাকে কষ্ট দেওয়া হল।

কথায়-বার্তায় বুঝতে পারা গেল, যে-তরুণীটি ঐরকম আগ্রহ-ভরা দৃষ্টি নিয়ে আমাকে দেখতে এসেছিলেন তিনি এঁরই পত্নী। শুনলুম তাঁর স্ত্রীর বাপের বাড়ি কলকাতার কোনো এক পল্লীতে। তাঁর স্ত্রীর যখন বছর-ছয়েক বয়েস সেই সময় একবছরের ভাইকে রেখে তাদের মা মারা গিয়েছিলেন। স্ত্রীর মৃত্যুতে ওদের পিতা অত্যন্ত বিব্রত হয়ে পড়লেন। বাচ্ছা মানুষ করা, চাকরি করা, সংসার দেখা—একা সব দিক সামলানো অসম্ভব বিবেচনা ক'রে অবিলম্বে তিনি নতুন সঙ্গিনী সংগ্রহ ক'রে আনলেন। কিন্তু তাতে উল্টো ফল হল। বিমাতা এসেই তাদের ভাই-বোনকে দেখ্-তাড়া দেখ্-মার শুরু করলেন। সেই বয়স থেকে মেয়েটি তার ভাইকে মানুষ করেছে। ষোল বছর বয়সে তার বিবাহ হয়, তখন ভাইটির বয়স বছর দশ। এই দশ বছর সে ভাইটিকে বিমাতার দুর্ব্যবহার, পিতার অন্যায় শাসন ও বৈমাত্রেয় ভাই-বোনদের নানা উৎপীড়ন থেকে রক্ষা ক'রে এসেছে। বিয়ের পর সে এলাহাবাদে শ্বশুর-ঘর করতে এলো বটে, কিন্তু মনটি প'ড়ে রইল সেই অসহায় ভাইটির কাছে। মাঝে মাঝে ভাইয়ের কাছ থেকে চিঠি আসত। তার সেই অসহায় অল্পবুদ্ধি ভাইয়ের ওপরে অযথা নির্যাতন চলেছে—তাকে রক্ষা করবার, তার দুঃখে সহানুভূতি জানাবার আর কেউ নেই। কতবার মেয়েটি তার ভাইটিকে চ'লে আসবার জন্যে লিখেছে—টাকা পাঠিয়ে দিয়েছে, কিন্তু তার বাবা আসতে দেননি। টাকা ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছেন।

নিজের কোনো সন্তানাদি হয়নি ; তাই নিজের হাতে মানুষ-করা ভাইয়ের প্রতি মমত্বেরও হ্রাস হয়নি, বরঞ্চ বিচ্ছেদ ও অদর্শনে দিনে দিনে বেড়েই চলেছে। ভাইটি দিদির কাছে না আসতে পারলেও নিয়মিত চিঠিপত্র লিখত এবং দিনে দিনে বিমাতার নিষ্ঠুরতা ও পিতার শাসন যে বেড়েই চলেছে সে-কথাও জানাত। কিছুদিন থেকে ভাইয়ের চিঠিপত্র বন্ধ হওয়াতে মেয়েটি খোঁজ নিয়ে জানতে পেরেছে যে, মাস-দুয়েক হল সে বাড়ি থেকে পালিয়ে কোথায় চলে গিয়েছে। পিতা ও বিমাতার নিষ্ঠুর কবল থেকে আত্মরক্ষা করবার আশায় তার অবোধ ভাই নিষ্ঠুরতর সংসারের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

আমাদের খোঁজ পেয়ে আর আমি নাকি কতকটা তার ভাইয়ের মতন দেখতে—এ-কথা জানতে পেরে আমাকে ডেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

এইসব কথা বলতে বলতে ভদ্রলোক আমাকে ডেরায় ফিরিয়ে নিয়ে এলেন। সেখানে অনেকেই আমার জন্য আগ্রহভরে অপেক্ষা করছিলেন। আমরা ফিরে আসতে আবার ঐ আলোচনা শুরু হল। সেই ভদ্রলোকটি বললেন যে, আজ দু'মাস যাবৎ তাঁর স্ত্রী দিনরাত কান্নাকাটি করছেন—খাওয়া-দাওয়া বন্ধ। অশান্তির চোটে তাঁকেও পালাই-পালাই ডাক ছাড়তে হয়েছে। ভদ্রলোক গম্ভীরভাবে ঘোষণা করলেন যে, আর কিছুদিনের মধ্যে তাঁর শ্যালকপ্রবর যদি এখানে এসে উপস্থিত না হয় তা হ'লে তাঁকেও বাড়ি ছেড়ে পালাতে হবে।

কিছুক্ষণ কথাবার্তা ব'লে ভদ্রলোক চ'লে গেলেন। তারপর একে একে আড্ডার সকলে চ'লে যাবার পর আমি কালী ও পরিতোষকে বললুম—বন্ধু, এখানে থাকা আর সমীচীন ব'লে বোধ হচ্ছে না। এলাহাবাদে আরো অনেক বাঙালী বাস করেন, তাঁদের মধ্যে নিশ্চয় আমাদের চেনা লোক বেরিয়ে পড়বে। আজকে একটা ফাঁড়া গেল। এখান থেকে অবিলম্বে সরে পড়াই শ্রেয়।

পরিতোষ ও কালীচরণ দু'জনেই আমার কথায় সায় দিলে। রাতে আহারাদির পরে আমরা যার বাড়িতে অতিথি হয়েছিলুম তাকে বললুম—ভায়া, আমরা কালই এখান থেকে সরে পড়ব মনে করছি।

সরে পড়বার কারণ শুনে সে বললে—আরে, আজ রাতে তো ঘুমোও—কালকের কথা সে কাল হবে'খন।

যাই হোক, তখনকার মতো তো শুয়ে পড়া গেল। কিন্তু সকাল হতে-না-হতে নতুন বন্ধুর দল আমাদের ঘুম থেকে টেনে তুলে বললে—এত শীগ্‌গির তোমাদের যাওয়া কিছুতেই হতে পারে না। আগামী শনিবার তারা একটা

ফুটবল-ম্যাচের আয়োজন করছে—রাজ্যসুদ্ধ লোক জেনে গেছে যে তোমরা খেলবে আর এখন যাব বললেই হল!

যাক্—তখনকার মতো তাদের কথা দিলুম থাকব ব'লে। কিন্তু তারা চ'লে যেতেই আমরা যার বাড়িতে অতিথি হয়েছিলুম তাকে খুলে বললুম যে, এলাহাবাদে আমাদের অনেক জানাশোনা লোক আছে। ফুটবল ম্যাচ দেখতে মাঠে অনেক লোক জড়ো হবে এবং তার ফলে ধরা পড়বার সম্ভাবনা প্রবল। অতএব এখান থেকে সরে পড়াই মঙ্গল।

আমাদের কথা শুনে সে বললে—ঠিক কথা, তোমরা আজ দুপুরেই সরে পড়, কারণ এরা যদি টের পায় তা হ'লে তোমাদের যাওয়া হবে না।

সে আরও বললে যে, বোম্বাইয়ে তাদের এক বন্ধু থাকে, সেখানে সে গয়না-তৈরির কারবার করে। তারা বড়লোক, ব্যবসাও তাদের খুব বড। সে আবার বললে—আমি চিঠি দিচ্ছি, তোমরা সেখানে গিয়ে উঠলে তোমাদের একটা হিল্লে সে নিশ্চয় লাগিয়ে দিতে পারবে।

সেইদিনই দুপুরের আহারাদির পর আমাদের ছোট্ট পোঁটলা বেঁধে নিয়ে স্টেশনের দিকে অগ্রসর হলুম। সন্ধ্যে নাগাদ আগ্রায় গিয়ে পৌঁছনো গেল। পরিতোষ কিংবা কালীচরণ আগ্রার তাজমহল দেখেনি তাই সেখানে যাওয়া। রাত্রিটা হোটেলে কাটিয়ে সারাদিন ধ'রে তাজ, সেকেন্দ্রাবাদ প্রভৃতি দেখে পরের দিন বিকেল নাগাদ বোম্বাই-যাত্রী একখানা প্যাসেঞ্জার গাড়িতে সওয়ার হওয়া গেল।

আমাদের পুরোনো বন্ধু সত্যদার সঙ্গে একবার দেখা করবার ইচ্ছে ছিল কিন্তু তা হয়ে উঠল না।

এবারকার এই বোম্বাই-যাত্রার স্মৃতি আমার মনে এখনো জ্বলজ্বল করছে। তার কারণ এই যাত্রা আর একটু হ'লেই মহাযাত্রায় পরিণত হ'ত।

আগ্রা স্টেশনে শুনলুম যে দ্রুতগামী গাড়িতে চড়তে সাধারণত যে ভাড়া লাগে তার চেয়ে অনেক বেশি লাগবে। তিনজনের হিসাব ক'রে দেখা গেল যে বেশ কিছু বেশি টাকা খরচ হয়ে যাবে। পরামর্শ ক'রে ঠিক হল যে বেশী পয়সা খরচ ক'রে তাড়াতাড়ি বোম্বাই গিয়ে পৌঁছবার এমন তাড়াই বা কি আছে! তার চেয়ে প্যাসেঞ্জার গাডিতে অনেক দেশ মানে দেশের স্টেশনে দেখতে দেখতে বেশ জিরুতে জিরুতে যাওয়া যাবে।

তখন গ্রীষ্মকাল। প্যাসেঞ্জার গাড়ি টিকিয়ে টিকিয়ে সমস্ত ভারতবর্ষটা মাড়িয়ে হাঁটি-হাঁটি পা-পা ক'রে এগোতে লাগল। বদ্ধ রেলের ডিবেয় বসে আছি—মাথার ওপরে প্রচণ্ড সূর্য, পায়ের তলায় তাপদগ্ধা ধরণী—তার ওপরে ট্রেন চললেই দু'পাশ থেকে ধুলো উড়ে এসে দম বন্ধ ক'রে দেয়। তৃষ্ণায় প্রাণ যায় কিন্তু জল কোথায়! যে স্টেশনে জলের ব্যবস্থা আছে সেখানে আকণ্ঠ জল পান ক'রে নিই; কিন্তু জল খেয়েও যে তৃষ্ণা নিবারণ হয় না তার অভিজ্ঞতা জীবনে এই প্রথম হল। গাড়ি চলতে চলতে হয়তো মাঠের মাঝেই দাঁড়িয়ে গেল। ঘণ্টাখানেক কেটে যাবার পর আবার মন্থর গতিতে এগিয়ে চলল। ছোট ছোট স্টেশনে খাবারও পাওয়া যায় না কিংবা যা পাওয়া যায় তা অখাদ্য। হয়তো রাতদুপুরে কোনো বড় স্টেশনে পৌঁছল। তখন সে অবস্থায় যা মিলল তাই গিলে পানিপাঁড়ের দেখা পাওয়া গেল না। এমনি ক'রে কত রাত কত দিন যে কাটল তা মনে নেই। শেষকালে একদিন রাত্রি এগারোটার সময় গাড়িখানা ধীরে ধীরে ভিক্টোরিয়া-টার্মিনাস স্টেশনের একটা ধারের প্ল্যাটফরমে প্রবেশ করল—ধনীর প্রাসাদে দূরসম্পর্কীয় আত্মীয় যেমন সঙ্কোচে আত্মগোপন ক'রে প্রবেশ করে।

প্রকাণ্ড স্টেশন কিন্তু তখন খাঁ-খাঁ করছে। আমাদেরও ট্রেনখানার দিকে কোনো কুলীও এগিয়ে এল না। আমরা গাড়ি থেকে নেমে প্ল্যাটফরমের বাইরে এলুম।

ট্রেনে বসেই ঠিক ক'রে রেখেছিলুম যে এত রাত্রে আর সেই ভদ্রলোকদের ওখানে উঠে তাঁদের আর বিরক্ত করব না। রাত্রিটা স্টেশনেই কাটিয়ে দেব। কিন্তু প্ল্যাটফরম থেকে বেরিয়ে স্টেশনের মধ্যেই আতিপাতি ক'রে খুঁজে কোথাও একখানা বেঞ্চিও দেখতে পেলুম না। শেষকালে উপায়ান্তর না দেখে এক কোণে পরিষ্কার মেঝেতে শুয়ে পড়া গেল। ভাবলুম—প্রাসাদে শুয়েছি বটে, কিন্তু আমাদের বরাতে মেঝের চেয়ে উচ্চস্থান জুটল না।

ক'দিন ধরে সেই দুঃসহ ট্রেন-যাত্রার ফলে শরীর অবসন্ন হয়ে ছিল, তাই শোয়ামাত্রই চোখ বন্ধ হয়ে গেল। বোধহয় আধ-ঘণ্টাটাক কেটেছিল এমন সময় হাঁকডাকের চোটে ঘুম ভেঙে গেল। চোখ খুলে দেখি সম্মুখে পুলিসের উর্দিপরা একটি লোক দাঁড়িয়ে আমাদের ডাকছে।

—কি ব্যাপার!

লোকটি জিজ্ঞাসা করলে—তোমাদের বাড়ি কোথায়?

—কলকাতায়।

—কলকাতায় বাড়ি তো এখানে কেন?

—এখানে এসেছি ব'লে।

—এখানে স্টেশনে এরকমভাবে থাকবার হুকুম নেই। এখুনি এখান থেকে বেরিয়ে যাও—নইলে থানায় নিয়ে যাওয়া হবে।

আর বেশি কিছু বলতে হল না। থানার নাম শোনামাত্র উঠে পড়া গেল। আমাদের বিছানা অর্থাৎ ধুতি গুটিয়ে নিয়ে তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে পড়া গেল।

স্টেশনে পা দিতে-না-দিতে এইরকম দুর্ব্যবহারের সম্মুখীন হওয়ায় মেজাজটা সত্যিই বিগড়ে গেল; কিন্তু স্টেশনের বাইরে এসে চক্ষু একেবারে জুড়িয়ে গেল। দেখলুম ঝকঝকে পরিষ্কার চার-পাঁচটা চওড়া রাস্তা এসে সেখানে মিশেছে। আর্ক-লাইটের স্নিগ্ধ আলোয় চারদিকের বড় বড় বাড়ি ও রাস্তাগুলো যেন ঝিমিয়ে পড়েছে।

পথ জনশূন্য কিন্তু একেবারে নিঃশব্দ নয়। সামনেই মিউনিসিপ্যালিটির বাড়ির সম্মুখেই ফেরোজ শা মেটার উদ্ধত ভঙ্গিমার বিরাট প্রতিকৃতি—সমস্ত মিলিয়ে বেশ ভালোই লাগতে লাগল। এর তুলনায় আমাদের কলকাতা শহরের হাওড়া স্টেশনের সেই গাড়ির ভিড় ও গাড়োয়ানের চিৎকার, তার ওপরে বড়বাজারের কাদা-প্যাচপেচে রাস্তা দিয়ে শহরে ঢোকা—অতি জঘন্য মনে হতে লাগল। সেই রাত্রি দ্বিপ্রহরের লগ্নে সুন্দরী বোম্বাই নারীর সঙ্গে আমার শুভদৃষ্টির বিনিময় হয়েছিল। কলকাতা আমার মাতা আর রূপসী বোম্বাই আমার প্রেয়সী।

যাই হোক, স্টেশনের কাছাকাছি রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে ঘুরে পরামর্শ করতে লাগলুম এখন কি করা যায়, কোথায় রাত্রির মতো একটু আশ্রয় পাওয়া যায়। পথ-চলতি একজন লোককে জিজ্ঞাসা করলুম—ধর্মশালা কোন্ দিকে?

লোকটি আমাদের কথা বুঝতে না পেরে অদ্ভুত এক ভাষায় কি বললে। তারপরে দুই চক্ষের অদ্ভুত ভাষায় কিছুক্ষণ কথাবার্তা চলল, কিন্তু কেউ কারুর কথা বুঝতে পারলে না। শেষকালে স্থির করা গেল রাস্তাতেই এক জায়গায় শুয়ে রাত্রিটা কাটিয়ে দেওয়া যাক। জীবনে অনেকরকম অভিজ্ঞতাই তো হল—এটুকু আর বাকি থাকে কেন?

পরিতোষ ও কালী আমার প্রস্তাবে বিশেষ আপত্তি করলে না। এই কয়দিনের ট্রেন-যাত্রায় তাদেরও প্রায় গঙ্গাযাত্রীর অবস্থা হয়েছিল। তাই বেশী কথা কাটাকাটি না ক'রে ওরই মধ্যে একটা পরিষ্কার জায়গা দেখে আমার ভবিষ্যৎ

কর্মভূমির পথপ্রান্তে ক্লান্ত দেহ বিছিয়ে দিলুম। দূরাগত অস্পষ্ট রেলের বাঁশী কানে এসে বাজতে লাগল। মনে হতে লাগল যেন কোন্ সুদূর ভবিষ্যতের গর্ভ থেকে এই বেদন-মধুর সুর ভেসে আসছে বর্তমানের বুকে—সে কি আমারই অন্তরের ধ্বনি ?

স্বপ্নালোকের অতীতে গভীর নিদ্রায় অভিভূত হয়ে আছি এমন সময় একটা ধাক্কা খেয়ে ধড়মড় ক'রে উঠে বসলাম। দেখলুম কালী ও পরিতোষ দু'জনেই উঠে বসেছে। সামনে একটা লোক দাঁড়িয়ে। অদ্ভুত নীল পোশাক তার অঙ্গে, মাথায় নীল ও হলদে রঙের শামলার মতো বাঁধা পাগড়ি। কোমরে রুল ঝুলছে দেখে বুঝতে আর বাকি রইল না যে তিনি কে !

লোকটা ইকড়ে-মিকড়ে ক'রে কি বলতে লাগল কিছুই বুঝতে পারলাম না। তবে এটুকু বেশ বোঝা গেল যে রাস্তায় শুয়ে থাকার জন্য সে ঘোর আপত্তি প্রকাশ করছে এবং বলছে যে অবিলম্বে স্থান ত্যাগ না করলে বাধ্য হয়ে তাকে আমাদের জন্য রাস্তা থেকে ভালো আশ্রয়ের ব্যবস্থা করতে হবে।

আমরা তাকে বন্ধুভাবে জিজ্ঞাসা করলুম—এত রাতে আমরা যাই কোথায় ?

সে বললে—কেন ? ধর্মশালায় যাও। ধর্মশালায় রাতটা কাটিয়ে কাল সকালে কোনো হোটেলে চ'লে যেও—শহরে হাজার হাজার ভালো হোটেল আছে।

আমাদের সঙ্গে পুলিস-কনস্টেবলের যখন এইরকম কথাবার্তা চলছে, ঠিক সেই সময়ে রাস্তা দিয়ে ঠুকঠুক ক'রে একখানা ভাড়াটে ফিটন যাচ্ছিল। কনস্টেবল গাড়োয়ানকে ডেকে তার সেই অদ্ভুত ভাষায় বললে—এদের কোনো ধর্মশালায় পৌঁছে দাও।

পয়সার অভাবে না খেয়ে রাস্তায় পড়েছিলুম, এখন ঠেলায় পড়ে ফার্স্ট-ক্লাস ফিটনে চড়ে ধর্মশালায় চললুম। মানুষের জীবন এইরকম বৈষম্যে ভরা, এর মধ্যে তাল রাখতে না পারলেই ভরাডুবি। রাজকুলের সঙ্গে সম্পর্ক হ'লে হঠাৎ এইরকমই পদোন্নতি হয়ে থাকে।

অনেক বড় বড় রাস্তা ও গলি-ঘুঁচি পেরিয়ে আমাদের গাড়ি একটা মন্দিরের সামনে নিয়ে দাঁড়াল। এইটেই ধর্মশালা।

গাড়ি থেকে নেমে ধর্মশালার ভেতরে ঢুকলুম। একদিকে মন্দির ও তারই সংলগ্ন ধর্মশালা। সেখানে এখনো লোকজন যাতায়াত করছে, চারিদিক আলোয় আলো। প্রকাণ্ড একটা ঘর, তার একদিকটা খোলা। সেটাকে ঘরও বলা চলে, ঢাকা বারান্দা কিংবা দরদালানও বলা চলে। লোক সব পাশাপাশি

বিছানা করেছে, যার বিছানা নেই সে শুধু জায়গাটুকু দখল ক'রে আছে। এর মধ্যে সন্ন্যাসী, উদাসী, গৃহস্থ, ভবঘুরে, পাগল, রোগী, চক্ষুষ্মান্, অন্ধ, বিকলাঙ্গ—কেউ-বা গাঁজা খাচ্ছে, কেউ বিড়ি টানছে, কেউ শুয়ে, কেউ বসে, কেউ-বা ঘুমে অচেতন। এরই মধ্যে আমাদের একটু জায়গা মেলে কিনা—ঘুরে ঘুরে তাই দেখতে লাগলুম। কিন্তু দেখলুম সেখানে আমাদের তিনজনের স্থান হওয়া সম্ভব নয়। তবুও বার বার ঘুরে ঘুরে দেখছি, এমন সময় অতি ক্ষীণ অথচ সুস্পষ্ট বাংলাভাষায় শুনতে পেলুম—আপনারা কি জিজ্ঞাসা করছেন ?

এই বিচিত্র মানুষের ভিড়ের মধ্যে আমার মাতৃভাষা শুনে সত্যিই চমক লাগল। চারপাশে খুঁজে শেষকালে দেখতে পেলুম আমাদের পায়ের কাছেই একটি লোক কম্বলের ওপরে পদ্মাসন ব'সে আছেন। লোকটির দেহ বেশ সুপুষ্ট, মাথায় লম্বা চুল কিন্তু জটা নেই, মুখে দাড়িগোঁফ, চোখ-দু'টো মাটির দিকে নিবদ্ধ, চেহারার মধ্যে বেশ একটি বিশিষ্টতার ছাপ আছে—পরনে কিন্তু সাদা থান, অঙ্গ অনাবৃত। কি জানি কেন, মনে হল এই ব্যক্তিই ঐ অদ্ভুত প্রশ্নকর্তা।

আমরা ব'সে প'ড়ে তাঁকে বাংলাভাষায় জিজ্ঞাসা করলুম—আপনি কি কিছু বললেন ?

তিনি সেইরকম ক্ষীণ অথচ স্পষ্ট সুরে মুখ না তুলেই বললেন—আপনারা কি জিজ্ঞাসা করছেন ?

বললুম—আমরা রাতটুকু কাটাবার জন্যে জায়গা খুঁজছি। তা এখানে তো দেখছি একটুও জায়গা নেই।

লোকটি সেইরকম মাথা নিচু ক'রে মাটির দিকে চেয়ে বললেন—ঐ কোণের সোপান দিয়ে দ্বিতলে চলে যান—সেখানে জায়গা পেতে পারেন।

সত্যিই ঘরের এক কোণে সিঁড়ি রয়েছে দেখে আমরা ওপরে উঠে গেলুম। সেখানেও একতলারই মতন একটা বড় ঘরে পাশাপাশি লোক শুয়ে রয়েছে। একধারে একটা লোক ঝাড়ু লাগাচ্ছিল, তাকে জিজ্ঞাসা করলুম—খালি ঘর-টর আছে ?

সে কোনো কথা না ব'লে পাশেই একখানি খালি ঘর দেখিয়ে দিলে। আমরাও আর বিনা বাক্যব্যয়ে ঢুকে পড়লুম সেই ঘরে।

ঘরখানা বেশ বড় বটে, কিন্তু তার অবস্থা অতি শোচনীয়। একদিকে একটা বড় জানলা, তার দু'টো পাল্লাই ভাঙা। আরও দু'টো বড় জানলা রয়েছে

কিন্তু সে-দু'টোই বন্ধ। ঘরের মেঝেতে পুরু ধুলোর আস্তরণ। যাই হোক, কোঁচা দিয়ে তিনজনে মিলে যতদূর সম্ভব সেই ধুলো ঝেড়ে, ধুতি পেতে, মোমবাতি জ্বেলে শোবার ব্যবস্থা করছি—এমন সময় আমাদের চোখ ঝলসে দিয়ে বিদ্যুদ্‌বরণ এক নারী সস্মিতমুখে প্রবেশ করলেন। যিনি এলেন তাঁর যৌবন পার হয়ে গেছে অনেকদিন আগেই। দীর্ঘ শীর্ণ দেহ, রঙ দুধে-আলতার অপূর্ব সংমিশ্রণ, আয়ত চক্ষু, দীর্ঘ নাসা। দুই হাতে সোনার চুড়ি-বালা আছে বটে, কিন্তু সে-দেহের রঙের কাছে সোনার রঙ এমন ম্লান হয়ে মিলিয়ে গিয়েছে যে প্রথম দৃষ্টিতে তা চোখেই পড়ে না। গায়ে হাতে গয়না অথচ থান-পরা —আশ্চর্য হয়ে দেখছি। মনে হল সে-রমণী বোম্বাই প্রদেশের নয়, আমার বিশ্বাস তাঁর বাড়ি পাঞ্জাবে। যাই হোক, তাঁর সঙ্গে আরও দু'টি লোক ছিল —তিনি ঘরে ঢুকে আমাদের কাছে এসেই বিশুদ্ধ উর্দু ভাষায় বললেন—ও এরা! এরা তো বাংলাদেশের ছেলে।

তারপরে আমার দিকে ফিরে বললেন—কেমন নয় কি ?

বললাম,—আপনি ঠিক অনুমান করেছেন, আমাদের বাড়ি বাংলাদেশে।

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—তা বেটা, এখানে এসে উপস্থিত হ'লে কি ক'রে ?

এখানে এসে উপস্থিত হবার কাহিনী শুনে তিনি বালিকার মতন খলখল হেসে উঠে বললেন—তোমাদের কোনো ভয় নেই—এখানে কেউ তোমাদের কিছু বলতে পারবে না।

তারপর আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি ইংরেজী পড়তে পার ?

—আজ্ঞে, হ্যাঁ। কিছু কিছু পারি।

তিনি ডান হাতখানা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন—পড়। দেখলুম হাতে একটা সরু সোনার বালা, তাতে উঁচু-উঁচু অক্ষরে ইংরেজী ভাষায় কি-সব লেখা রয়েছে। হাতখানা টেনে নিয়ে ভালো ক'রে দেখলুম—লেখা রয়েছে, Janaki Bai, presented by the Commissioner of Police, Bombay.

আমার পড়া শেষ হ'লেই তিনি আবার সেইরকম খলখল ক'রে হেসে বললেন —দেখলে, এখানকার পুলিস-কমিশনার আমার বন্ধু। আচ্ছা, এখন শোও— রাত হয়েছে।

ব'লে তিনি উঠে গেলেন। যাবার সময় দরজাটা বন্ধ ক'রে দিয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ জানকীবাই সম্বন্ধে আলোচনা ক'রে মোমবাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়বার

আয়োজন করছি এমন সময় কালীচরণ আবিষ্কার করেলে যে আমাদের ঘরের দরজায় বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে।

—কি সর্বনাশ? বলিস কি রে!

তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে দেখা গেল—সত্যি-সত্যিই বাইরে থেকে দরজায় তালা লাগানো হয়েছে। ঘুমটুম তো মাথায় উঠে গেল। নিশ্চয় আমরা যাতে পালাতে না পারি সেইজন্যই এই ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমরা বলাবলি করতে লাগলুম যে ইস্টিশন ও রাস্তায় পুলিসের হাত থেকে বেঁচে গিয়ে শেষকালে পয়সা খরচ ক'রে গাড়িভাড়া দিয়ে নিজেরাই এসে পুলিসের খপ্পরে পড়লুম? একেই বলে দুর্দৈব!

যাই হোক, আরও কিছুক্ষণ আলোচনার পর—যা হবার তাই হবে মনে ক'রে তখনকার মতন শুয়ে পড়া গেল।

ওরই মধ্যে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলুম জানি না—মুখে রোদ লাগায় ধড়মড় ক'রে জেগে উঠে দেখি বেশ বেলা হয়ে গিয়েছে। পূব-মুখো সেই ভাঙা জানলা দিয়ে ঘরের মধ্যে রোদ এসে পড়েছে। দেখলুম পরিতোষ ও কালীচরণ তখনো ভোঁস-ভোঁস ক'রে ঘুমুচ্ছে। তাড়াতাড়ি দরজার কাছে গিয়ে টেনে দেখলুম, দরজা খুলে দেওয়া হয়েছে। তৎক্ষণাৎ পরিতোষ ও কালীচরণকে টেনে তুলে শুভসংবাদটি দেওয়া হল। আর বিলম্ব নয়—ধুতি-টুতি গুছিয়ে নিয়ে. ছাড়া-পাওয়া পাখি যেমন খাঁচা থেকে বেরিয়ে পড়ে—তেমনি ঠিকরে বেরিয়ে পড়লুম। রইল জানকীবাই আর তার মন্দির পেছনে প'ড়ে।

এ-গলি সে-গলি দিয়ে বড় রাস্তায় প'ড়ে একটা চায়ের দোকানে ঢুকে চা খেয়ে ধাতস্থ হয়ে ছুটলুম আমাদের সেই এলাহাবাদী বন্ধুর বাড়ির উদ্দেশে।

ঘণ্টাখানেক পথে ঘুরে ঘুরে সেই বাড়ি আবিষ্কার করা গেল।

দোতলায় ছোট্ট একখানি ঘর, সেই ঘরে পাশাপাশি বোধ হয় সাত-আটজন কারিগর ব'সে কাজ করছে। আমরা যাঁর কাছে চিঠি নিয়ে এসেছিলুম তিনি তখন সেখানে ছিলেন না। আমরা সেই ছোট্ট ঘরে কোনোরকমে ব'সে তাঁর অপেক্ষা করতে লাগলুম। কিছুক্ষণ বাদে সেই ভদ্রলোক এসে আমাদের দেখে একবারে ব'সে পড়লেন। বললেন—আপনারা করেছেন কি! আগে থাকতে চিঠিপত্র লিখতে হয়, না-বলা না-কওয়া—একেবারে দুম ক'রে এসে পড়লেন! ছিঃ ছিঃ—আপনারা বুদ্ধিমান ব্যক্তি হয়ে এ কী করলেন! এখানে আমাদের নিজেদের থাকবার জায়গা নেই—এ কি কলকাতা! বোম্বাই শহরে একজনের খেতেই লেগে যায় পনেরো টাকা।

আমরা বললুম—আপনারা যদি দয়া ক'রে আমাদের একজনের কিছু লাগিয়ে দেন তা হ'লে তাই দিয়ে আমরা তিনজনে চালিয়ে নেব। তারপরে অন্য দু'জনে ধীরে-সুস্থে কাজ জুটিয়ে নেব।

সেই ছোট্ট ঘরে আরও যে কয়জন কারিগর ব'সে কাজ করছিলেন, তাঁরা আমাদের এই আলোচনার মধ্যে একটি কথাও বললেন না—ঘাড় গুঁজে সোনার ফুল তুলতে লাগলেন।

অনেকক্ষণ ঝকাঝকির পর তাঁদেরই মধ্যে একজন ঘাড় তুলে বললেন—তা পরে যা হবার তা হবে এখন এঁরা এতদূর থেকে আসছেন, এঁদের খেতে-টেতে কিছু দিতে হয়।

আমরা যাঁর কাছে চিঠি নিয়ে এসেছিলুম তিনি বললেন—ও হ্যাঁ, সে ব্যবস্থা করছি।

এই ব'লে সেই কারিগরদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত একটি অল্পবয়স্ক যুবককে ডেকে বললেন—দেখ, ঐ মোড়ের দোকান থেকে কিছু লুচি, তরকারি ও মিষ্টি নিয়ে এস তো ভাই। আমাদের নাম ক'রে বোলো—বাঙালী লুচি। তা হ'লে টাটকা ভেজে দেবে।

একজন কারিগর বললেন—কতটা আনবে তা না ব'লে দিলে কি আনবে!

—ও, হ্যাঁ—ব'লে তিনি নিজের মনেই বললেন—কতটা আনবে! তা এক কাজ কর—লুচিতে ও মিঠাইয়ে মিলিয়ে এক এক সের ক'রে তিনটে আলাদা আলাদা মোড়ক বাঁধিয়ে নেবে।

লোকটি পয়সা নিয়ে চলে যাওয়ার পর আমরা বলাবলি করতে লাগলুম—আমাদের কি রাক্ষস মনে করেছে নাকি! এক সের ক'রে লুচি-মেঠাই খেতে তো আমাদের মতো পাঁচটা লোকের দরকার হবে।

পরিতোষ বললে—বোধ হয় আমাদের আগমন উপলক্ষ্যে কারিগরদের সবাইকেই খাওয়াবার ব্যবস্থা হল।

কিছুক্ষণ পরে যুবকটি তিনটি ছোট ছোট সুতোয় জড়ানো কাগজের মোড়ক নিয়ে উপস্থিত হল। তিনটি মোড়ক আমাদের তিনজনের হাতে দিয়ে সেই ভদ্রলোক বললেন—নিন, খান।

মোড়ক খুলে দেখি—তার মধ্যে খানকতক তেলে-ভাজা লুচি, মুলো কিংবা ঐজাতীয় পদার্থ খানকয়েক ভাজা আর গোটা-দুয়েক প্যাঁড়া-জাতীয় মিষ্টি—সবসুদ্ধ মিলিয়ে বোধ হয় পোয়াটাক মাল হবে।

পরে জানতে পারলুম যে বোম্বাই শহরে আটাশ তোলায় সের। যাই হোক, এদিকে আমরা খেয়ে-দেয়ে তো 'গ্ল্যাড' হয়ে বসলুম। ওদিকে সেই ভদ্রলোকের লেক্‌চার চলতে লাগল। আমাদের আগমনে তিনি অত্যন্ত বিব্রত হয়ে পড়েছেন দেখে আমরা তাঁকে বললুম—আপনি আমাদের জন্য অত ব্যস্ত হবেন না। আপনারা বাঙালী, সেইজন্য আমরা আপনাদের আশ্রয়ে এসেছিলুম —যদি গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য কিছু স্থবিধা ক'রে দিতে পারেন। আপনাদের অস্থবিধা ক'রে আমরা একদণ্ডও এখানে থাকব না। আপাতত অনেক দূর থেকে আমরা আসছি একটু বিশ্রাম করতে দিন—একটু পরে আমরা নিজেরাই চলে যাব—বলেন তো এখুনি উঠে পড়ি।

আমাদের কথায় দেখলুম ভদ্রলোক অনেক নরম হয়ে পড়লেন। তিনি বলতে লাগলেন—না না, সে-কথা হচ্ছে না। দেখি, আপনাদের জন্য কি ব্যবস্থা করতে পারি—ইত্যাদি। ভদ্রলোকেরা নিজেদের মধ্যে আমাদের সম্বন্ধে সশব্দে জল্পনা করতে লাগলেন—ইতিমধ্যে বেলা বাড়তে লাগল। কারিগরেরা একে একে উঠে স্নান করতে খেতে গেলেন, কেউ-বা তখনো ব'সে কাজ করতে লাগলেন।

এমন সময় সেখানে এক সন্ন্যাসী এসে উপস্থিত হলেন। সন্ন্যাসী বলছি এইজন্য যে তাঁর অঙ্গে গেরুয়া বসন দেখলুম এবং তা ছাড়া দু'-একজন তাঁকে সন্ন্যাসী ব'লে সম্বোধনও করলে।

সন্ন্যাসীর বয়স সাতাশ-আটাশের বেশি হবে না, রঙ ফরসা, মাথাতে বেশি উঁচু নয়। বেশ পুষ্ট চেহারা কিন্তু মোটা বা মেদ-বহুল নয়। সন্ন্যাসীর চক্ষু-দু'টি অসাধারণ দীপ্তিমান, দেখলেই মনে হয় বোধ হয় তিনি কোনো অলৌকিক শক্তির অধিকারী। সন্ন্যাসী আসতেই কেউ কেউ উঠে এসে তাঁকে প্রণাম করলে। কেউ কাজ করতে করতে মুখেই বললে—ব্রহ্মানন্দজী, প্রণাম।

আমরা যে ভদ্রলোকের কাছে চিঠি নিয়ে এসেছিলুন তিনি সন্ন্যাসীর কাছে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। আমার নাম শুনে জিজ্ঞাসা করলেন— তোমরা ব্রাহ্মণ ?

ভাগ্যে আগ্রা স্টেশনে পৈতে কিনে গলায় দিয়েছিলুম। বললুম— আজ্ঞে হ্যাঁ।

কিছুক্ষণ বাদে আমাদের সেই ভদ্রলোক ব্রহ্মানন্দজীকে একটু আড়ালে ডেকে নিয়ে গেলেন। অনেকক্ষণ ধরে কি-সব কথা ব'লে ফিরে এসে ব্রহ্মানন্দজী আমায় ডেকে বললেন—চল আমার সঙ্গে।

রাস্তায় নেমে সন্ন্যাসীর সঙ্গে চললুম।

অজানা শহর, অজানা লোকের সঙ্গে চলেছি; কোথায় চলেছি তাও জানা নেই। বন্ধুদের ছেড়ে এভাবে অন্য কোথাও যেতে মন আমার চাইছিল না। দু'-একবার সন্ন্যাসীকে এ-সম্বন্ধে প্রশ্নও করলুম কিন্তু তিনি কোনো উত্তর না দিয়ে গভীর চিন্তান্বিতভাবে এগিয়ে চলতে লাগলেন—এ-গলি ও-গলি দিয়ে।

মিনিট পনেরো হাঁটবার পর সন্ন্যাসী আমাকে নিয়ে ঢুকলেন একটা মাঠ-কোঠার মতন বাড়িতে। নড়বড়ে সিঁড়ি বেয়ে আমরা দোতলার একখানা ঘরে গিয়ে পৌঁছলুম। ঘরখানা বেশ বড়, রাস্তার দিকে গোটা-কতক জানলা। সেই জানলার ধারে কয়েকখানা মাদুর পাতা হয়েছে, আর সেই মাদুরে সার-সার কয়েকজন বাঙালী কারিগর ব'সে গয়না-তৈরির কাজে ব্যস্ত রয়েছেন। দু'-একজন কানে হীরের-টাপ-পরা গুজরাটী ভদ্রলোকও—সম্ভবত খদ্দের—সেখানে ব'সে রয়েছেন।

আমরা পৌঁছতেই কারিগরেরা কেউ সন্ন্যাসীকে প্রণাম করলে, কেউ-বা ব'সে ব'সে মুখেই সম্ভাষণ জানালে। সন্ন্যাসী আমাকে সেখানে বসতে ব'লে একজনকে জিজ্ঞাসা করলেন—অমুক ব্যক্তি কোথায়?

লোকটি ওপরের দিকে দেখিয়ে দিলে। দেখলুম, ঘরের মধ্যেই কাঠের মাচা বা চাঙ ক'রে দোতলা করা হয়েছে। ঘরে—সেই মাচায় ওঠবার জন্য এক কোণে একটা ছোট্ট সিঁড়ি রয়েছে—সন্ন্যাসী সেই সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেলেন।

সন্ন্যাসী ওপরে উঠে যেতেই আবার যে যার নিশ্চিন্ত হয়ে কাজে মন দিল। দু'-একজন অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক কারিগর আমাকে সামান্য দু'টো-একটা প্রশ্ন ক'রে আবার কাজে মন দিলে। কিছুক্ষণ বাদে সন্ন্যাসী একজন প্রৌঢ় লোক সঙ্গে ক'রে নেমে এলেন। প্রৌঢ় লোকটি আমাকে দেখে বললেন—ও, এই ছেলেটি। আচ্ছা।

সন্ন্যাসী চ'লে গেলেন। আমি ব'সে ব'সে তাদের কারিগরি দেখতে লাগলুম। মনে হতে লাগল—গয়না-তৈরির কাজ শিখলে মন্দ হয় না। সন্ন্যাসী বোধ হয় এই কাজ শেখাবার জন্যই আমাকে এখানে নিয়ে এসেছেন। কথাটা মনে হতেই মনে মনে উৎসাহিত হতে লাগলুম। মনে হতে লাগল যে আমরা তিনজনে কাজ শিখে বেশ ভালো কারিগর তৈরি হব। পরের

চাকরি ছেড়ে দিয়ে পরে বড় ব্যবসা ফাঁদব। এইরকম এঁদো ঘর ছেড়ে রাস্তার ওপরে বড ঘর ভাড়া করব—কলকাতার পার্ক স্ট্রীটের জুয়েলারদের মতন।

ভাবছি—মনে আনন্দ ও উৎসাহের জোয়ার আসছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে হচ্ছে—বন্ধুরা কোথায়! তাদের সঙ্গে এই সম্বন্ধে পরামর্শ করতে পারলে ভালো হ'ত।

ক্রমে সেই গুজরাটী খরিদ্দারেরা একে একে বিদায় নিয়ে চ'লে গেল। কারিগদের মধ্যেও কয়েকজন উঠে গেল স্নান করতে খেতে। ইতিমধ্যে দু'জন বাঙালী এসে উপস্থিত হলেন। প্রথম সম্ভাষণাদি হয়ে যাবার পর এঁদের মধ্যে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলেন—হ্যাঁ হে, আজ এসেছে নাকি?

প্রশ্নটা শুনেই মনে হল—এই রে! বোধ হয় আমাদের কথা বলছে। একজন বললে—কে বললে তোমাকে?

—খবর পেলুম যে।

—যত বাজে খবর পাও কোথা থেকে!

লোকটা কথাবার্তা ব'লে চ'লে যাবার পরই আর একটি লোক হন্তদন্ত হয়ে এসে একজনকে বললে—ওহে, খবর পেলুম এসেছে—তা ভাই, আমার আসতে একটু দেরি হবে—তা আমি আটটা নাগাদ এসে পডব'খন।

এই ব'লে দু'টো-তিনটে বিডি পকেট থেকে বার ক'রে একে তাকে দিয়ে লোকটি যেমন এসেছিল তেমনি ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে চ'লে গেল।

কী যে এসেছে আর কী একটা কিছু হবে তা এদের প্রশ্নোত্তরে কিছুই বুঝতে পারা গেল না। এদিকে একে একে কারিগরেরা স্নান-খাওয়া সেরে এসে কাজে ব'সে গেল। কাজ করতে করতে কেউ কারুর সঙ্গে কথা বলে না। ঠুক-ঠুক ক'রে কাজ ক'রে চলেছে। কারুর বা চোখে ঠুলি, কেউ-বা গামলা-উনুনে হাপর চালিয়ে মুচিতে সোনা গলাচ্ছে। কেউ-বা দিনের আলোতেই সামনে প্রদীপ জ্বালিয়ে ছোট্ট হাতুডি ও পেরেকের মতন ছোট্ট ছেনি দিয়ে সোনায় ফুল-লতা-পাতা কাটছে। হাতুড়ির ঠুক-ঠুক ও হাপরের ভো-ভো শব্দ ছাড়া আর শব্দ নেই। বাইরের রাস্তায় নানারকম ফেরিওয়ালার চিৎকার ভেসে আসছে—যার একটি বর্ণও বোধগম্য হচ্ছে না। এরই মধ্যে থেকে থেকে এক-একজন বাঙালী আসছে, জিজ্ঞাসা করছে—হ্যাঁ হে, শুনছি নাকি এসেছে?

কখনো উত্তর হচ্ছে—"হ্যাঁ", কখনো উত্তর হচ্ছে—"না"। আমি ব'সে ব'সে

আকাশ-পাতাল ভাবছি। প্রধান ভাবনা পরিতোষ ও কালীচরণ—তাদের কোথায় নিয়ে যাওয়া হল!

ক্রমে বেলা প'ড়ে আসতে লাগল। ক্রমেই সেই স্বল্পালোকিত প্রায়ান্ধকার ঘরখানির কোণে কোণে এখানে সেখানে অন্ধকার জমাট হয়ে উঠতে লাগল। কারিগরেরা একে একে সকলেই নিজেদের সামনে একটা একটা ক'রে প্রদীপ জ্বালিয়ে নিলে। বাইরে তখনো আলো—ক্রমে সেইটুকুও নিভে গেল। আমার জীবনের আর একটি দিন অতীতের অন্ধকারে বিলীন হয়ে গেল।

সন্ধ্যা হবার কিছু পরেই ঘরের মধ্যে আর-একজন গেরুয়াধারী লোক এসে উপস্থিত হলেন। এঁর পরনে গেরুয়া রঙের ছোট-গোছের কৌপীন। সন্ন্যাসীর বয়স বেশি নয়—অন্তত তাঁকে দেখে আমার মনে হয়েছিল বাইশ-তেইশ বছরের বেশি নয়। ব্রহ্মানন্দের মতন অমলদীপ্ত চেহারা না হলেও এঁর চেহারা বেশ সুন্দর—সবার উপরে মুখখানিতে সর্বদাই হাসি যেন লেগে রয়েছে।

সন্ন্যাসী ঘরের মধ্যে আসামাত্র সেখানে একটা আনন্দের ঢেউ উঠল। সকলে উঠে তাঁকে সম্বর্ধনা করতে আরম্ভ ক'রে দিলে—আসুন—আসুন, সুন্দরজী—এতদিন আসেননি কেন, আমরা কী অপরাধ করেছি, ইত্যাদি। কেউ তাঁকে প্রণাম করলে, কেউ করলে আলিঙ্গন, কাউকে তিনি জড়িয়ে ধরলেন, কারুকে চুমু খেলেন। সকলে একরকম ধরাধরি ক'রে তাঁকে নিয়ে এসে বসালে একেবারে আমার পাশেই। সন্ন্যাসী ব'সে চারদিক চেয়ে হো হো ক'রে হেসে আমার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে একজনকে জিজ্ঞাসা করলেন—এ মালটিকে তো নতুন দেখছি!

তারপরে আমাকেই জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি কবে এলে ভাই?

—আজ সকালে।

—কি নাম তোমার?

নাম বললুম। ওদের মধ্যেই একজন বললে—বাড়ি থেকে চম্পট দিয়ে এসেছেন। ব্রহ্মানন্দজী রেখে গেছেন।

সুন্দরজী একটা বড় রকমের 'বেশ' ব'লে অন্যদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে আরম্ভ ক'রে দিলেন।

দেখলুম সুন্দরজী অত্যন্ত ছটফটে লোক। কথা বলতে বলতে তিনি কখনো উঠছেন, কখনো পায়চারি করছেন, একবার সেই মাচার ওপরে উঠে গেলেন, একবার বাথরুমের দিকে, আবার এসে বসলেন। এইরকম করতে করতে একবার তিনি বললেন—ওহে, এক কাজ কর তো।

সকলেই তাঁর কাজ করার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল।

—আরে, হুকুম করুন কি করতে হবে?

সুন্দরজী বললেন—এই মোড়ের মেঠাইয়ের দোকানে টাটকা রাবড়ি রয়েছে, সেরখানেক নিয়ে এস তো খাই।

কথাটা শুনেই সকলের আনন্দ একেবারে চুপসে গেল। এ ওকে বলতে লাগল—যা না, নিয়ে আয় না।

ও বলতে লাগল—আমার কাছে পয়সা নেই।

এইরকম যখন চলেছে ঠিক সেই সময় 'ওঃ' ব'লে বিকট আওয়াজ ক'রে সুন্দরজী একেবারে ঘুরে প'ড়ে গিয়ে মৃগীরুগীর মতন হাত-পা খিঁচতে আরম্ভ ক'রে দিলেন! সকলে চেঁচিয়ে উঠল—কি হল—কি হল—জল—জল—

সকলে মিলে তাঁর পরিচর্যা আরম্ভ ক'রে দিলে।

একজন তাঁর মাথাটা কোলের ওপরে তুলে নিলে। মুখে চোখে জলের ছিটে দিতে আরম্ভ করলে। বোধ হয় পাঁচ মিনিট পরে সুন্দরজী চোখ খুলে গ্যাঙাতে গ্যাঙাতে বলতে লাগলেন—আমি বোধ হয় বিষ খেয়েছি—বোধ হয় আমি আর বাঁচব না। পেটে অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে—ওরে বাপ রে—

সুন্দরজী গ্যাঙাতে গ্যাঙাতে বলতে লাগলেন—ঐ অযোধ্যাদার জামার পকেটে একটা কৌটতে কালো-মতন কি ছিল—তাই খেয়েছি, ভয়ানক তেতো লাগল—

—এই সর্বনাশ করেছে রে!

ব'লেই একজন ছুটে দেয়ালে ঝোলানো একটা জামার পকেটে হাত পুরে একটা টিনের কৌটো বার ক'রে খুলে দেখেই চ্যাচাতে আরম্ভ করলে—কি সর্বনাশ! আমার এক হপ্তার আফিং—আজ সকালেই এনেছি—সবটা মেরে দিয়েছে—ও আর বাঁচবে না—

এদিকে সুন্দরজী বলতে লাগলেন—ওঃ, পেটের মধ্যে অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে—আমাকে হাসপাতালে নিয়ে চল—

একজন বললে—আমি যখন প্রথম আফিং খেতে আরম্ভ করি তখন মাত্রা ঠিক রাখতে না পেরে মাঝে মাঝে পেটে ঐরকম ব্যথা ধরত—দুধ খেলে কমে যেত। একটু দুধ খাইয়ে দাও—যন্ত্রণা কমে যাবে।

সন্ন্যাসী তখনও শুয়ে শুয়ে গ্যাঙাচ্ছেন। একজন নিচু হয়ে জিজ্ঞাসা করলে —দুধ খাবেন?

বলামাত্র সুন্দরজী হাঁ করলেন।

কয়েক মুহূর্ত হাঁ ক'রে থাকবার পরও কিছু পড়ল না দেখে তিনি মিনমিন ক'রে বললেন—রাবড়ি—রাবড়ি—

অযোধ্যা ততক্ষণে জামাটা পরে ফেলেছিল। সে বলে উঠল—রাবড়ি—বহুৎ আচ্ছা—আমি এখুনি আনছি।

সন্ন্যাসী নিষ্পন্দ হয়ে প'ড়ে রইলেন। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই রাবড়ি এসে গেল। একজন চামচে ক'রে সেই চিত হয়ে শোয়া অবস্থাতেই তাঁর মুখে ভাঁড় থেকে রাবড়ি তুলে তুলে দিতে লাগল। ভাঁড়টি শেষ হয়ে যাবার পর সেইরকম চিত হয়ে শুয়েই সুন্দরজী এক ঘটি জল ঢক্‌ঢক্ ক'রে মেরে নিঝুম হয়ে প'ড়ে রইলেন। সবাই জিজ্ঞাসা করতে লাগল—এখন একটু ভালো লাগছে?

কোনো কথা না ব'লে একবার সম্মতিসূচক ঘাড় নেড়ে তিনি সেইরকম প'ড়ে রইলেন। ওদিকে তখন সবাই অযোধ্যাকে নিয়ে পড়ল—কেন তুমি পকেটে ঐরকমভাবে আফিং রেখে দাও।

অযোধ্যা বলতে লাগল—এই বাবা কান মলছি—আর কখনো রাখব না। এরকম যে হবে তা কে জানতো?

এইরকম সব কথাবার্তা চলছে এমন সময় সুন্দরজী আড়ামোড়া দিয়ে উঠে পড়লেন। তাঁকে উঠে বসতে দেখে সবাই বলতে লাগল, কেমন আছেন? এখন কিরকম লাগছে—ইত্যাদি।

সকলের প্রশ্নের উত্তরে সুন্দরজী খানিকটা ছেলেমানুষের মতন হেসে বললেন—দূর, ওটুকু আফিঙে আমার কি হবে! তোমাদের রাবড়ি খাওয়াতে বললুম—তা খাওয়ালে না—কেমন কায়দা ক'রে রাবড়ি খেয়ে নিলুম।

একটা হাসির হুল্লোড় প'ড়ে গেল।

সন্ন্যাসী বললেন—এবার যাই ভাই। আর একদিন আসব।

সবাই বলতে লাগল—এরি মধ্যে যাবেন কি! একটা গান শুনিয়ে যান।

—গান হবে। আচ্ছা, একটা গান গাই।

সন্ন্যাসী গান ধরলেন। অতি পরিচিত রবীন্দ্রনাথের গান—"দিবস রজনী আমি যেন কার আশায় আশায় থাকি"। যেমন মিষ্টি তাঁর ব্যবহার তেমনি মধুময় তাঁর কণ্ঠস্বর। বিস্মৃতির অতল থেকে সেদিন সন্ধ্যাবেলার সেই চিত্রখানি স্মৃতির আলোকে ফুটে উঠছে। অপরিচিত শহরে, স্যাকরাদের সেই স্বল্পালোকিত ঘরখানিতে কয়েকজন অপরিচিত লোকের মধ্যে ব'সে আছি। অদ্ভুত রহস্যময়

সেই সন্ন্যাসী আমার অতি পরিচিত গান গাইছেন। রবীন্দ্রনাথের সুরের মধ্যে মাঝে মাঝে তিনি নিজের সুরও মিশিয়ে দিচ্ছেন, তবুও কী ভালোই লাগছে সে-গান। ডাহা প্রেমের সঙ্গীত দ্রব্যগুণের সংস্পর্শে এসে যে আধ্যাত্মিক আরাধনায় এমন রূপান্তরিত হতে পারে সেদিন তার প্রমাণ পেয়েছিলুম।

সন্ন্যাসী একবার দু'বার তিনবার ফিরে ফিরে গানটা গাইলেন। গান শেষ হয়ে যাবার পর সবাই চুপচাপ ; কারো মুখে কোনো কথা নেই। শেষকালে সন্ন্যাসী বললেন—আজ তবে যাই, ভাই।

একজন বললে—একটু বসুন না, আজ আমাদের জলচর এসেছে—খেয়ে যাবেন।

সুন্দরজী ছোট ছেলের মতন তড়াক ক'রে উঠে প'ড়ে বললেন—ওরে বাবাঃ, আমি স্থলচর জীব। জলচর খেয়ে শেষকালে হাবুডুবু খেয়ে মরি আর কি!

ব'লেই 'হা হা' ক'রে হাসতে হাসতে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলেন।

এঁর সঙ্গে জীবনে আর আমার দেখা হয়নি।

সন্ন্যাসী চলে যাবার অল্পক্ষণ পরেই দলে দলে লোক আসতে লাগল। সমস্ত দিন ধ'রে দলে দলে লোক এসে সেই যে রহস্যময় প্রশ্ন করছিল এতক্ষণে তার সমাধান হল—আজ এদের মাছ রান্না হয়েছে। বোম্বাই শহরে সে-সময়ে বাঙালীদের বাড়ি ভাড়া দেবার সময় শর্ত করিয়ে নিত যে, তারা বাড়িতে কোনোরকমের আমিষ রান্না করবে না। এরা মাঝে মাঝে লুকিয়ে-চুরিয়ে মাছ রান্না করত। সে-সময়ে বোম্বাইয়ে সরষের তেলে রান্নার রেওয়াজ ছিল না। সব রান্নাই হ'ত বাদামের তেলে। বাদামের তেলে মাছ রাঁধলে তেমন গন্ধ ছোটে না। কিন্তু বাড়িওয়ালা ও প্রতিবেশীরা টের না পেলেও দূর-দূরান্তরবাসী বাঙালীর নাকে ঠিক গিয়ে পৌঁছতো সে-গন্ধ এবং অনেকে লৌকিকতার অপেক্ষা না ক'রেই মাছের লোভে এসে পড়তো এখানে।

যাই হোক, আগন্তুকদের মধ্যে অনেকেই আমার সম্বন্ধে কৌতূহল প্রকাশ করতে লাগলেন। আমি সদ্য বাংলাদেশ থেকে আসছি শুনে, 'স্বদেশী আন্দোলন' সম্বন্ধে অনেকে প্রশ্ন করতে লাগলেন। এঁদের মধ্যে অনেকেই দশ-বারো বছর পর্যন্ত দেশের মুখ দেখেননি। প্রাণপণে খেটে পয়সা জমিয়ে হয় দেশে ফিরবেন, না-হয় এখানেই কারবার খুলবেন—এই আশায় এখানকার সব কষ্ট সহ্য ক'রে দিন যাপন করছেন।

ব'সে ব'সে আমার অস্বস্তি বোধ হতে লাগল। সেই দুপুরে এসেছি, এদিকে রাত্রি প্রায় আটটা বাজল অথচ কিছুই বুঝতে পারছি না। ব্রহ্মানন্দজী কিংবা বন্ধুদের কারুরই দেখা নেই। ক্ষিদেও বেশ পেয়েছে। কি করি ভাবছি—এমন সময়ে খাবার ডাক পড়ল। সবাই ঘরের সেই চাঙে উঠে গেল—আমি কি করব ভাবছি, এমন সময় সেই অযোধ্যাদা আমাকে বললেন—ঠাকুরমশায়, চলুন খেতে।

দোতলায় উঠলুম। গোল-গোল কাঁচা শালপাতায় কাঁড়ি-প্রমাণ ভাত দেওয়া হয়েছে এক-একজনকে। সকলে ভাত ভেঙে নিয়ে ব'সে আছে কখন মাছ পড়বে। কয়েক মিনিট অপেক্ষা ক'রে সেই বহুপ্রত্যাশিত 'জলচর' পাতে পড়ল।

দেখলুম—ছোট ছোট ঘেঁচি ট্যাংরা মাছ, তাও আবার দু'খানা করা হয়েছে। মাছ কোটা হয়নি, তার মুখের দাড়ি-গোঁফ সবই রয়েছে—এমনকি গায়ের নাল পর্যন্ত। তার ওপরে কোনো মশলা নেই, বোধহয় ভাজাও হয়নি—সামান্য হলুদ দেওয়া হয়েছে কি না-হয়েছে। যিনি রেঁধেছেন, তিনি আবার নুন দেননি। নুন না দেবার কারণস্বরূপে তিনি বললেন—নুন যদি বেশি হয়ে যায় তা হ'লে এমন জিনিসটি অখাদ্য হয়ে যেতে পারে—বরঞ্চ খাবার সময় যে যে-রকম নুন খায় সেইরকম দিয়ে নিতে পারবে।

যাই হোক, পাতে পড়া-মাত্র সকলে হৈ হৈ ক'রে খেতে আরম্ভ ক'রে দিলে। সকলেই বলতে লাগল—রান্নাটি বেড়ে হয়েছে। আমি তো ভাত মুখেই তুলতে পারলুম না। আঁষটে গন্ধের চোটে ঠেলে বমি আসতে লাগল। কোনোরকমে শুকনো ভাত নুন দিয়ে ডেলা পাকিয়ে মুখের মধ্যে ঠেলে দিতে লাগলুম বমি আটকাবার জন্য। যিনি রান্না করেছিলেন তিনি একটু পরে আমায় জিজ্ঞাসা করলেন—ঠাকুরমশায়, রান্না কেমন হয়েছে?

মনে হল—ঠেসে একটি চড় কষিয়ে বুঝিয়ে দিই, রান্না কেমন হয়েছে! কিন্তু ভিক্ষার অন্ন—কাঁড়া-আকাঁড়া বিচার করতে নেই, এই আপ্তবাক্য স্মরণ ক'রে বললুম, বেশ হয়েছে—চমৎকার হয়েছে।

খাওয়ার পর্ব শেষ হয়ে যাবার পর মাছের কাঁটাগুলো একটা কাগজে মুড়ে একজন বেরিয়ে গেল সেগুলোকে দূরে কোনো রাস্তায় ফেলে দিয়ে আসতে।

আবার আমরা নিচে এসে বসলুম।

নিমন্ত্রিতেরা কিছুক্ষণ গল্পস্বল্প ক'রে যে যার ডেরায় চ'লে গেল। ব'সে ব'সে ভাবতে লাগলুম—আমার কি ব্যবস্থা হবে! দু'-একজন সেই মাদুরের ওপর

বিছানা পেতে শুয়ে পড়ল। আরও কিছুক্ষণ কেটে যাবার পর ব্রহ্মানন্দ উপস্থিত হলেন।

খাওয়া হয়েছে কিনা জিজ্ঞাসা ক'রে আমাকে ব্রহ্মানন্দ বললেন—এসো আমার সঙ্গে।

তখন বেশ রাত্রি হয়েছে। ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে প্রায় আধঘণ্টা এ-গলি সে-গলি ঘুরে ঘুরে অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার পল্লীতে একটা বড় বাড়ির মধ্যে ঢুকলুম। দোতলায় উঠে ব্রহ্মানন্দের পিছু পিছু একটা বড় ঘরের মধ্যে ঢুকলুম। ঢুকেই দেখি কালীচরণ ও পরিতোষ দু'জনেই সেখানে ব'সে আছে। তাদের দেখে এতক্ষণে ধড়ে প্রাণ এল।

ঘরখানি দিব্যি সাজানো। দেওয়ালে বড় বড় রবিবর্মার বাঁধানো ছবি টাঙানো। মেঝের খানিকটা গদি-পাতা। গদির সামনে দু'টো শাল পালিশ করবার চক্র রয়েছে। মেঝের বাকি অংশটুকুও চিত্র-বিচিত্র লিনোলিয়াম বিছানো। ঘরের এক কোণে খানকয়েক চেয়ারও রয়েছে। এই কারবারের মালিক যদুবাবু একাই কারিগর।

আমি যেতেই ভদ্রলোক স্মিতহাস্যে আমাকে অভিবাদন ক'রে বললেন—বসুন, আপনার খাওয়া-দাওয়া হয়েছে তো?

বললুম—হ্যাঁ, হয়েছে।

দেখলুম, যদুবাবু ব্রহ্মানন্দজীর খুবই অনুগত এবং বেশ বোঝা গেল যে, তাঁরই ইচ্ছায় তিনি আমাদের তিনজনকে সেখানে রাখতে রাজী হয়েছেন। অবিশ্যি ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধে তাঁর কি কথা হয়েছিল তা আজও আমাদের অজ্ঞাত। যাই হোক, কিছুক্ষণ পরে ব্রহ্মানন্দজী বিদায় নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। যদুবাবু বললেন—এবার শুয়ে পড়ুন।

পরদিন সকালবেলা উঠে স্নান সেরে আমরা বেরিয়ে পড়লুম শহর-পরিক্রমার উদ্দেশ্যে। প্রথমেই স্টেশনের কাছে এসে এক ইরানীর দোকানে ঢুকে চা খেলুম। সে-যুগে মুসলমান, গোয়ানিজ, ক্রীশ্চান ও পার্শী সম্প্রদায়ের লোক ছাড়া ইরানীর দোকানে কেউ ঢুকত না। আমরা ঢোকামাত্র দোকানের চাকর-বাকর থেকে আরম্ভ ক'রে খরিদ্দার পর্যন্ত সকলেই অবাক হয়ে দেখতে লাগল। একজন ছোকরা চাকর এসে আমাদের বললে—তোমরা বোধহয় ভুল ক'রে এখানে ঢুকেছ—এখানে হিন্দুরা ঢোকে না, কারণ এখানে মাংস রান্না হয়।

দোকানে ঢুকেই চমৎকার মাংস-রান্নার গন্ধ পাচ্ছিলুম বটে!

পরিচারকের কাছে মাংসের খবর পেয়ে আমরা উৎসাহিত হয়ে বললুম—ঠিক আছে, আমরা এখানে ইচ্ছে ক'রেই ঢুকেছি। মাংস-টাংস আছে?

ছেলেটি বললে—সকালবেলায় ডাল-গোস্ত পাওয়া যাবে।

—ডাল-গোস্তই সই—নিয়ে এস তিন প্লেট।

ডাল-গোস্ত এল। ডালের সঙ্গে মাংস রান্না হয়েছে। চমৎকার খেতে—এ জিনিসটি তখনো বাঙালী সমাজে প্রসারলাভ করেনি। অন্তত আমরা তিন-জনেই ডাল-গোস্ত এর আগে কখনো খাইনি।

দেখলুম, ইরানীদের দোকানে রান্না ভালো। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বাসনপত্র ও ঘর—অন্যান্য গুজরাটী ও মারাঠী দোকানের চেয়ে এদের দোকান অনেক উন্নত ধরনের। যাই হোক, খেয়েদেয়ে বেলা প্রায় এগারোটা অবধি শহর ঘুরে ঘুরে আমরা যদুবাবুর দোকানে ফিরে এলুম। যদুবাবু লোকটি দেখলুম অত্যন্ত স্বল্পভাষী। কাজ করতে করতে একবার মুখ তুলে আমাদের দেখে আবার আপনার কাজে মনোনিবেশ করলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি বললেন—আপনারা একটু অপেক্ষা করুন, আমি খেয়ে আসি।

ঘণ্টাখানেক পরে যদুবাবু একটি লোক সঙ্গে নিয়ে ফিরে এলেন। লোকটার হাতে দু'প্লেট খাবার। পাশের একটা ঘরে গিয়ে যদুবাবু দু'প্লেট খাবারকে তিন প্লেটে সাজিয়ে আমাদের বললেন—নিন্, খেয়ে নিন্।

খাওয়া-দাওয়া সেরে আবার বেরুনো গেল শহর পরিক্রমা করতে। সন্ধ্যে অবধি ঘুরে ঘুরে ডেরায় ফিরে এলুম।

সন্ধ্যের পরে দেখলুম যদুবাবুর ঘরে একে একে অনেকেই এসে উপস্থিত হতে লাগলেন। এঁরা সকলেই গয়না-তৈরির কাজ করতেন। দেখলুম আমাদের তিনজনের কথা প্রায় সকলেই জানেন। এঁদের মধ্যে এক ভদ্রলোক ছিলেন খুবই উৎসাহী—তিনি এখানকার বাঙালীদের নিয়ে একটা ক্লাব করবার উদ্যোগ করছিলেন। তিনি দু'টো-তিনটে গান গাইলেন। আমাদের বললেন—আপনারা এসে পড়ায় আমাদের ক্লাবের খুবই সুবিধে হল। মেয়েদের ভূমিকায় অভিনয় করবার মতন ছেলে আমাদের নেই।

তারপর বিশেষভাবে আমাকে ও পরিতোষকে বললেন—আপনাদের দ্বারা চমৎকার ফিমেল-পার্ট হবে।

আমরা বললুম—একটা কাজকর্ম না জুটলে এখানে থাকাই যে মুশকিল হবে।

ভদ্রলোক বললেন—কাজকর্ম একটা-না-একটা জুটেই যাবে।

ভদ্রলোকের কথা শুনে আশ্বস্ত হওয়া গেল। ভাবলুম, এবার আর কালা-মুখ নিয়ে বাড়িতে ফিরতে হবে না। একটা কাজকর্ম নিশ্চয়ই জুটে যাবে।

যদুবাবুর ওখানে দিন কাটতে লাগল। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে বেরিয়ে যাই। ঘুরে-টুরে বেলা এগারোটা আন্দাজ ফিরে এসে খেয়ে-দেয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম ক'রে আবার বেরিয়ে পড়ি। শহরময় ঘুরে ঘুরে দেখে বেড়াই কোথাও কোনো কাজ মেলে কিনা। মাঝে মাঝে ভদ্রলোক দেখে জিজ্ঞাসা করি—কোথাও চাকরি-বাকরি মেলে কিনা। সন্ধ্যের সময় ফিরে আসি। কোনো-কোনো দিন সে-সময় ব্রহ্মানন্দজী এসে আমাদের খুব বকাবকি করেন। সন্ধ্যার সময় যদুবাবুর ওখানে যাঁরা আসেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই প্রথম দিনে আমাদের খুবই উৎসাহ দিয়েছিলেন। কাজকর্ম একটা নিশ্চয়ই লেগে যাবে—এইরকম আশাও দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁরাও আমাদের সম্বন্ধে উদাসীন হয়ে পড়লেন। ওদিকে আমাদের অন্নদাতা যদুবাবু স্বল্পবাক্ হলেও তাঁর মুখের চেহারা ক্রমেই বদলাতে আরম্ভ করতে লাগল। বেশ বুঝতে পারলুম অচিরেই এখানকার অন্ন বন্ধ হবে।

একদিন এইরকম পথে পথে কাজের জন্য ঘুরছি, এমন সময় এক জায়গায় শুনতে পেলুম যে ডকে গেলে কাজ মিলতে পারে। সেখানে রোজই দিন হিসাবে ঠিকে লোক নেয়। কথাটা শুনেই ছুটলুম ডকে। তারপর এ-দরজা নয় ও-দরজা, এমনি ক'রে প্রায় তিন-চারটে দরজা ঘুরলুম—কিন্তু আমাদের বরাতে সব দরজাই বন্ধ। শেষকালে একটা দরজা খোলা পেয়ে ফট্ ক'রে ঢুকে পড়া গেল। শুনেছিলুম ডকে একজন বাঙালী ইঞ্জিনীয়ার কাজ করেন এবং তাঁর অধীনে অনেক কুলী আছে। তিনি ইচ্ছা করলে কুলী হিসাবে আমাদের নিতে পারেন।

ডকে ঢুকে আমরা এদিক-ওদিক করছি এমন সময়ে হৈ হৈ ক'রে দু'জন পুলিস-কনস্টেবল এসে একেবারে আমাদের গ্রেফতার করলে। কনস্টেবলদ্বয় আমাদের টানতে টানতে একেবারে গেটের কাছে নিয়ে গেল। তারা জিজ্ঞাসা করলে—কি চাই তোমাদের?

আমরা বললুম—এখানে বাঙালী ইঞ্জিনীয়ার আছেন, আমরা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই।

গেটের দরোয়ান বললে—আচ্ছা বোসো।

দরোয়ান বসতে বলায় কনস্টেবল হু'জন আমাদের ছেড়ে দিয়ে স্বস্থানে প্রস্থান করলে। আমরা ব'সে রইলুম। দরোয়ান ভেতরে চ'লে গেল ইঞ্জিনীয়ার-সাহেবকে খবর দিতে। কিছুক্ষণ পরে সে-ব্যক্তি ফিরে এসে আমাদের ডেকে নিয়ে গেল ভেতরে।

আমরা ইঞ্জিনীয়ার-সাহেবের সম্মুখীন হতেই তিনি রেগে চিৎকার ক'রে উঠলেন—কি চাই তোমাদের ?

বললুম—আপনার কাছে এসেছি কাজের আশায়। বিদেশে এসে বড় বিপদে পড়েছি। কাজ—যে-কোনো কাজ—কুলীর কাজ করতেও আমরা রাজী আছি।

ইঞ্জিনীয়ার-সাহেব রেগে বললেন—এখানে কাজ-টাজ কিছু নেই।

তারপর দরোয়ানকে হিন্দীতে বললেন—এদের বাইরে বার ক'রে দাও।

অভদ্রের মতো সে-ব্যক্তি আমাদের দূর করে তাড়িয়ে দিলেও সেদিন কিন্তু মনে মনে লোকটাকে ধন্যবাদই দিয়েছিলুম। কারণ তিনি যদি আমাদের ডেকে না পাঠাতেন তা হ'লে ডকে বিনা-অনুমতিতে প্রবেশ করার অপরাধে আমাদের থানায় যেতে হ'ত। তারপরে জীবনধারণের কোনো ন্যায্য উপায় দর্শাতে না পারলে কতদূর কি হ'ত তা বলা যায় না।

এইরকম সারাদিন ধ'রে চারদিক ঘুরে রাত্রিবেলা ডেরায় ফিরে এসে আমরা সেদিনের ঘটনাবলী যত্নবাবুর কাছে বলতুম। আগেই বলেছি—তিনি কথাবার্তা খুবই কম বলতেন। আমাদের কথা শুনে তাঁর মুখে যে ভাব ফুটে উঠত তাকে আর যাই হোক প্রসন্ন মুখচ্ছবি বলা যায় না। সত্যি বলতে কি, প্রতিদিন হু'বেলায় তিনজন লোকের খোরাক জোটানো একজন সামান্য ব্যবসায়ীর পক্ষে কঠিন ব্যাপার। শুধু ব্রহ্মানন্দজীর খাতিরে তখনো যত্নবাবু আমাদের বিদায় ক'রে দেননি। তবে আর বেশিদিন যে সেখানে আমাদের অন্ন নেই তা বেশ টের পেতে লাগলুম। পথে পথে চাকরির চেষ্টায় ঘুরে বেড়াই, চায়ের দোকানে গিয়ে জিজ্ঞাসা করি—কাপ-প্লেট ধোওয়ার লোকের দরকার আছে কিনা। সকলেই বলে—"না"। সকলেই সন্দেহের চোখে চায় যেন আমরা জেল ভেঙে পালিয়ে এসেছি। নিজেদের মধ্যে বলাবলি করি, আমেরিকার পথে পথে ঘুরলে এর চেয়ে সহজে কাজ জুটতে পারে। কী ক'রে সেই দেশে পৌছনো যায়—হায় রে দুরাশা!

একদিন দুপুরবেলা এইরকম অলি-গলিতে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে এক ছাতার কারখানা দেখে দাঁড়িয়ে গেলুম। দেখলুম অনেক কারিগর ভিন্ন ভিন্ন

জায়গায় ব'সে এক এক রকমের কাজ ক'রে চলেছে। ছেলেবেলায় আমাদের বাড়ির কাছেই একটা ছাতার বাঁটের কারখানা ছিল। কারিগরেরা বেঁকানো লোহার ছাঁচ গরম ক'রে তলতা বাঁশকে কত সহজে বেঁকিয়ে ফেলত—আমরা সময় পেলেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মিস্ত্রীদের সেই কারিগরি দেখতুম আর ভাবতুম —আমাদের দিলে আমরাও ওরকম করতে পারি। এখানেও দেখলুম এক জায়গায় ব'সে অনেকগুলি কারিগর একটার পর একটা বাঁশ ঐরকম বেঁকিয়ে চলেছে।

কিছুক্ষণ বাদেই বুঝতে পারলুম—কারিগরদের মধ্যে আমাদের নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে আমরা সেখান থেকে আস্তে আস্তে সরে পড়ব কিনা ভাবছি এমন সময় শুনতে পেলুম—কবে আসা হয়েছে ?

অপ্রত্যাশিতভাবে মাতৃভাষা শুনে চমক লাগল। কোথা থেকে প্রশ্নটা এল তারই খোঁজ করছি এমন সময় একজন কারিগর আঙুল দিয়ে একজনকে দেখিয়ে দিলে। দেখলুম দূরে একজন অল্পবয়স্ক কারিগর আমাদের হাতছানি দিয়ে ডাকছে। আমরা তিনজনই উনুন, হাঁড়ার স্তূপাকার বাঁশের পাহাড় এড়িয়ে এড়িয়ে লোকটির কাছে গেলুম। অত্যন্ত রোগা, মাথায় বড় বড় চুল—আমাদেরই বয়সী ছেলেটি। সে বললে—বোসো এখানে। এই পাণ্ডববর্জিত দেশে কি করতে এসেছ ? বেশ বুঝতে পারছি ভেগেছ।

জিজ্ঞাসা করলুম—তোমার বাড়ি কোথায় ?

সে বললে—আরে ভাই, বাড়িঘর থাকলে কি কেউ এখানে আসে ? আমার বাড়িঘর কিছু নেই, পৃথিবীতে আপনার বলতেও কেউ নেই, তাই এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াই।

এমন করুণ সুরে সে কথাগুলো বলল যে, মনে গিয়ে লাগল। বললুম—আমরা এসেছি ভাগ্যের সন্ধানে।

—তা ভাগ্যে কি কিছু জুটেছে ?

—এখনো জোটেনি। এক জায়গায় খাওয়া-শোওয়া চলছে বটে, কিন্তু আর বেশিদিন সেখানে চলবে ব'লে মনে হয় না।

ছেলেটি হেসে বললে—আমরা এই ঘরে জনকয়েক মিলে শুই, তা রাত্রি ন'টার পর শেঠ চ'লে যায়, তখন তোমরা এসে অনায়াসে এখানে শুতে পার। রতনেই রতন চেনে বুঝলে ভাই ! আশ্রয় না থাকার কষ্টে সারাজীবন ধ'রে ভুগছি কিনা !

জিজ্ঞাসা করলুম—ভাই, তোমাদের এই কারখানায় তো দেখছি অনেক লোক কাজ করছে, তা আমাদের কোনো কাজ-টাজ হয় না এখানে ?

খানিকক্ষণ আমাদের মুখের দিকে চেয়ে সে জিজ্ঞাসা করলে—কাজ করবে ? কিছু কাজ জানা আছে ?

বললুম—কাজ তো কিছুই জানি না, তবে মনে হয় এই তলতা-বেঁকানো কাজ খুবই সহজ।

সে বললে—হ্যাঁ, এ কাজ খুবই সহজ। আর এর জন্য মজুরিও ভালো পাওয়া যায়—প্রত্যেক বাঁশের জন্য একপয়সা। আমি মাস গেলে প্রায় চল্লিশ টাকা কামাই। একটি পয়সাও থাকে না—সবই খরচ হয়ে যায়।

ছেলেটি আমাদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে কাজ ক'রে চলল। কিছুক্ষণ পরে সে বলল—এই বাঁশ-বেঁকানো কাজ করতে পারবে ?

বললুম—ও আর কি! নিশ্চয়ই পারব।

আরও কিছুক্ষণ নীরবে কাটবার পর সে চুপি চুপি আমাদের বললে—দেখ, তোমাদের শেঠের কাছে নিয়ে গিয়ে বলব, এরা কলকাতা থেকে এসেছে, খু-উ-ব ভালো কারিগর। শেঠ জিজ্ঞাসা করবে—কলকাতায় তোমরা কোথায় কাজ করতে? বলবে—মহেন্দ্র দত্তের ছাতার কারখানায়। চল, যাওয়া যাক শেঠের কাছে।

ওখানে যাবার আগে সে বললে—আমার নাম যোগেন মল্লিক। তোমাদের নাম কি ?

আমরা নাম বললুম—তারপর দুরুদুরু বক্ষে শেঠের কাছে গিয়ে হাজির হওয়া গেল। যোগেন বললে—এরা খুব ভালো কারিগর। সম্প্রতি বোম্বাইয়ে বেড়াতে এসেছে, দু'দিন পরেই চ'লে যাবে। আমি বলছি—পয়সা যদি রোজগার করতে চাও তো বোম্বাইয়ের তুল্য আর স্থান নেই।

শেঠ জিজ্ঞাসা করলে—কাজ করবে ?

ঘাড় নেড়ে জানালুম—করব।

—এর আগে কোথায় কাজ করতে ?

—মহেন্দ্র দত্তর কারখানায়।

শেঠ আবার জিজ্ঞাসা করলে—সেখানে বাঁশ-প্রতি কত দেয় ?

—ব্যস্! বাঁশ-প্রতি কত দেয় তাই ভাবতে লাগলুম। আমাদের অবস্থা দেখে যোগেন উত্তর দিল—দু'বাঁশে তিন পয়সা।

শেঠ যোগেনকে জিজ্ঞাসা করল—পারবে তো?

যোগেন বললে—হুজুর এরা খুব ভালো কারিগর। আমরা সব পাশাপাশি ব'সে কাজ করেছি।

শেঠ আমাদের বললে—আমার এখানে একটা বাঁশে একপয়সা পাবে—রাজী আছ?

বলা বাহুল্য তৎক্ষণাৎ রাজী হয়ে গেলুম। শেঠ লোক ডেকে ব'লে দিলেন আমাদের জন্য একটা উনুন ও হাপর ঠিক ক'রে দিতে। তিনজনকে তিনটে তাতল অর্থাৎ বাঁশ বেঁকাবার ফর্মা ও তাতল ঠাণ্ডা করবার জন্য এক গামলা জলও দেওয়া হল। পরমোৎসাহে কাজও আরম্ভ ক'রে দেওয়া গেল। কারখানার মুন্সী আমাদের তিনজনকে গুনে পঞ্চাশখানা ক'রে তলতা বাঁশ দিয়ে গেল।

ও কাজের আমরা কিছুই জানতুম না, কিন্তু কাজ অত্যন্ত সহজ। একদিন কি দু'দিন শিখতে পেলে আমরা অন্য কারিগরদের চেয়ে হয়তো ভালোই করতে পারতুম। কিন্তু পূর্বের কোনো অভিজ্ঞতা না থাকায় প্রথমেই আমি পাঁচ-ছ'খানা বাঁশ একেবারে পুড়িয়ে ফেললুম। তারপরে আর পাঁচ-ছ'খানাকে বেঁকিয়ে ফেললুম বটে, কিন্তু তা দিয়ে ছাতার বাঁট হওয়া সম্ভব নয়। আমি তো যা হয় একরকম ক'রে চলেছিলুম, ওদিকে পরিতোষ ও কালীচরণ একেবারে অগ্নিকাণ্ড ক'রে ফেললে। তারা এক-একজনে আট-দশগাছা ক'রে বাঁশ নষ্ট তো করলেই, তা ছাড়া অনবধানতায় সেই অগ্নিবর্ণ তাতল বাঁশের স্তূপের ওপর রাখায় শুকনো বাঁশে ধ'রে গেল আগুন।

কারিগরেরা সবাই হৈ হৈ ক'রে উঠল। প্রত্যেকের কাছেই একটা ক'রে গামলায় জল ছিল, তারা এসে সেই জল দিয়ে আগুন নিভিয়ে ফেললে। ওদিকে হৈ হৈ শুনে শেঠ ও আরও অনেক লোক ছুটে এসে কলকাতার ভালো কারিগরদের কারিগরি দেখে একেবারে ক্ষিপ্তপ্রায় হয়ে উঠল। শেঠ আমাদের ও সেই সঙ্গে যোগেনকে বিশ্রী ভাষায় গালিগালাজ করতে লাগল; যোগেনকে বললে—তুমি এখুনি তোমার এই জাতভাইদের নিয়ে বেরিয়ে যাও—নইলে আমি পুলিস ডাকব।

যোগেন বললে—আমিও তোমার মতো শেঠের কাছে কাজ-কর্ম করতে চাইনে। আমার হপ্তা চুকিয়ে দাও।

শেঠ বললে—তোমার জন্য আমার প্রায় দশ টাকা লোকসান হয়েছে—আবার হপ্তা! কিছু পাবে না, যা ইচ্ছে হয় তোমার কর।

আরও কিছুক্ষণ বকাবকির পর যোগেন বললে—আচ্ছা, কি ক'রে টাকা আদায় করতে হয় তা দেখিয়ে দেব।

কারখানার এক কোণে যোগেনের সংসার প'ড়ে ছিল—খান-দুয়েক ধুতি, একটা না দু'টো শার্ট-গোছের জামা, একজোড়া ছেঁড়া জুতো আর একটা বিছানার চাদর-গোছের জিনিস। সব ক'টা মিলিয়ে একটা পুঁটলি বেঁধে যোগেন বললে—চল।

বাইরে বেরিয়ে এসে সে বলতে লাগল—আট মাস এখানে রুটি বাঁধা ছিল—ক'দিন থেকেই এ-কাজ আর ভালো লাগছিল না। ভাবছিলুম—কি ক'রে রেহাই পাওয়া যায়।

আমরা আর কি বলব! বেচারা বিদেশে কোনোরকমে অন্নসংস্থানের যোগাড় করেছিল. আমাদের জন্যই সেটা নষ্ট হল—এই চিন্তা আমাদের তিন-জনকেই পীড়া দিতে লাগল।

পথ চলতে চলতে সন্ধ্যা নেমে এল। চারিদিকের দোকানে আলো জ্বলে উঠতে লাগল। একটা গলির মোড়ে বরাবর এসে যোগেন বললে—আচ্ছা ভাই, চলি এবার।

যোগেনকে জিজ্ঞাসা করলুম—কোথায় যাবে?

সে বললে—কোথায় যাব তা কি ক'রে বলি। চলতে তো আরম্ভ করি তারপরে যেখানে অন্ন মাপা আছে সেইখানেই যাব।

আমাদের কাছে তখনো গোটা পনেরো টাকা ছিল, তা থেকে পাঁচটা তাকে দিলুম। যোগেন বিনা দ্বিধায় টাকা পাঁচটা ট্যাকে পুরতে পুরতে বললে—তোমাদের কিছু আছে তো?

বললুম—আছে কিছু।

যোগেন বললে—আচ্ছা, আবার দেখা হবে।

এখনো যেন দেখতে পাচ্ছি, পুঁটুলি-বগল-দাবা যোগেন সেই সরু রাস্তা দিয়ে চ'লে যাচ্ছে অনির্দিষ্টের সন্ধানে—যেখানে তার ভবিষ্যতের অন্ন মাপা আছে। দেখতে দেখতে সে পথের জনস্রোতের সঙ্গে মিলিয়ে গেল। আর তাকে দেখতে পেলুম না। বিচিত্র এক রহস্যসূত্রে কয়েক ঘণ্টার জন্য সে বাঁধা পড়েছিল আমার জীবনের সঙ্গে; আর তার সঙ্গে কখনো দেখা হয়নি। কোথায় জন্মভূমি তার বাংলাদেশের কোন্ এক পল্লীতে, কোন্ দূর দেশে এসে সে দু'টি অন্নের সংস্থান করেছিল—কোথা থেকে আমরা এসে তার কর্মচ্যুতির কারণ হয়ে দাঁড়ালুম।

এর সবটাই কি হঠাতের খেলা, না সবটাই পূর্বনির্ধারিত! সারা জীবন ধ'রেই এই রহাস্যের জট ছাড়াবার চেষ্টা করছি।

একদিন যদুবাবুকে মুখ ফুটে ব'লে ফেলা গেল—এরকম ক'রে আপনি কতদিন আর আমাদের খাওয়াবেন। আমাদের কিছু কিছু ক'রে কাজ দিন নয়তো আপনি একটু একটু কাজ শেখান, যাতে ভবিষ্যতে আমরা আপনার সাহায্য করতে পারি। আপনার কারবারও বড় হবে।

আমাদের কথা শুনে যদুবাবু আরও মৌন হয়ে পড়লেন।

সে-সময় হর্নবি রোডের ওপরে সলভেশন-আর্মিদের একটা বড় আস্তানা ছিল। কলকাতায় সলভেশন-আর্মিদের চেহারা ও কার্যকলাপ আমাদের জানা ছিল। একদিন কিরকম খেয়াল হল নিজেদের মধ্যে ঠিক করা গেল যে, ওদের কাছে গিয়ে বলব যে তোমরা যদি আমাদের কাজ দাও, তা হ'লে আমরা ক্রীশ্চান হতে রাজী আছি।

মতলব ঠিক ক'রে একদিন বেলা এগারোটার সময় সলভেশন-আর্মির বাড়িতে ঢুকে পড়া গেল। সিঁড়ি দিয়ে উঠে সামনেই কাঠের পার্টিশন দেওয়া এক ঘরের মধ্যে জনকয়েক সাদা-চামড়ার লোক গেরুয়া রঙের লুঙ্গি প'রে টেবিলে ব'সে ছিল। আমাদের 'বাবা কালী' ছিল আগে—বোধহয় তার চেহারা দেখে একজন লোক প্রায় তাড়া ক'রে ছুটে এসে জিজ্ঞাসা করলে—কি, কি চাই তোমাদের?

বাবা কালী সোজা ব'লে ফেললে—আমরা তিনজনে ক্রীশ্চান হতে এসেছি। তিন-তিনটি আত্মা ব্যাকুল হয়ে উদ্ধারের আশায় এসেছে দেখে লোকটি প্রথমে হকচকিয়ে গেল। তারপর আমাদের এক জায়গায় বসতে ব'লে সেই টেবিলে ফিরে গিয়ে তাদের কি বললে। ওদের মধ্যে একজন মুরুব্বি-গোছের লোক উঠে এসে আমাদের সামনে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বললে হ্যাঁ, কি চাই তোমাদের?

আমরা বললুম—আমরা শুনেছি, ক্রীশ্চান হলে নাকি আপনারা কাজকর্ম দেন। চাকরির অভাবে আমরা বড় কষ্ট পাচ্ছি—চাকরি পেলে আমরা ক্রীশ্চান হতে রাজী আছি।

লোকটি ধীরভাবে আমাদের কথা শুনে অত্যন্ত মিষ্টি ক'রে জিজ্ঞাসা করলে—তোমরা কোথাকার লোক?

—কলকাতার।

যাঁহাতক কলকাতার নাম শোনা—অমনি সে যেন দপ ক'রে জ্বলে উঠল। একেবারে রেগে টেবিলের ওপর ঘুষো মেরে বললে—তোমরা কোথায় শুনেছ যে আমরা চাকরি দিয়ে লোককে ক্রীশ্চান করি?—কে বলেছে তোমাদের এইসব গল্প?

বললুম—পৃথিবী-সুদ্ধ লোক এই কথা বলে।

আমাদের কথা শুনে লোকটা আরও রেগে গিয়ে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে চিৎকার ক'রে আমাদের বললে—যাও—যাও এখান থেকে—

বলা বাহুল্য আর দ্বিরুক্তি না ক'রে একরকম ছুটেই আমরা ঘর থেকে বেরিয়ে এলুম। আমরা চাকরি পাবার আশায় ক্রীশ্চান হবার জন্য সলভেশন-আর্মির ওখানে গিয়েছিলুম শুনে সেদিন সন্ধ্যার পর ব্রহ্মানন্দজী বললেন—দশ বছরের মধ্যে ঐ সলভেশন-আর্মির দলকে বোম্বাই-ছাড়া ক'রে দেব।

পাঁচ বছর পরে বোম্বাই গিয়ে দেখি সেখানে সলভেশন-আর্মির ক্ষেত জমে গেছে—ব্রহ্মানন্দজীর খোঁজ করেছিলুম কিন্তু তাঁকে খুঁজে পাইনি।

সেদিন ব্রহ্মানন্দজীকে অত্যন্ত উত্তেজিত দেখা গেল। তাঁর বকুনিগুলোও যেন মাত্রা ছাড়িয়ে যেতে লাগল। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের যদুবাবুও দু'-একটা কথা বলতে লাগলেন। বেশ বুঝতে পারা গেল যে, আমাদের হাতে নিয়ে তিনি বেশ মুশকিলে প'ড়ে গেছেন। অনেকক্ষণ বকাবকির পর তিনি আমাকে পরীক্ষা করবার জন্য এক-পাতা বাংলা লিখে বললেন—ইংরিজীতে তর্জমা কর তো দেখি?

অত্যন্ত সোজা কয়েকটি বাক্য তাতে লেখা ছিল—খুব সহজেই তা নির্ভুল তর্জমা ক'রে ফেললুম। আমার হাত থেকে কাগজখানা নিয়ে প'ড়ে ব্রহ্মানন্দজী বললেন—কাল সকালে তোমাকে এক জায়গায় নিয়ে গিয়ে কাজে লাগিয়ে দেব। মন দিয়ে কাজ করলে ভবিষ্যতে উন্নতি করতে পারবে।

ব্রহ্মানন্দজী বেরিয়ে গেলেন। আমরাও নিশ্চিন্ত হয়ে শুয়ে পড়লুম—যাক্, এতদিনে দুঃখের অন্ত হল। একজনের জুটলে আস্তে আস্তে আর দু'জনেরও জুটে যাবে।

সকালবেলা উঠে তাড়াতাড়ি স্নান সেরে বসে রইলুম—ব্রহ্মানন্দজীর আশায়। বলা বাহুল্য সেদিন আর সকালবেলায় চরতে বেরুলুম না। বসে অপেক্ষা করতে লাগলুম—ব্রহ্মানন্দজী আর আসেনই না। পরিতোষ ও কালীর সঙ্গে

কথা হয়ে রইল যে ব্রহ্মানন্দজী আমাকে যখন নিয়ে যাবেন তখন তারাও দূর থেকে আমাদের পেছনে পেছনে এসে আমার কর্মস্থানটি দেখে যাবে।

বেলা প্রায় এগারোটার সময় ব্রহ্মানন্দজী এসে আমাকে বললেন—তৈরি আছ, আচ্ছা চল।

বলা বাহুল্য তৈরিই ছিলুম—বলামাত্র উঠে তাঁর সঙ্গ নিলুম।

ব্রহ্মানন্দজী আমাকে নিয়ে অনেক রাস্তা ভেঙে বেশ একটা বড় রাস্তার ওপরে একখানা বড় বাড়ির মধ্যে ঢুকলেন। সেই বাড়ির তিন কি চারতলায় একখানা বড় ঘরে গিয়ে আমরা ঢুকলুম।

প্রকাণ্ড আলো-হাওয়া-ওয়ালা ঘরে। ঘরের মধ্যে বোধহয় দশ-বারোটি কারিগর ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় ব'সে কাজ করছে—কারিগরদের চেহারাও অন্য জায়গার কারিগরদের চেয়ে অনেক ভালো। আমরা সেখানে ঢোকামাত্র ঘরের প্রায় সকলেই হর্ষধ্বনি ক'রে উঠল। বুঝতে পারা গেল যে, তারা আমাদের প্রতীক্ষা করছিল। সেখানকার একজন মুরুব্বি-গোছের লোক এগিয়ে এসে ব্রহ্মানন্দজীকে বললে—এই ছেলেটি বুঝি ?

ব্রহ্মানন্দজী বললেন—হ্যাঁ, এর কথাই বলেছিলুম তোমাদের। একে তোমাদের কাজ শেখাও। ব্রাহ্মণের ছেলে—সব কাজই চলবে।

লোকটি আমাকে খাতির ক'রে এক জায়গায় বসালে। ছু'-একজন কারিগর কাজ ফেলে আমার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করতে লাগল কলকাতার খবর—স্বদেশী আন্দোলনের খবর।

এরা বাংলাদেশের ছেলে। অনেকদিন দেশে যায়নি। সপ্তাহে একখানা ক'রে বাংলা সংবাদপত্র আসে বটে, কিন্তু তা প'ড়ে মন ভরে না। নানারকমের কথা—তার মধ্যে ক্ষুদিরাম আর প্রফুল্ল চাকীর কথাই বেশি। একজন বললে—ক্ষুদিরামের যে চেহারা কাগজে বেরিয়েছে তার সঙ্গে আপনার চেহারার অদ্ভুত সাদৃশ্য আছে।

কিছুক্ষণ কথাবার্তা চলবার পর ব্রহ্মানন্দজী বিদায় নিলেন।

তখন বেলা বোধ হয় বারোটা। কারিগরেরা একে একে উঠে স্নান করতে যেতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে সেই মুরুব্বি-মতন লোকটি এসে আমাকে বললে—চলুন ঠাকুরমশায়, খেয়ে নেবেন চলুন।

পাশেই একখানা ঘরের মধ্যে গিয়ে দেখলুম সেখানে অনেকেই খেতে বসেছে। এনামেলের থাল জুড়ে এক-একজন ভাত নিয়ে বসেছে—অন্নকূট দেখবার পুণ্য

সেইখানেই হয়ে গেল। আমার পাত্রের তিনভাগ ভাত তুলে দিতে তারা সকলেই হৈ হৈ ক'রে উঠল—ঐ ক'টা ভাত খেয়ে বাঁচবেন কি ক'রে!

ইতিমধ্যে পাতে ডাল আর তরকারি এসে পড়ল। সে রান্নার স্বাদ আজও আমার রসনায় লেগে আছে। ডাল নামে যে ময়লা জল পাতে এসে পড়ল তা দেখতেই ময়লা কিন্তু তাতে ভাতে রঙ ধরল না। তার বর্ণ, গন্ধ ও স্বাদে কিছুতেই বোঝা গেল না সেটা কি ডাল। তরকারি নামে পদার্থটি দেওয়া হল তার সম্বন্ধেও ঐ কথাই বলা চলে। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এই যে ডাল কিংবা তরকারিতে কোনো স্বাদ নেই। বেসুরো গান সকলেই গায়, কিন্তু প্রত্যেক পর্দায় বেসুরো আওয়াজ বার করা যার-তার কর্ম নয়। তেমনি বিস্বাদ রান্না রাঁধা যায়, কিন্তু একেবারে স্বাদহীন রান্না এর পরে আর কোথাও খাইনি।

যাই হোক, আহারাদি সেরে আবার সবাই এসে বড় ঘরে বসল। তাদের পেছনে পেছনে আমি এলুম। একটা-দু'টো বিড়ি ওড়বার পর-আগে যে মুরুব্বি-মতন লোকটির কথা বলেছি, এগিয়ে এসে আমাকে বেশ চেঁচিয়ে বললে—ঠাকুরমশায়! এবার আপনার সঙ্গে কথাটা কয়ে নেওয়া যাক।

তাঁর কথা শুনে দেখলুম আরও অনেকে ঘেঁষে কাছে সরে এলেন। লোকটি বললে—ব্রহ্মানন্দজী আপনাকে কিছু বলেছেন কি?

আমি বললুম—কৈ, ব্রহ্মানন্দজী তো কিছুই বলেননি!

লোকটি বিস্মিত হয়ে বললে—সে কি! আমাদের এখানে কেন নিয়ে এলেন সে-সম্বন্ধে কোনো কথা হয়নি? আপনিও তাঁকে কিছু জিজ্ঞাসা করেননি?

বললুম—না, তিনিও কিছু বলেননি, আমিও কিছু জিজ্ঞাসা করিনি। তবে আমার মনে হয়, আপনাদের এখানে কাজ শেখাবার জন্য আমাকে আনা হয়েছে।

লোকটি আরও বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল—কি কাজ?

—এই যে কাজ আপনারা করেন—গয়না-তৈরির কাজ।

আমার কথা শুনে লোকটি হো হো ক'রে হেসে উঠল। তার দেখাদেখি আরও অনেকে কেউ সশব্দে কেউ-বা দেঁতো হাসি হাসলে। হাসির পর্ব চুকে গেলে লোকটি বললে—বেশ তো, আপনি ব্রাহ্মণ, আপনি আমাদের কাছে কাজ শিখবেন, এ তো আমাদের ভাগ্যের কথা। কিন্তু কাজ শেখবার আগে অন্ততঃ দু'-এক বছর আমাদের রেঁধে খাওয়াতে হবে। ও-বেলা থেকেই কাজে লেগে যান।

লোকটির কথা শুনে তো আমার মাথা চক্কর খেতে আরম্ভ করলে। বেশ

বুঝতে পারা গেল, আমার গলায় পৈতে দেখে আমাকে দিয়ে পাচকের কাজ করাবার জন্য আনা হয়েছে এখানে। চুপ ক'রে ভাবতে লাগলুম—এখন কি প্যাঁচে এদের কাত করা যায়।

কিছুক্ষণ কেটে যাবার পর লোকটি জিজ্ঞাসা করলে—কি বলছেন ঠাকুরমশায়? কৈ কিছু বললেন না তো?

আমি বললুম—আপনারা ক'জন আছেন? ক'জনের রান্না আমায় রাঁধতে হবে?

—আমরা জন-দশেক আছি, আরও মাঝে মাঝে দু'-একজন বাড়তে পারে।

আমি বললুম—বেশ। রাঁধতে আমি রাজী আছি, কিন্তু জন-প্রতি আমায় তিন টাকা দিতে হবে—অর্থাৎ দশজনের জন্য ত্রিশ টাকা—লোক যেমন যেমন বাড়বে, জন-প্রতি তিন টাকা বাড়বে।

বলব কি—আমার কথা শুনে তারা প্রায় শুয়ে পড়ল—বলেন কি! জনপ্রতি তিন—ন—টা—কা!!

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

তখন সেই মুরুব্বি বললে—আর আপনি যে দু'বেলা খাবেন এখানে, তার দাম কে দেবে?

বললুম—আপনি কি ক্ষেপেছেন! আপনাদের এখানে ঐ খাওয়া খেয়ে আর আমাকে দশজনের রান্না রাঁধতে হবে না। আমি অন্যত্র খাব। তা ছাড়া আপনাদের ঐ স্টাইলের রান্না রাঁধতে আমি জানি না; তবে দু'-একদিন শিখিয়ে দিলে নিশ্চয় পারব।

একজন জিজ্ঞাসা করলে—কি স্টাইলের রান্না আপনি রাঁধতে পারেন?

বললুম—মুরগী-টুরগী রান্নার অভ্যেস আছে। খাসীর মাংসও রাঁধতে পারি।

মুরগীর নাম শুনে বোধহয় পাঁচজন একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল—আপনি মুরগী খান!!

—মুরগী খাই বই কি। পেলেই খাই। কালও খেয়েছি।

মুরুব্বি এতক্ষণ চুপ ক'রে ছিল। এবার জিজ্ঞাসা করলে—এখানে মুরগী পেলেন কোথায়?

—কেন? ইরানীদের দোকানে যথেষ্ট পাওয়া যায়।

—সর্বনাশ! আপনারা ইরানীদের দোকানে যান!

—তা ক্বচিৎ পানেচ্ছা হলে যাই বইকি।

—অ্যাঁ !! ওরা মোচলমান—তা জানেন কি ?

বিনীতভাবে বললাম—আজ্ঞে না, আপনারা জানেন না, ইরানীরা মুসলমান নয়, ওরা অগ্নি-উপাসক—হিন্দুরাও আগুনকে দেবতা ব'লে মানে। আর আপনারা বোধহয় জানেন না, স্বদেশী আন্দোলনের পর বাংলাদেশে হিন্দু-মুসলমানে আর ভেদ নাই।

আমার এই কথা শুনে সবাই চুপ ক'রে গেল—কেউ কেউ বিড়ি বার ক'রে ফুঁকতে আরম্ভ ক'রে দিলে। কিছুক্ষণ এইভাবে চুপচাপ কাটবার পর একজন নিজের মনেই বললে—ব্রহ্মানন্দজী খুব লোক ঠিক ক'রে দিয়েছিলেন যা হোক !

আরও কিছুক্ষণ কেটে গেল। মনে করলুম—আর ব'সে থেকে কি হবে, এবার উঠে পড়া যাক। এমন সময় সেই মুরুব্বি লোকটি বললে—দেখুন ঠাকুর-মশায় ! আমরা লেখাপড়া জানি না বটে, কিন্তু সিধে লোক। আপনাকে নিয়ে এসেছিলুম এইজন্য যে, আপনিও কাজ শিখবেন, আমাদেরও অনেক সুবিধে হবে। কিন্তু আপনার কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছে যে, আপনাকে দিয়ে আমাদের সুবিধা হবে না।

আর কথা না বাড়িয়ে সেখান থেকে উঠে পড়া গেল। রাস্তায় নেমে মনে হল এখন যদুবাবুর ওখানে গেলে বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হবে না। কাজেই রাস্তায় ঘুরে ঘুরে সন্ধ্যার সময় তারা ফিরলে সেখানে গিয়ে হাজির হওয়া যাবে।

সন্ধ্যার একটু পরে যদুবাবুর ওখানে গিয়ে হাজির হলুম। বন্ধুরা তখন চরা ক'রে ফিরেছেন।

দেখলুম সেখানে আরও অনেকগুলি বাঙালী রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ব্রহ্মানন্দজীও আছেন। আমরা যে মুরগী খাই সে-কথা সেখানকার কারিগর সম্প্রদায়ের মধ্যে ইতিমধ্যে রাষ্ট্র হয়ে গিয়েছে এবং যাঁরা আমাদের কখনো দেখেননি, তাঁরাও অনেকে দেখতে এসেছেন। আমি সেখানে গিয়ে দেখলুম, আমার বন্ধুদ্বয় জেরায় জেরবার হয়ে মৌনব্রত অবলম্বন করেছেন—পক্ষান্তরে আমাদের চিরমৌন যদুবাবু মুখ খুলেছেন। আমি সেখানে উপস্থিত হওয়ামাত্র তাঁরা কালী ও পরিতোষকে ছেড়ে আমায় আক্রমণ করলেন। যাঁরা আমাকে রন্ধনকার্যে নিয়োগ করবার জন্য সেদিন দুপুরে নিয়ে গিয়েছিলেন, দেখলুম তাঁদেরও দু'-তিনজন লোক সেখানে উপস্থিত রয়েছেন। আমি বসতেই ব্রহ্মানন্দজী আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন—তোমরা মুরগী খাও ?

বললুম—হ্যাঁ, পেলেই খাই।

একজন বললেন—লজ্জা করে না হিন্দুর ছেলে হয়ে মুরগী খেতে?

আমি ঠেস দিয়ে বললুম—হিন্দুর ছেলে হয়ে ব্যবসার নামে লোকে চুরি-জুচ্চুরি করছে—আমরা তো সামান্য মুরগী খেয়েছি।

আমার এই মন্তব্য শুনে সেখানে উপস্থিত সবাই একেবারে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন। যদুবাবু স্পষ্টই ব'লে দিলেন—দেখুন, আমার এখানে আপনাদের আর স্থান হবে না। এখান থেকে বেরিয়ে যান।

অকস্মাৎ আমাদের ওপর এই চরম দণ্ড উচ্চারিত হওয়ামাত্র সভাক্ষেত্র নিস্তব্ধ হয়ে পড়ল। আমাদের সামান্য জিনিসপত্র যা ছিল, গুটিয়ে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলুম।

তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে। একদিন অনেক রাত্রে ব্রহ্মানন্দজীর সঙ্গে সেই জলচর খেয়ে এসে যদুবাবুর আস্তানায় ঢুকেছিলুম—সেই সময়টুকু ছাড়া রাতের বোম্বাই দেখবার সুবিধা আর হয়নি। যদুবাবুর ওখানে থাকতে পাছে তিনি কিছু মনে করেন, সেইজন্য সন্ধ্যা হবার আগেই আমরা ফিরে আসতুম। রাস্তায় নেমে পথ চলতে আরম্ভ ক'রে দিলুম। পথের সঙ্গে আমার পরিচয় খুবই ঘনিষ্ঠ, পরিতোষের কাছেও পথ খুব অপরিচিত ছিল না। মুখে কিছু না বললেও, দেখলুম, আমাদের কালীচরণ একটু বিব্রত হয়ে পড়েছে, কিন্তু সে-কথা স্বীকার না ক'রে সে বলতে লাগল—দেখাই যাক না, কোথাকার জল কোথায় দাঁড়ায়!

আবার পথ চলার শুরু হল। তখন কলকাতায় বছর-কয়েক হল বিজলী-বাতির প্রচলন হলেও ধনীর প্রাসাদ বা চৌরঙ্গীর বা লালদীঘির বড় বড় দোকান ছাড়া বিজলীবাতি দিশীপাড়ায় কমই দেখা যেত। কিন্তু সেদিন বোম্বাইয়ের পথে দেখলুম—দু'পাশের সমস্ত দোকান, এমনকি পানের দোকানেও বিজলীবাতি জ্বলছে আর তারই আলোয় সমস্ত পথঘাট ঝলমল করছে। ধনশালী-বণিক-প্রেয়সী বোম্বাই নগরীর সেই সন্ধ্যাবেলার সজ্জা আমাদের সদ্য-আশ্রয়চ্যুত মনকেও আকর্ষণ ক'রে নিলে। তখনো আমাদের কাছে কয়েকটা টাকা ছিল—ছাতার কারখানায় কুড়িয়ে-পাওয়া বন্ধু যোগেনকে পাঁচটা টাকা দেবার পর থেকে আমরা পয়সা খরচ করা একদম বন্ধ ক'রে দিয়েছিলুম। কারণ এ-দিন যে আসবেই তা আমি ও পরিতোষ দু'জনেই জানতুম।

রাস্তায় ঘুরতে ঘুরতে আমাদের পরামর্শ চলতে লাগল। আমরা শুনেছিলুম যে, মালাবার পাহাড়ের সর্বোচ্চ স্থান থেকে রাত্রিবেলা বোম্বাই নগরীর দৃশ্য অতি

সুন্দর। পথ চলতে চলতে ঠিক করা গেল—মালাবারে যাওয়া যাক। যাঁহাতক মনে হওয়া অমনি সেদিকে পা চালিয়ে দিলুম।

প্রায় তিন ঘণ্টা পথ অতিক্রম ক'রে উঠলুম মালাবারে। সত্যিই সেখান থেকে বোম্বাই শহরের দৃশ্য দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলুম। দেখতে দেখতে মনে হয় যেন একখানা ছবি দেখছি। রাত্রির অন্ধকারে বড় বড় বাড়িগুলো ঝাপসা দেখাচ্ছে। তারই মধ্যে খোলা জানলাগুলো দিয়ে দেখা যাচ্ছে আলো—ঠিক যেন জ্যোতির বিন্দু! অনেকক্ষণ ধরে দেখে দেখে আমরা পাহাড়ের নিচে নেমে এসে এক ইরানীর দোকানে ঢুকে বেশ ক'রে পেট ঠেসে খেলুম। ঠিক হল কাল থেকে যত কম সম্ভব অর্থাৎ প্রাণ-ধারণের জন্য যেটুকু না খেলেই নয়—ততটুকু খাওয়া হবে। খাবারের দোকান থেকে বেরিয়ে আবার ঘোরা শুরু হল। খাওয়া-দাওয়া হয়েছে, এবার একটু আশ্রয়—রাত্রে শোবার মতো একটু জায়গা। এর আগে অভিজ্ঞতা হয়েছে পথে শুলেই পুলিসে ধরে। আর ধর্মশালায় যাবার জো নেই—সেদিন সেখান থেকে একরকম পালিয়েই এসেছি।

ক্রমে রাস্তা জনবিরল হয়ে আসতে লাগল। তখনকার দিনে মোটর-গাড়ি খুবই কম ছিল—মোটর গেলে তখনও লোকে রাস্তায় দাঁড়িয়ে দেখত। ক্রমে ভাড়াটে ফিটন ছাড়া বাড়ির ঘোড়ার গাড়ি চলা বন্ধ হয়ে এল। মাঝে মাঝে কোনো ধনীর মোটর-গাড়ি পথিককে চমকে দিয়ে ছুটে যায়,—ট্রামগুলোও অস্বাভাবিক দ্রুতগতিতে ছুটতে লাগল।

এদিকে আমাদের গতিও ক্রমে মন্থর হয়ে আসতে লাগল। প্রথম দিনের মতন রাস্তায় শুয়ে পড়তে আর ভরসা পাই না—ধর্মশালাতেও ভয়ে যেতে পারি না। সেদিন তো সেখান থেকে একরকম পালিয়েই এসেছিলুম। পুলিসের ভয়ে কি শেষকালে শহর থেকেই ভাগতে হবে!

নানা চিন্তার সঙ্গে পা ছুটে চলেছে। কোথায় চলেছি জানি না, কোথায় আশ্রয় পাই, রাত্রিটুকুর রতন মাথা গুঁজে প'ড়ে থাকব, সকাল হতে-না-হতে চলে যাব। কে আশ্রয় দেবে!! এই অপরিচিতদের কে আশ্রয় দেবে?

চলতে চলতে আমরা ক্রফোর্ড-মার্কেটের কাছে যখন এসে উপস্থিত হলুম। তখন বাজার বন্ধ হয়ে গেছে। বাজারের বাইরের দোকানগুলি সব বন্ধ। দোকানের আলো নিভে যাওয়ায় রাস্তাগুলি অপেক্ষাকৃত অন্ধকার। দেখলুম বাজারের গা ঘেঁষে একটা লোক শুয়ে আছে। একবার ভাবলুম—এইখানেই শুয়ে পড়ব নাকি! আশেপাশে পুলিস-কনস্টেবল নেই, পথে যা দু'-একটি

লোক চলছে, সেদিকে কারুর নজর নেই। কি জানি, মনে হল আর একটু ঘুরে দেখা যাক—অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থান মেলে কিনা।

মার্কেটের আশেপাশে আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়াতে লাগলুম। দেখলুম—ত্‌'-একজন লোকও এদিক-ওদিক শুয়ে আছে। হঠাৎ নাকে একটা তীব্র আঁশটে গন্ধ এসে লাগায় বুঝতে পারলুম কাছেই মাছের বাজার।

এড়িয়ে সরে যাচ্ছি, এমন সময়ে দেখা গেল, একটা জায়গায় পাহাড়ের মতন স্তূপাকার আবর্জনা রয়েছে—একদল লোক সেগুলো তুলে কয়েকটা গাড়িতে নিয়ে গিয়ে ফেলছে—ওঃ, কী বিশ্রী গন্ধ! কিছুক্ষণ আগেই ইরানীর দোকানে যা খেয়েছিলুম তা যেন ঠেলে বেরিয়ে আসতে আরম্ভ করলে।

নাকে কাপড় দিয়ে সেই আবর্জনার গাড়িকে এড়িয়ে আরও একটা স্বল্পালোকিত গলিপথ দিয়ে ছুটতে গিয়েই চোখের সামনে এক অপূর্ব দৃশ্য ফুটে উঠল। দেখলুম—ফুটপাথের ওপর সারি সারি ঘুমন্ত নরদেহ পড়ে রয়েছে। সেই অন্ধকারে যতদূর দৃষ্টি যায়—বোধহয় তিন-চারশ' হবে। দেখলেই মনে হয়—তারা ভিখিরী শ্রেণীর লোক, বালিশ-বিছানা—কিছুরই ধার ধারে না। সেই ঘুমন্ত দেহগুলির পাশ দিয়ে আমরা চলতে লাগলুম। চলতে চলতে দেখতে পেলুম, তারা সকলেই ঘুমোয়নি, কেউ-বা উবু হয়ে বসে বিড়বিড় করছে, কেউ-বা বসে আকাশের দিকে হাত ছুঁড়ছে—স্পষ্টই বোঝা গেল, তারা পাগল। এদের মধ্যে অনেক স্ত্রীলোকও রয়েছে—শিশু বালিকা কিশোরী যুবতী প্রৌঢ়া বৃদ্ধা সব শ্রেণীরই। কেউ-বা সম্পূর্ণ উলঙ্গ, কেউ-বা অর্ধ-উলঙ্গ—শতচ্ছিন্ন, অপর্যাপ্ত বসন দিয়ে লজ্জা-নিবারণের কোনো প্রয়াস নেই। এরা নির্বিচারে নিদ্রার কবলে আত্মসমর্পণ করেছে—শুধু প্রকৃতিদেবী চক্ষুলজ্জার খাতিরে তাদের দেহের ওপরে স্বচ্ছ অন্ধকারের আবরণ টেনে দিয়েছেন। আমরা বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে এই দৃশ্য দেখতে দেখতে এগিয়ে চলতে লাগলুম।

আরও খানিকটা অগ্রসর হবার পর যেখানে লোক আর নেই, সেইরকম একটু জায়গা দেখে ঝেড়ে-ঝুড়ে নিয়ে আমরাও শুয়ে পড়লুম। পরিতোষ হেসে বললে—ভিখিরীদের পল্টনে আজ আরো তিনজন সৈন্য ভর্তি হল।

কিন্তু ভিখিরীদের পল্টনে ভর্তি হলেই বা রাস্তায় শুলেই ঘুম হয় না! রাস্তায় ঘুমোবার সাধনা করতে হয়। সে-সাধনা অভ্যাসের অপেক্ষা রাখে। একদিক থেকে মাছের ও অন্যদিক থেকে সেই আবর্জনার গন্ধে ঘুম ছুটে পালিয়ে

গেলেন। অনেক সাধ্য-সাধনার পর ঘুম যখন এলেন, তখন আর রাস্তায় ঘুমোনো চলে না—ভোর হয়ে গিয়েছে।

রাস্তা ছেড়ে উঠে পড়লুম। আবার পথ-চলা শুরু হল। সারারাত্রি ঘুম হয়নি। অবসাদে শরীর ঝিমিয়ে পড়তে লাগল। মুখে চোখে একটু জল দিলে হয়তো সুস্থ হতে পারব, এই আশায় জলের কল খুঁজতে লাগলুম, কিন্তু কলকাতার মতন রাস্তায় টেপা কল কোথাও খুঁজে পেলুম না। এক জায়গায় একটা নতুন বাড়ি তৈরি হচ্ছে দেখে কালীচরণ বললে—দাঁড়াও আমি কল খুঁজে বার করছি।

কালীচরণ তো সেই বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ল। খানিক বাদে সে মুখটুখ ধুয়ে বেরিয়ে এল। বললে—ইট ভেজাবার কলে মুখ ধুয়ে এলুম।

কালীচরণ আমাদেরও নিয়ে গেল সেখানে। বোম্বাইয়ে কলকাতার মতন ময়লা-জলের কারবার নেই, সবই পরিশ্রুত জল। সত্যিই দেখলুম, ইট ভিজোবার কলে জল পড়ছে—আমরা বেশ ক'রে মুখ ধুয়ে বেরিয়ে এলুম, কেউ গ্রাহ্যও করলে না।

তারপরে এক দোকানে চা খেয়ে বড় মাঠের এক জায়গায় প'ড়ে লাগানো গেল ঘুম সেই বেলা একটা অবধি। কিছুক্ষণ এদিক-ওদিক করতে করতে দেখলুম এক জায়গায় পোলো খেলা হচ্ছে। দাঁড়িয়ে গেলুম খেলা দেখতে। পোলো-খেলা শেষ হয়ে গেল—দেখলুম এক জায়গায় ছেলেরা ক্রিকেট খেলছে —তাই দেখতে দাঁড়িয়ে যাওয়া গেল। এমনি ক'রে কোনোরকমে সন্ধ্যে অবধি কাটিয়ে দিয়ে একবেলার খাওয়ার খরচ বাঁচিয়ে এক ভাজা-ভুজির দোকান থেকে পেট ভরে তেলে-ভাজা খেয়ে আমাদের বাড়ি অর্থাৎ ফুটপাথের দিকে রওনা হওয়া গেল।

কাল রাত্রে দুর্গন্ধের চোটে ঘুমুতেই পারিনি,—ঐখানেই কাছাকাছি অন্য কোনো ভালো জায়গা পাওয়া যায় কিনা তারই খোঁজ করতে হবে। গিয়ে দেখলুম তখনই অনেকে সেখানে এসে জুটেছে। এক জায়গায় গোল হয়ে ব'সে স্ত্রী-পুরুষে মিলে দিব্বি আড্ডা জমিয়েছে—কেউ কেউ টিনের কৌটো-ভর্তি চা চুমুক দিয়ে খাচ্ছে। আমরা সে-জায়গাটা ছেড়ে আশেপাশে আরও একটু ভালো জায়গা পাওয়া যায় কিনা তারই খোঁজ করতে লাগলুম।

ঘুরতে ঘুরতে দেখলুম—বাজারের পাশেই একটা সরু অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার গলির মধ্যে একজন আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে প'ড়ে রয়েছে। গলিটা বেশি লম্বা

নয় ও একমুখো। দু'টো-তিনটে দোকানও রয়েছে সেখানে। হিসাব ক'রে দেখলুম যে, দোকানগুলো বন্ধ হয়ে যাবার পর সেখানটায় বেশ অন্ধকার হয়ে যাবে। আর বৃথা অন্বেষণে কালক্ষেপ না ক'রে সেইখানেই অঞ্চল বিছিয়ে দেওয়া গেল।

সবেমাত্র সন্ধ্যে হয়েছে—বাজার তখনো খুব জমজমাট। অপ্রশস্ত ও এক-মুখো গলি হলেও সেখানে লোক চলাচলের অন্ত নেই। বেলা একটা অবধি ঘুম, তার ওপরে রেড়ীর তেলে বা চিনে-বাদামের তেলে ভাজা সেই কচুর পাতা, ওলের পাতা খেয়ে, রাস্তায় শুয়ে শরীর ম্যাজ-ম্যাজ করতে লাগল। কাছেই একটা বিড়ির দোকান থেকে দেড পয়সার ন'টি বিড়ি ও আধ পয়সার একটা দেশলাই কিনে এনে ধোঁয়া দিয়ে বমি চাপবার চেষ্টা করতে লাগলুম।

কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা গেল, সেখানেও দু'-একটি ক'রে পথবাসী ও বাসিনী এসে ফুটপাথের ওপরে শুয়ে পড়ল। গোটা তিন-চার লোক—আমাদেরই বয়সী হবে তারা—আমাদের কাছে গোল হয়ে ব'সে কি খেলতে লাগল। কালীচরণ উঁকি-ঝুঁকি মেরে বললে—লোকগুলো জুয়া খেলছে। এখুনি পুলিসে ধরবে।

কিন্তু তাদের হালচাল দেখে মনে হল না যে, তারা পুলিস কিংবা কারুর ভয় করে। প্রকাশ্য পথের ওপর ব'সে চিৎকার ক'রে তারা খেলে চলেছিল। তারা একদিকে খেলছে, আমরা কিছু দূরে ব'সে বিড়ি ফুঁকছি—বেশ চলছিল, এমন সময় কালী উঠে গিয়ে তাদের কাছে দাঁড়াল। কালীর চেহারা দেখে তারা প্রথমে মনে করলে যে, সে তাদেরই দলের লোক; কিন্তু খানিকক্ষণ বাদে ওদেরি মধ্যে একজনের সন্দেহ হওয়ায় সে বললে—এই, এখানে কি দেখছিস ?

অবশ্য এই প্রশ্নের ভাষা ও ভাব ঠিক যাকে বলে--জনোচিত—তা হয়নি। কিন্তু পথে যাদের জন্ম, সারাজীবন যারা পথবাসী, তাদের কাছ থেকে তার চেয়ে ভালো ভাষা আশা করা যায় না—বিশেষ ক'রে তারা কালীকে নিজেদের দলের লোকই মনে করেছিল এবং সেজন্য তাদের বিশেষ দোষও দেওয়া যায় না। কিন্তু কুগ্রহ যখন ঘাড়ে চাপে, তখন মানুষের বিচারবুদ্ধি থাকে না। তাই আমাদের অমন ঠাণ্ডা-মেজাজী কালীচরণ হঠাৎ তাদের কথা শুনে চিৎকার ক'রে তেরিয়া হয়ে উঠল। কিন্তু তারা ছিল জাত-পথবাসী, শিশুকাল থেকে অস্তিত্বের প্রতিটি মুহূর্ত যুদ্ধ ক'রে জিততে হয়েছে, আমাদের 'বাবা কালী'র হুমকিকে তারা গ্রাহ্য করবে কেন ?

তারাও তেরিয়া হয়ে উঠল—মারামারি একটা হয় আর কি!

ব্যাপার দেখে আমরা কালীকে টানতে টানতে নিয়ে এলুম। সারাদিনের রোদ ও অনাহারে কালীর মাথায় কিরকম গর্মি চড়ে গেল—সে আর কিছুতেই থামতে চায় না। কালী বলতে লাগল—ব্যাটাদের মেরে ঠিক ক'রে দেব—জানে না যে, আমরা ভদ্রলোকের ছেলে, নেহাত বিপদে প'ড়ে আজ রাস্তায় শুয়েছি—ইত্যাদি ইত্যাদি।

কালীচরণকে টেনে নিয়ে এসে বোঝাবার চেষ্টা করতে লাগলুম—ভদ্রলোকের ছেলেই হও আর যাই হও—রাস্তায় এসে শুয়ে আর ভদ্রলোকের অভিমান রাখা চলে না। এ-রাজ্যে ওদের নিয়মই মানতে হবে।

কিছুক্ষণ এই অযথা আত্মাভিমান ত্যাগ করবার উপদেশ দিতেই কালীচরণ তো ঠাণ্ডা হয়ে গেল, কিন্তু ওদিকে ভিখিরীদের আত্মাভিমান চাঙ্গা হয়ে উঠতে লাগল। তারা সেই যে চেঁচামেচি শুরু করলে—তার আর থামা নেই। কাক মারলে যেমন মুহূর্তের মধ্যে পালে পালে কাক এসে একত্র হয়ে কা-কা করতে থাকে, তেমনি সেই দু'-চারজনের চিৎকারে কোথা থেকে পিলপিল ক'রে তারা এসে জুটতে লাগল। তারা কালীকে দেখিয়ে বলতে লাগল—ও নাকি তাদের বাপ তুলে গালাগালি দিয়েছে—ওকে খুন করে ফেলব।

দেখতে দেখতে ব্যাপার যেরকম দাঁড়াল তাতে কালীর মুখ শুকিয়ে একেবারে আমসি হয়ে গেল। শুধু কালীই নয়, আমরাও দস্তুরমতন ভড়কে গেলুম। কি করি! উঠে যে পালাব তারও উপায় নেই, কারণ ভিখিরীর পল্টন আক্রমণ না করলেও আমাদের চারদিকে তারা ঘিরে ফেলেছে, এদিকে রাস্তা দিয়ে লোকজন চলছে, কিন্তু কেউ ব্যাপারটার প্রতি ভ্রূক্ষেপও করছে না।

ভদ্রাভিমানী কালীচরণের উষ্মা তখন কোথায় পলায়ন করেছে, তার কাজল-কালী মুখ প্রায় ফরসা হয়ে এসেছে। ওদিকে শত্রুপক্ষের লোকবল ক্রমেই বাড়তে লাগল—তাদের গালাগালগুলো স্পষ্ট শোনা যেতে লাগল।

আমরা যেখানে ব'সে ছিলুম তারই কয়েক হাত দূরে একটা বই-এর দোকান ছিল। দোকানের সামনে বিলিতী সাময়িকপত্র, ডিটেকটিভ উপন্যাস, নানারকম সব মারাঠী, গুজরাটী বই সাজানো ছিল। দোকানে দুই-একজন লোকও দাঁড়িয়ে সেই বই ওটকাচ্ছিল। উপায়ান্তর না দেখে আমরা গিয়ে সেই বইওয়ালা ও তার হবু খদ্দেরদের গিয়ে বললুম—হুজুর, আমাদের প্রাণ যায়—রক্ষে করুন!

লোকটি জিজ্ঞাসা করলে—কি হয়েছে? কে তোমরা?

বললুম—আমরা বিদেশী লোক, আমাদের বাড়ি বাংলাদেশে। আশ্রয়হীন হয়ে আমরা রাস্তায় শুয়ে ছিলুম, কিন্তু এখানকার ঐ ভিখিরীর দল আমাদের মারতে উদ্যত হয়েছে।

বাঙালীর নাম শুনলে বা বাঙালী দেখলে আজ যেমন অন্য প্রদেশের লোকে জুতো মারতে উদ্যত হয়—সেদিন তা ছিল না। বাংলাদেশের নাম শুনতেই লোকটি একটা আলমারির পাশ থেকে মাথা-সমান লম্বা একটা বাঁশের লাঠি বের ক'রে দোকানের ভেতর থেকে এক লাফে রাস্তায় এসে পড়ল। যে দু'-চারজন খদ্দের সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল, তারাও বললে—তোমাদের কোনো ভয় নেই—সব ঠাণ্ডা ক'রে দিচ্ছি।

এদের হাল-চাল দেখে ভিখিরীর দল একমুহূর্তে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। সৈন্যদের কাওয়াজ শেষ হলে যেমন তারা এদিক-ওদিকে ছড়িয়ে পড়ে, ঠিক সেই রকম। কিন্তু দোকানদার ও তার সেই দু'-তিনজন খদ্দেরে মিলে এগিয়ে গিয়ে তাদের দু'-তিনজনকে ধরে দোকানের কাছে নিয়ে বললে—দেখ, এদের সঙ্গে চালাকি কোরো না। বংলাদেশের লোক এরা, বোমা তৈরি করতে জানে —একটি মেরে দেবে, তামাম মহল্লা উড়ে যাবে। আমি দোকান বন্ধ ক'রে, বাড়ি যাবার সময় পুলিসে খবর দিয়ে যাব—কাল এসে যদি শুনি এদের জ্বালাতন করেছ, তা হ'লে ভালো হবে না ব'লে দিচ্ছি।

ভিখিরীদের প্রতিনিধি বললে—এরা একের নম্বর মওয়ালী, অর্থাৎ গুণ্ডা-বদমাইস। আমাদের বাপ তুলে গালাগালি দিয়েছে—ওদের কি এমনি ছেড়ে দেব!

আমরা বললাম—সব মিছে কথা।

আমাদের কথা থামিয়ে দিয়ে দোকানদার ওদের বললে—বেশ করেছে বাপ তুলেছে—তোর বাপের নাম কি? বল—বল্ না—

আশ্চর্য! দোকানদারের কথা শুনে লোকগুলো সব ছত্রভঙ্গ হয়ে সরে পড়তে লাগল। যে দু'-চারজন তখনও জটলা পাকাচ্ছিল, দোকানদার তাদের উদ্দেশে চিৎকার ক'রে বলতে লাগল—এখানে গোলমাল করলে পুলিসে খবর দিয়ে এখানে শোওয়া বন্ধ ক'রে দেব।

তারপর আমাদের বললে—যাও, তোমরা মজাসে শুয়ে পড়। যদি ওদের কেউ কিছু বলে—তা হ'লে আমায় জানিও।

আমরাও মজাসে আগেকার জায়গায় গিয়ে শুয়ে পড়লুম।

কিন্তু আমরা রাস্তাটাকে যতখানি সহজলভ্য মনে করেছিলুম, সেটা ততখানি সহজলভ্য হল না। সেইদিনই এক ঘুমের পর রাত্রি তখন প্রায় দ্বিপ্রহর, রাস্তা একেবারে নির্জন হয়নি, জনকতক, তাদের কথাবার্তা শুনে ভিখিরীদের অথবা পথবাসীদেরই প্রতিনিধি ব'লে মনে হল—তারা আমাদের একরকম ঘুম থেকে তুলে জিজ্ঞাসাবাদ আরম্ভ করলে। তাদের কথাবার্তায় বোঝা গেল যে, কোথাকার কে আমরা এখানে এসে তাদের অন্নে ভাগ বসাতে এসেছি— এ তারা সহজে মেনে নেবে না। সর্দার বলেছে, এজন্য যদি খুন-খারাপী হয়, তাও তারা করবে।

আমি দেখলুম ব্যাপারটা ক্রমেই জটিল হয়ে উঠছে। এদের সঙ্গে লড়াই ক'রে রাস্তায় শোবার অধিকার সাব্যস্ত করার শক্তি আমাদের নেই। একবার মনে হল, ওদের সঙ্গে কথা-কাটাকাটি না ক'রে উঠে চলে যাই। কিন্তু চলে যাব কোথায়!

আমরা কিছু বলছি না দেখে ক্রমেই তারা মারমুখো হয়ে উঠতে লাগল। শেষকালে তাদের একজন মুরুব্বিকে ডেকে বললুম—ভাই, আমরাও তোমাদেরই মতন গরীব লোক। তোমাদের অন্নে হাত দেবার কোনো মতলব আমাদের নেই। এখানে ওখানে শুলে পুলিসে তাড়া দেয়, তাই তোমাদের আশ্রয়ে এসেছি। তোমরা যদি দয়া ক'রে এখানে থাকতে দাও তো থাকব, নইলে চলে যাব।

আমরা যতক্ষণ ভদ্রলোক ছিলুম অর্থাৎ ভিখিরী হয়েও অন্তরে অন্তরে ভদ্রলোকের অভিমান গজগজ করছিল, ততক্ষণ মনে হয়েছিল লড়াই ক'রে রাস্তায় শোবার অধিকার সাব্যস্ত ক'রে নেব। কিন্তু রাস্তার মালিকেরা যখন তাদের রাজভাষা যথোপযুক্ত অলঙ্কার সহযোগে বুঝিয়ে দিলে যে বেশি ত্যাণ্ডাই-ম্যাণ্ডাই করলে তারা খুন পর্যন্ত করতে দ্বিধাবোধ করবে না, তখন আমাদেরও জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হল। অবস্থার দুর্বিপাকে প'ড়ে তারা ভিখিরী হয়েছে। অবস্থার দুর্বিপাকে সেই পথবাসী ভিখিরীদের ময়ূর-সিংহাসন থেকে নেমে এসে তাদের সঙ্গে সমান পৈঠেতে দাঁড়াতে হয়—অভিজ্ঞতা সেদিন হয়ে গেল। আমার সেই মিনতি-ভরা স্বর তাদের অনেকের হৃদয়তন্ত্রীতে আঘাত করলে। যখন তারা বুঝতে পারলে যে আমরাও তাদেরি মতো, তখন তাদের কথাবার্তার স্বর অনেক নিচের পর্দায় নেমে এল। অনেকে বলতে লাগল—শুতে দাও—কি আর হবে! নাচার আদমি—শুয়ে থাক্।

যে মুরুব্বি এগিয়ে এসে এতক্ষণ আমাদের ধমক-ধামক দিচ্ছিল তার স্বরও অনেক নেমে এল। সে জিজ্ঞাসা করলে—তোরা কোথায় ভিক্ষে করিস ?

বললাম—সেই কোলাবা অঞ্চলে।

—তা সেখানে শুতে পারিস না ?

—না, পুলিসে বড় হাঙ্গামা করে।

—আচ্ছা, শুয়ে থাক্—

কথাটা ব'লে লোকটা চলে গেল আর আমরাও নিশ্চিন্ত হয়ে গা ঢেলে দিলুম।

সেদিন সূর্যোদয়ের আগেই আমরা উঠে গেলুম।

চা খেয়েই আমরা চাকরির খোঁজে বেরিয়ে পড়লুম। দোকান, গৃহস্থের বাড়ি, কারখানা—সব জায়গাতেই খুঁজে বেড়াই।

জিজ্ঞাসা করি—হ্যাঁ গা, লোক রাখবে ?

কেউ-বা জিজ্ঞাসা করে—তোমাদের বাড়ি কোথায় ? মাথায় টুপি নেই কেন ?

বাঙালী শুনে কেউ-বা কিছুক্ষণ অবাক হয়ে চেয়ে দেখে। ভাবে এরাই বোমা মেরেছে! আজ বোম্বাই শহরের পথেঘাটে যেমন বাঙালী দেখা যায়, সেদিন তেমন ছিল না। বাঙালী তো দূরের কথা—টুপিহীন লোক পথে প্রায়ই দেখতে পাওয়া যেত না। আজ মারাঠী ছাত্ররা টুপি একরকম ত্যাগই করেছে, কিন্তু সেদিন টুপিহীন অবস্থার কথা চিন্তাই করতে পারত না। সেদিনও সন্ধ্যে অবধি ঘুরে ঘুরে, ভাজাভুজি খেয়ে আবার সেইখানে ফিরে এলুম। একটু ব'সে থেকে জায়গা ঝেড়ে শোবার ব্যবস্থা করছি, এমন সময় কালকের সেই দল এসে বললে—তোরা সকালবেলায় উঠে কোথায় চম্পট দিয়েছিলি ? • সর্দার তোদের ডেকেছে। কাল সকালবেলা কোথাও যাস্‌নে—সর্দারের কাছে নিয়ে যাব।

—যে আজ্ঞে—ব'লে তখনকার মতন শুয়ে পড়া গেল।

পরদিন ভোরবেলা উঠে দেখলুম—ভিখিরীর দল তখনও পথ জুড়ে প'ড়ে আছে—কেউ কেউ সেই ভোরে উঠে পথেই প্রাতঃকৃত্য শেষ করছে। আশেপাশে অলিগলি থেকে যে যার টিনের কৌটো, ফুটো গেলাস-বাটি নিয়ে চায়ের দোকান থেকে চা নিয়ে এসে ব'সে খেতে লাগল। কেউ-বা পয়সা দিলে—কেউ-বা এমনি পেলে। কোনো তাড়া নেই, ভবিষ্যতের কোনো চিন্তা নেই, সংসার-যাত্রার

উদ্বেগ নেই। কোনো আশায় তারা বুক বাঁধেনি, নিরাশা তাদের শক্তিহীন করেনি। আমরা দেখতে লাগলুম আমাদের মুরুব্বি দিব্যি রয়ে ব'সে চা খেয়ে বিড়ি টানতে লাগল। দেখতে দেখতে রোদ উঠে গেল, অন্য সব দোকানপত্র খোলা হতে লাগল। চলতি লোকে পথ ভরে উঠল। তখন তিনি উঠে হেলে-দুলে আমাদের কাছে এসে বললেন—কি রে! চা খেয়েছিস?

বললুম—পরে খাব। আগে চল—সর্দারের সঙ্গে দেখা করি।

লোকটা আরও দু'-তিনজন লোককে ডেকে নিলে। আরও কয়েকজন স্ত্রী-পুরুষ বিনা আহ্বানেই আমাদের সঙ্গ নিলে। দিব্যি শোভাযাত্রা ক'রে আমরা এগিয়ে চললুম।

ক্রফোর্ড-বাজারের বিপরীত ফুটপাথে যেখানে হর্নবি রোড শেষ হয়েছে সেইখানে সিডেনহ্যাম কলেজের বাগানটা ঘেঁষে এক অন্ধ ভিখিরী চিৎকার ক'রে পথচারীদের কাছে মিনতিপূর্ণ ভাষায় তার অন্ধত্ব এবং তার ফলে নাচারত্ব ঘোষণা ক'রে চলেছিল। লোকটার রঙ ঘোর কালো, মাথায় তেল-চকচকে ভালো ক'রে আঁচড়ানো বাবড়ি চুল। পরনে একটা লুঙ্গি ও তার ওপরে রঙিন একটা জামা—লুঙ্গি এবং জামা ভিখারী-জন-সুলভ নোংরা নয়। মুখে লম্বা দাড়ি, দুই চোখ বোধ হয় অন্ধ। সামনে পথের ওপরে একখানা ন্যাকড়া পাতা, তাতে দুই-একটা পয়সা পড়েছে, পেছনে একটা লম্বা লাঠি শোয়ানো রয়েছে, তার কিয়দংশ এদিকে এবং কিয়দংশ ওদিকে দেখা যাচ্ছে।

সেখানে গিয়ে পৌঁছিয়েই সঙ্গের লোকেরা এই লোকটিকে চিৎকার ক'রে বললে—সর্দার! কলকাতার সেই লোক তিনটেকে নিয়ে এসেছি, কাল পালিয়ে গিয়েছিল তাই আনতে পারিনি।

লোকগুলোর কথা শোনামাত্র অন্ধের সেই মিনতিপূর্ণ ভাষা একেবারে ধমক ও খিস্তিতে পূর্ণ হয়ে উঠল। সর্দার বলতে লাগল—আমি ক'দিন শুনছি, তোরা এখানে এসে খুব গোলমাল লাগিয়েছিস।

দেখতে-না-দেখতে একটানে পেছন থেকে লম্বা লাঠিখানা বার ক'রে বললে—এক ঘা-এ শেষ ক'রে দেব—জানো না, এ তোর কলকাতা নয়, এ শহরের নাম বোম্বাই। খবরদার—

আমরা তো একেবারে হতভম্ব মেরে গেলুম। এক্ষেত্রে কি করব এবং কি করা উচিত তাই ভাবতে লাগলুম।

ইতিমধ্যে সর্দার প্রশ্ন করলে—কলকাতার ঝিলমিল সর্দারকে চিনিস?

সভয়ে বললুম—আজ্ঞে ঝিলমিল ব'লে কারুকে তো চিনি না।

—কি! কলকাতায় থাকিস আর ঝিলমিলকে চিনিস না—হগ-সাহেবের বাজারের কাছে বসে—গায়ে কুঠ আছে।

ভাবতে লাগলুম—তাইতো বড়ই অন্যায় হয়ে গিয়েছে। কলকাতায় থাকি অথচ ঝিলমিল সর্দারকে চিনি না। ইতিমধ্যে কালীচরণ ব'লে উঠল—হ্যাঁ, হ্যাঁ—হগ-সাহেবের বাজারের কাছে একজন কুঠকে দেখেছি বটে।

সর্দার ব'লে উঠল—হাঁ, আমি সেই ঝিলমিলের ভাতিজা, বেশি চালাকি কর তো খুন ক'রে সমন্দরের জলে ফেলে দেব—মগরায় খেয়ে ফেলবে—হাঁ—

এবার আমি বললুম—আজ্ঞে হুজুর, আমরা তো কোনো কসুর করিনি।

সর্দার রেগে বললে—এ মহল্লায় এসেচিস কেন? এ মহল্লা ভর্তি হয়ে গেছে।

বললুম—আজ্ঞে, এ মহল্লায় তো আমরা বসি না—আমরা বসি সেই কোলাবায়। সেদিকে রাত্তিরে পুলিস বড় জ্বালাতন করে তাই আপনার মহল্লায় এসে শুই। আপনি যদি বারণ করেন তা হ'লে এখানে শোবো না।

আমার কথা শুনে সর্দার যেন একটু নরম হল। সে গলার স্বর অনেকখানি নামিয়ে জিজ্ঞাসা করলে—কোথায় বসছিস তোরা?

বললুম—আজ্ঞে, ঐ কোলাবা অঞ্চলে।

সর্দার বললে—ওদিককার লোকগুলো বড় বেইমান—তোরা মালাবারের দিকে বসিস—দু'পয়সা হবে। কিন্তু খবরদার—এদিকে বসবে না। যদি জানতে পারি এদিকে ভিক্ষে করেছ তো জান্‌সে মেরে দেব—এ তোমার কলকাতা নয়—এর নাম বোম্বাই! এখানে শুধু রাত্তিরে শুতে পাবে। মাত্তর রাত্তিরে—যাও—

যাক! রাস্তায় শোবার সনন্দ পেয়ে তখনকার মতো চা খেতে যাওয়া গেল। একটা জিনিস বোম্বাইয়ে এসে অবধি লক্ষ্য করছিলুম—এখানকার পুলিস থেকে ভিখিরী অবধি সকলেই সুযোগ পেলেই একবার ক'রে শুনিয়ে দেয়—এ তোমার কলকাতা নয়। যাই হোক, শহরময় টো টো ক'রে বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়াই চাকরির সন্ধানে।

বোম্বাই শহরে একটা বৈশিষ্ট্য দেখলুম যে প্রায় প্রত্যেক বাড়িতেই ঘরে ঘরে কিংবা তলায় তলায় আলাদা ভাড়াটে। তাই বাড়ির মধ্যে ঢুকে একতলা থেকে আরম্ভ ক'রে তিনতলা-চারতলা অবধি ঘরে ঘরে খোঁজ নিই। কোনো ঘরের

গিন্নী সহানুভূতির সঙ্গে কিছু কিছু প্রশ্ন করেন, কেউ-বা কিছু না শুনেই 'দূর দূর' করেন। সারাদিন ঘুরে ঘুরে কোথাও কিছু খেয়ে পয়সা-তুয়েকের বিড়ি কিনে সন্ধ্যেবেলাতেই নিজেদের জায়গাটিতে এসে বসি। তারপরে রাত্রি গভীর হ'লে শুয়ে পড়ি। যে বই-এর দোকানদার কয়েকদিন আগে আমাদের ভিখিরীদের অত্যাচার থেকে বাঁচিয়েছিল, একদিন তার দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে বিলিতী সাময়িকপত্র ওলটাচ্ছি, এমন সময় দোকানদার জিজ্ঞাসা করলে—তোমরা কি ইংরেজী পড়তে পার ?

বললুম—আমরা ইংরেজী পড়তে পারি, বুঝতে পারি, কিছু কিছু বলতেও পারি।

দোকানদার আমাদের কথা শুনে কিছুক্ষণ হাঁ ক'রে আমাদের দিকে চেয়ে রইল। তারপর একটা বই-এর পাতা খুলে একটা জায়গা দেখিয়ে আমাকে বললে—পড় দিকিন।

গড়গড় ক'রে পড়ে ফেললুম।

দোকানদার কিন্তু আমাদের ভিখিরীই মনে করেছিল। এক লাইন ইংরেজী পড়তেই তার মনোভাব বদলে গেল। সে বেশ সহানুভূতির সঙ্গে আমাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করতে লাগল। সে বললে—তোমাদের জন্য আমি কাজের চেষ্টা করব—এখন তোমাদের বরাত।

এ-কথা সে-কথা হবার পর সে বললে—তা তোমরা পথে এরকম ক'রে শুয়ে কাটাচ্ছ কেন ? এখানে তো অনেক বাঙালী আছে। তাদেরি ওখানে একটু জায়গা পাও না ?

বললুম—তাদের ওখানে গিয়েছিলুম কিন্তু তারা বিশেষ আমল দিলে না।

লোকটা একটু ভেবেচিন্তে বললে—দেখ, এক কাজ কর। আমার দোকানের পেছনে অনেকখানি জায়গা আছে, তোমরা সেখানে শুতে পার—বেশ ঢাকা জায়গা, সেখানে তোমাদের জ্বালাতন করতে পারবে না। ঝড়-বৃষ্টি হ'লেও কিছু হবে না।

লোকটা দোকান থেকে বেরিয়ে এসে দোকানের পেছনে নিয়ে গেল। অনেকখানি জায়গা প'ড়ে রয়েছে সেখানে—দিব্যি ঘরের মতন। তিনজন আমরা—স্বচ্ছন্দে হাত-পা খেলিয়ে শুতে পারব। অসুবিধের মধ্যে দোকান বন্ধ করার তক্তাগুলো সেখানে রাখা রয়েছে, তাই দোকান বন্ধ না হওয়া অবধি সেখানে শুতে পারা যাবে না। যাই হোক, নতুন জায়গা পেয়ে ভারি ফূর্তি

লাগল। তখুনি বিড়ির দোকান থেকে একটা সরু মোমবাতি কিনে এনে, দোকানদারের কাছ থেকে ঝাঁটা চেয়ে নিয়ে জায়গাটা বেশ ক'রে ঝেড়ে আমাদের শোবার উপযোগী ক'রে নিলুম। দোকান বন্ধ করার সময় যখন হল তখন আমরাই হাতে হাতে তক্তাগুলো বার ক'রে দিয়ে দোকানদারকে সাহায্য করলুম। দোকানদার চলে গেলে দিব্যি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুম লাগানো গেল।

* * *

তখন রাত্রি ক'টা তা বলতে পারি না। হঠাৎ কালীচরণের হাঁউ-মাউ চিৎকারে ঘুম ভেঙে গেল—কি রে, কি হয়েছে ?

কালীচরণ চিৎকার করতে লাগল—কোন্ শালা হাত মাড়িয়ে দিলে—ওঃ, হাতখানা একেবারে পিষে ফেলেছে ! ওঃ—

ততক্ষণে পরিতোষ মোমবাতি জ্বালিয়ে ফেলেছে। সেই স্বল্প আলোকে দেখলুম একজোড়া নরনারী অন্ধকারে স'রে গেল। বোঝা গেল কোনো ভিখিরী দম্পতি বোধ হয় রোজ এসে এখানে শোয়—সেই আলোচনা করতে করতে বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়া গেল।

কিছুক্ষণ যেতে-না-যেতে আবার একজোড়ার আবির্ভাব। তারা স'রে পড়তে আবার একজোড়া ! এরপর আমরা বাতি জ্বেলে ব'সে-ব'সেই রাতটা কাটিয়ে দিলুম। বেশ বুঝতে পারা গেল যে এই জায়গাটুকু হচ্ছে এ-পাড়ায় ভিখিরীদের বিহারভূমি। ঠিক করলুম—আর এখানে শোয়া নয়। দেবতাদের বিহারভূমিতে অনবধানতায় প্রবেশ ক'রে ইল-রাজার যা দুর্দশা হয়েছিল তা আমাদের জানা ছিল। অতএব ভাবলুম আর হাঙ্গামা না ক'রে মানে মানে স'রে পড়াই শ্রেয়।

সেদিন সন্ধ্যা হতেই পরিতোষ প্রস্তাব করলে—চার্চগেট স্টেশনে গিয়ে শোওয়া যাক। স্টেশনটা শহরের এক কোণে অপেক্ষাকৃত নির্জন ব'লে আমরা মনে করলুম যে, সেখানে এক কোণে প'ড়ে থাকলে স্টেশনের লোকদের চোখে পড়ব না। কিন্তু দেখা গেল যে স্টেশনে প'ড়ে থাকলে তাদের বৃহৎ চক্ষুর অন্তরাল হওয়া সম্ভব নয়। রাত্রি ঠিক বারোটা নাগাদ তারা ঠিক আমাদের আবিষ্কার ক'রে স্টেশন থেকে বার ক'রে দিলে।

স্টেশন থেকে তো বেরিয়ে পড়লুম—কিন্তু কোথায় যাই ? এই কয়দিন যেখানে নিশিযাপন করেছি, সে-স্থান এখান থেকে অনেক দূরে। অদূরেই অভিমানিনী সমুদ্র-তরঙ্গমালার অশ্রান্ত বিক্ষেপ ও ক্রন্দন চলেছে। কোথায় যাই !

বিধাতা কি আমাদের জন্য ঐ অঙ্ক বিস্তার ক'রে রেখেছেন? পায়ে পায়ে একটু একটু ক'রে বিনা বাক্যব্যয়ে এগিয়ে আমরা একেবারে সমুদ্রের কাছে এসে পড়লুম। সমুদ্রের ধার দিয়ে একফালি সরু রাস্তা—তখনো আর্ক-লাইটে দিনের মতন হয়ে রয়েছে জায়গাটা। দেখা গেল সেই রাস্তার ধারে লম্বা লম্বা বেঞ্চি বসানো রয়েছে। আমরা পরের পর তিনখানা বেঞ্চিতে শুয়ে পড়লুম। পাশেই সমুদ্র কাঁদতে লাগল অশ্রান্ত কল্লোলে।

* * *

তখনো ভালো ক'রে ভোর হয়নি। বিরাট একটা আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল। উঠে দেখি আমাদের চারপাশে, সেই প্রায়ান্ধকারে যতদূর দৃষ্টি যায় ততদূর বড় বড মহিষ—ইয়া-ইয়া শিং-ওলা। তার একটার সামান্য গুঁতো লাগলে আর দেখতে হবে না! কিন্তু তারা আমাদের কিছু না ব'লে দিব্যি বেঞ্চিগুলোকে পাশ কাটিয়ে সমুদ্রে গিয়ে নামল। সবার পেছনে দেখলুম কয়েকটা লোক রয়েছে। এদিকে রাত্রে শোবার সময় আমরা জুতোগুলোকে পা থেকে খুলে বেঞ্চির নিচে রেখেছিলুম—মোষের পাল স'রে যাওয়ার পর দেখলুম জুতো কোথায় অন্তর্হিত হয়েছে। আমি মনে করলুম বুঝি চালাকি ক'রে কালী ও পরিতোষ আমার জুতো লুকিয়ে রেখেছে। কিন্তু শেষকালে দেখা গেল যে তাদের জুতোও নেই। অনেকক্ষণ ধরে আমরা পরস্পরকে সন্দেহ করতে লাগলুম, শেষকালে দেখা গেল আমরা কেউই কারুর জুতো লুকোইনি—সেগুলি সত্যি-সত্যি চুরিই গিয়েছে। তখন দৈনন্দিন চরার কাজে নিশ্চিন্ত হয়ে খালি-পায়েই অগ্রসর হওয়া গেল।

বোম্বাই শহরের ভিখিরীদের সম্বন্ধে যেটুকু অভিজ্ঞতা লাভ করা গিয়েছিল, এখানে তা প্রকাশ করলে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। ভিখিরীরা প্রায় দল বেঁধে থাকে। এক এক মহল্লায় এক এক দল ভিখিরীর রাজত্ব, তারা সেই মহল্লায় ভিক্ষে করে, খায়, শোয়। নিজেদের দলের প্রায় সকলকেই সকলে চেনে—সেইজন্য তাদের দলভুক্ত নয়—এমন কোনো লোককে নিজেদের মহল্লায় দেখলেই তারা আপত্তি জানায় এবং প্রয়োজন হ'লে তাকে সরাবার জন্য মারপিট, এমনকি খুনখারাপি করতেও তারা রাজী থাকে। এরা প্রায়ই দল বেঁধে রাস্তায় শুয়ে থাকত—দশ-পনেরো বছর আগে পর্যন্ত তাই দেখেছি। কেউ কেউ ওরি মধ্যে আনাচে-কানাচে কোনো দোকানের কোণে, কোনো বাড়ির রকে অথবা কোনো নিরাপদ

জায়গায় রাত কাটায়। বোম্বাই শহরের শীত খুবই কম। কিন্তু যতই কম হোক না কেন—তাই মাথায় ক'রে রাস্তায় প'ড়ে থাকা কষ্টকর। এই সময় তারা এখানে-সেখানে থেকে কিছু ইন্ধন যোগাড় ক'রে সন্ধ্যারাতেই ধুনি জ্বালিয়ে নিয়ে এক এক দল গোল হয়ে আগুন তাপতে ব'সে যায়। এই আগুন থেকে অনেকসময় অগ্নিকাণ্ডের সৃষ্টি হয়।

শীত যে-বছর এরি মধ্যে একটু বেশি পড়ে সে-বছর দু'-একজন ভিখিরী পথে ম'রে প'ড়ে থাকে। এদের মধ্যে পুরুষেরা খুব জুয়ো খেলে। মানুষের মনের কোমল বৃত্তির উপর এদের জীবনযাত্রা নির্ভর করলেও, এদের নিজেদের মনে কোনো কোমল বৃত্তির বালাই আছে ব'লে মনে হয় না। নিজেদের মধ্যে ঝগড়া, মারপিট, গালাগালি লেগেই আছে। ভিখিরী হ'লেও এরা সকলেই খুব দরিদ্র নয়—এদের মধ্যে অনেকেরই বেশ পয়সাকড়ি থাকে। বিশেষ ক'রে স্ত্রীলোক-দের। রাস্তায় ম'রে প'ড়ে আছে অথবা হঠাৎ গাড়ি চাপা প'ড়ে মারা গিয়েছে এমন স্ত্রীলোক ভিখিরীর কোমর থেকে দু'-দশহাজার টাকার গোঁজ আবিষ্কৃত হয়েছে একাধিকবার। এরা অভিনয়-বিদ্যায় অসম্ভব পারদর্শী। রঙ্গমঞ্চে দৃশ্য-পটের মাঝে বিভ্রান্তকারী আলোকমালার সম্মুখে দাঁড়িয়ে অভিনেতা বা অভিনেত্রী যে ভাবরূপ মুখে ফুটিয়ে তোলেন, অবলীলায় এরা প্রকাশ্য দিবালোকে ফুটপাথের ওপর দাঁড়িয়ে নিয়তই সেইসব বিচিত্রভাবের ব্যঞ্জনায় পথিকের দৃষ্টি অনায়াসেই আকর্ষণ ক'রে থাকে। যে ব্যক্তি দিব্যচক্ষুর অধিকারী সে হয়তো সারাজীবন জন্মান্ধের ভূমিকা অভিনয় করলে। দৌড়-প্রতিযোগিতায় যে প্রথম হবার যোগ্যতা রাখে, হয়তো খঞ্জের ভূমিকায় অভিনয় ক'রেই সে জীবন কাটালে। এ ছাড়া রূপসজ্জাতেও তাদের দক্ষতা কম নয়। এমন কুঠে, এমন ল্যাংড়া এরা সাজতে পারে যে, তা আসল কি নকল ধরবার জন্য অণুবীক্ষণ যন্ত্র লাগাতে হয়।

ভিখিরীদের মধ্যে সাধারণত দু'টি শ্রেণী দেখতে পাওয়া যায়। এক, যারা দুর্দশায় প'ড়ে এই জীবনেই ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছে। আর এক, যারা ভিখিরী হয়েই জন্মেছে। কিন্তু প্রথম শ্রেণীরই হোক বা দ্বিতীয় শ্রেণীরই হোক—ভিখিরি-জীবনে একবার অভ্যস্ত হয়ে পড়লে তা থেকে ফিরে আসা সম্ভব নয়। ভিক্ষা করবার সময় লোকের মনে সহানুভূতি জাগিয়ে তোলবার চেষ্টায় যেসব কাতরোক্তি এরা প্রণয়ন করে, তার মধ্যে বুদ্ধির প্রাখর্য ও চাতুর্য বেশ দেখতে পাওয়া যায়। একদল লোক আছে তারা ভিখিরী পোষে। অনেক শিশু অন্ধ ও বিকলাঙ্গ লোকদের দিয়ে তারা ভিক্ষে করায়—সময়মত

ঠিক জায়গাটিতে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দেয় ও উঠিয়ে নিয়ে আসে। ভিক্ষা ক'রে যা রোজগার করে এরা তা নিয়ে নেয়, বদলে তাদের খেতে-পরতে দেওয়া হয় মাত্র।

ভিখিরীদের সম্বন্ধে এক কথায় ব'লে শেষ করা যায় না। দেশে বা প্রদেশে আবার তাদের বিভিন্ন হাল-চাল আছে। ধর্মের নামে ফোঁটা-তিলক-কাটা অথবা পুঁতির-মালা-আলখাল্লাধারী ভিখিরীও অসংখ্য। ভিখিরীদের জীবন-কথা বিপুল বিচিত্র এবং বিস্ময়কর। দেশে-বিদেশে ভিন্ন। অনেক লোক মিলে অনেকদিন ধ'রে এদের সঙ্গে মেলামেশা করলে এবং এদের জীবন সম্বন্ধে গবেষণা করলে সমস্ত জানা যেতে পারে। কিছুদিন রাস্তায় শুয়ে তাদের সম্বন্ধে যেটুকু জেনেছি তা এখানে প্রকাশ করলুম।

কি ক'রে আমরা জুতোর দায় থেকে মুক্ত হলুম সে-কথা কিছু আগে বলেছি। আশ্চর্যের বিষয় যে সেই রাত্রি দ্বিপ্রহরে সমুদ্রের ধারে নির্জন জায়গাতেই আমাদের পেছনে লোক ছিল। আমাদের সঙ্গে তখনো গোটা-কয়েক টাকা ছিল। তার সন্ধান পেলে হয়তো জুতোচোর প্রাণচোর হয়ে দাঁড়াতে পারত। লোকগুলো যে আমাদের হত্যা করেনি, ছেঁড়া-জুতোগুলোই নিয়ে ছেড়ে দিয়েছে এজন্য সেদিন সতিই তাদের ধন্যবাদ দিয়েছিলুম।

জুতো যাক—দু'দিন বাদে জামা-কাপড়গুলোও যে যাবে তার কিছু কিছু নিদর্শন পাওয়া যেতে লাগল। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াই 'চাকরি দিবি' 'চাকরি দিবি' ক'রে। কিন্তু কোথায় চাকরি! আমার মনে বিশ্বাস ছিল, এই যে আমাদের দেশ—মন্দির-দেউল-তীর্থে ভরা, এর মধ্যে লোকে না খেয়ে মরে না। কিন্তু এতদিন এতরকম দুঃখ-দুর্দশার অভিজ্ঞতায় যা হয়নি, এবার তাই হতে আরম্ভ করলে। অর্থাৎ আমার বিশ্বাসের—আমাদের আত্মবিশ্বাসের ভিত্তিমূল—যার ওপর এতদিন ধ'রে আমরা কল্পনার সৌধ নির্মাণ করেছিলুম তিল তিল ক'রে, সেই ভিত্তিমূল শিথিল হয়ে আসতে লাগল। আমরা দিব্যচক্ষে দেখতে লাগলুম, আমরাও একদিন পথচারী ভদ্রবেশধারীদের সম্মুখে হাত বাড়িয়ে সকাতরে ভিক্ষা করছি।

কিন্তু আশ্চর্য এই যে সেদিন ভিক্ষাবৃত্তির সম্মুখীন হয়েও নিজেকে সাংঘাতিক বিপদগ্রস্ত ব'লে মনে করিনি। শুধু এই মনে হয়েছিল, যদি ভিক্ষাবৃত্তিতেও বাধা আসে তবে কি আবার ফিরে যেতে হবে সেই জীবনে—যে জীবনকে উপেক্ষা

ক'রে চলে এসেছি, বাড়ি অথবা জানা-শোনা লোকের সাহায্য না নিয়ে জীবনে সাফল্য লাভ করব ব'লে। তবুও মনে মনে ঠিক ছিল যে শেষপর্যন্ত না দেখে ফিরব না। ভিক্ষার মধ্যে যতই দৈন্য যতই বিপদ থাকুক না কেন! বিপদ যখন দূরে থাকে তখন তাকে যত সাংঘাতিক ও অসহনীয় মনে হয়—কাছে এসে পড়লে আর ততটা থাকে না।

এই সময়ে একদিন ক্রফোর্ড-মার্কেটে ঘুরে বেড়াচ্ছি। পায়ে জুতো নেই, আস্ত জামা-ধুতিগুলো পুঁটুলি ক'রে বগলদাবা করা। ক'দিন থেকেই ছেঁড়া-জামা গায়ে চড়িয়ে ঘুরছি। এক জায়গায় দেখি সার-সার চিনির দোকান রয়েছে। কিরকম খেয়াল হল, পথের মাঝে বৃহত্তর ক্ষেত্রে নামবার আগে এইখানেই ভিক্ষে করবার একটু রিহার্শ্যাল দিয়ে নিলে মন্দ হয় না। যেমন মনে হওয়া অমনি তড়াক ক'রে এগিয়ে গিয়ে এক দোকানদারকে গিয়ে বললুম—বাবা, আজ দু'দিন পেটে কিছু পড়েনি, একটু চিনি দাও তো খেয়ে জল খেয়ে প্রাণরক্ষা করি। বলা বাহুল্য যে বিপদের সময়ে 'সডা অন্ধা'-র মতো মাতৃভাষাই মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল।

আমার কথা শুনে লোকটা মুখ খেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করলে—ক্যা? ক্যা বোল্‌তা তুম?

এক দাঁত-খিঁচুনিতেই ভিখিরীর ভূত কাঁধ থেকে 'দে দৌড়' মারলে। কিন্তু তখন রণে ভঙ্গ দিয়ে চলেও আসা যায় না! তখুনি করুণ রস থেকে গম্ভীর রসে উত্তীর্ণ হয়ে বলা গেল—দেখ, আমার মনিবদের চায়ের দোকান আছে। সে আমাকে কয়েকরকম দানার চিনির নমুনা নিয়ে যেতে বলেছে—কয়েকরকম দানার চিনি ছোট ছোট কাগজে মুড়ে আমাকে দিতে পার?

বলা-মাত্র লোকটা লাফ দিয়ে উঠে বোধ হয় তিন-চার রকমের চিনি বেশ খানিকটা ক'রে কাগজে মুড়ে আমার হাতে দিয়ে দাম ব'লে দিলে। সর্বসমেত ওজন করলে বোধ হয় সে পোয়া-দেড়েক মাল হবে।

চিনি নিয়ে তো বিজয়গর্বে বন্ধুদের কাছে ফিরে এলুম—তারা এতক্ষণ হাঁ ক'রে আমার কাণ্ড-কারখানা দেখছিল।

বেশ মনে আছে, সেদিন সারাদিন আমরা চিনি-জল খেয়েই কাটিয়ে দিয়েছিলুম।

এমনি ক'রেই দিন কাটছিল। কাজকর্মের কোনো হদিশ নেই, মনের মধ্যে আশাও নেই, নিজেদের মধ্যে ভবিষ্যতের জন্য কোনো পরামর্শও আর

নেই। সমস্ত দিন পথে পথে ঘুরে বেড়াই, বিকেলবেলায় সূর্যাস্তের কিছু আগে সমুদ্রের ধারে এসে জুটি। সেখানে সে-সময় একটু ঘাটের মতন পাথরে বাঁধানো জায়গা ছিল, তারই ধারে এসে বসি। দলে দলে পার্শী নরনারী সেখানে এসে দাঁড়াচ্ছে সমুদ্রের দিকে মুখ ক'রে। অস্তোন্মুখ দিবাকরের দিকে ভক্তিভরে চাইছে—কোমর থেকে পৈতে খুলে নিয়ে সমুদ্রের জলে ভিজিয়ে আবার সেটাকে পেঁচিয়ে কোমরে জড়িয়ে গেরো বাঁধছে। দলে দলে লোক আসছে সমুদ্রের তীরে বায়ুসেবনের উদ্দেশ্যে—গুজরাটী, মারাঠী, খোজা, বোরী—তরুণ-তরুণী বৃদ্ধ প্রৌঢ়। সকলের মুখই প্রফুল্ল। ব'সে থাকি—আর ভাবি ঐ আনন্দ-কোলাহলের মধ্যে আমার কোনো স্থান নেই। আমি একটা লক্ষ্মীছাড়া, সৃষ্টিছাড়া জীব। জীবন-জল-তরঙ্গ চলেছে আমার সম্মুখ দিয়ে বেগে উদ্দাম গতিতে আর তারই কূলে আমি প'ড়ে আছি স্থাণুর মতন—আবর্জনার মতন। ছোট ছোট ছেলেমেয়ে সুন্দর পোশাক প'রে ঘাসের ওপর খেলে বেড়ায়—মনে হয় যেন একঝাঁক প্রজাপতি রোদে খেলছে। মনে মনে ভাবি, ওদের মতন হালকা জীবন আমার কি কখনো ছিল!

রোজ রোজ সমুদ্রের ধারে একেবারে আকাশের নিচে শুয়ে শুয়ে শরীর খারাপ হতে লাগল। সকালবেলা উঠে দেখি আমাদের সকলেরই মুখ ফুলেছে—সমস্ত দিন ঘোরাঘুরি ক'রে একটু চুপসে যায় কিন্তু পরদিন সকালবেলা আবার ফুলে ওঠে। তার ওপর প্রতিদিন পেট ভরে খাওয়াও জোটে না। বেশ বুঝতে পারা যেতে লাগল—ব্যাপার সুবিধার নয়।

এরই মধ্যে একদিন এমন একটা ব্যাপার হয়ে গেল যা আর একটু হ'লেই সাংঘাতিক কাণ্ডে পরিণত হতে পারত। ভিখিরীদের রাস্তায় রাত না কাটালেও তাদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক একেবারে রহিত হয়নি। দিনের মধ্যে একবার কি দু'বার আমরা ভিখিরী-পাড়ায় সেই দোকানদারের সঙ্গে দেখা করতে যেতুম। সেখানে যাবার প্রধান আকর্ষণ ছিল মার্কিন ও ইউরোপের নানা দেশের সস্তা সাময়িক পত্রপত্রিকাগুলি—সেগুলির মধ্যে রঙিন ও একরঙা নগ্ন ও অর্ধনগ্ন নারীচিত্রগুলি। অনাহার-নিবন্ধন পাকস্থলীর যন্ত্রণা ও আপন অবস্থা সম্বন্ধে চিন্তাব্যাধির চমৎকার প্রতিষেধক ছিল সেই চিত্রগুলি। তার ওপরে সেই দোকানদার আমাদের ঠিক ভিখিরী ব'লে গণ্য করত না এবং তার সঙ্গে মাঝে মাঝে বিড়ি আদান-প্রদানও চলত। বলা বাহুল্য যে, দু'-চারজন ভিখিরীও এই সময় আমাদের সঙ্গে এসে গল্পসল্প করত—মাঝে মাঝে

এক-আধটা বিড়িও চেয়ে নিত। এখন আমরা কোন্ পাড়ায় রাত কাটাচ্ছি, সেখানে ব্যবসাপত্র কেমন চলে অর্থাৎ ভিক্ষেটিক্ষে কেমন জোটে, সে-পাড়ার সর্দার কে, সে কেমন লোক—ইত্যাদি অনেক কথাই তারা মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করত। আমরাও বানিয়ে বানিয়ে যা মনে আসে তাই ব'লে দিই। ওদের মধ্যে দু'-একজন আমাদের বলত—আবার এখানে ফিরে আয়। কোথায় প'ড়ে আছিস?

মনে মনে হেসে বলতুম—তাই আসব। ওখানে তেমন সুবিধে হচ্ছে না ভাই!

একদিন, তখন বিকেল প্রায় কেটে গেছে, আমরা তিনজন সারাদিন ধরে মাইল-দশেক চক্কর মেরে সেই বই-এর দোকানে ছবির বই-এর পাতা ওলটাচ্ছি এমন সময় কালীচরণ বললে—দাঁড়া, অনেকদিন বিড়ি খাওয়া হয়নি। ব'লেই হনহন ক'রে চলে গেল বিড়ির দোকানের দিকে। আমরা যেখান থেকে বিড়ি কিনতুম সে-দোকানটা এই বই-এর দোকান থেকে একটু দূরে হ'লেও সেখান থেকে দোকানটা দেখা যেত। আমরা দেখতে লাগলুম—কালীচরণ বিড়ি কিনে দোকানের দেশলাই দিয়ে একটা বিড়ি ধরালে। জাজ্বল্য নারকোল-দড়ি জিইয়ে রাখার প্রথা তখনো বিড়ির দোকানে প্রচলিত হয়নি। আমাদের কালীচরণ বিড়ি টানতে টানতে হেলে-দুলে অগ্রসর হতে হতে হঠাৎ এক ভদ্রবেশধারী লোককে ধরে তার পায়ের দিকে চেয়ে কি-সব বলতে লাগল। দেখলুম লোকটা কালীর কথা শুনে অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে কালীকে মারতে উদ্যত হতেই কালী একটি ঘুষো তার মুখে জমিয়ে দিলে। লোকটা বেশ গুণ্ডা। সে ঘুষো খেয়ে কালীকে মারলে এক লাথি। তারপরে তাকে জাপটে ধরে পথে ফেলে মারতে আরম্ভ ক'রে দিলে। কালীকে বাঁচাবার জন্য আমি ও পরিতোষ ছুটলুম। কিন্তু আমরা পৌঁছবার আগেই চারদিক থেকে আমাদের বন্ধুরা অর্থাৎ ভিখিরীর fleet ছুটে এসে পড়ল—"কলকাত্তাওয়ালাকো মার ডালা" বলতে বলতে। ততক্ষণে আমরা গিয়ে পৌঁছেচি। দেখলুম ভিখিরীর দল কালীর আততায়ীকে ধরে খুব ঠেঙাচ্ছে। একদল লোক কালীকে তুলে একটু দূরে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিয়েছে। সবাই বলছে—কলকাত্তাওয়ালা মর গিয়া, পাঁওমে চোট লাগা—

কী যে হয়েছে কিছু বুঝতে পারবার আগেই চারদিক থেকে বোধ হয় জন-আষ্টেক কনস্টেবল ছুটে এল রুল উঁচিয়ে। পুলিসের আবির্ভাব দেখেই ভিড়

গেল পাতলা হয়ে। ভিখিরীর দল কালীকে কাঁধে তুলে নিয়ে কোথায় সরে পড়ল। আমরা ছুটে সেই দোকানের কাছে যেতেই দোকানদার বললে—তোমরা দোকানের মধ্যে উঠে এস, না হ'লে পুলিসে ধরতে পারে।

আমি ও পরিতোষ কালবিলম্ব না ক'রে দোকানে উঠে পড়লুম। দেখলুম কনস্টেবলরা ঘুরে ঘুরে কি হয়েছিল তার সন্ধান নিতে লাগল। একজন কনস্টেবল আমাদের দোকানে এসে জিজ্ঞাসা করায় দোকানদার বললে—এখানে সারাদিন ধরে তো হাঙ্গামার অন্ত নেই—কে তার হিসাব রাখে বাপু!

কনস্টেবল সেখান থেকে চলে গেলেও সেই পথেই ঘোরাফেরা করতে আরম্ভ করলে। আমরা তখনো ভয়ে দোকানেই ব'সে রইলুম। একটুক্ষণ পরে দোকানদার বললে—তোমরা এবার নেমে এই রাস্তা দিয়ে অন্য জায়গায় চলে যাও।

আমরা বললুম—কিন্তু আমাদের বন্ধুর কি হ'ল, সে কোথায় গেল—তাকে ফেলে যাই কি ক'রে!

দোকানদার বললে—তোমরা ঘণ্টা-দুয়েক গা-ঢাকা দিয়ে থাক। দোকান বন্ধ করবার আগেই ফিরে এসো।

সেখান থেকে তখনকার মতন স'রে পড়লুম। কিন্তু স'রে প'ড়ে যাই কোথায়। রাস্তায় পাহারাওয়ালা দেখলেই চমকে উঠে এড়িয়ে যাই। মনে জোর ক'রে সাহস আনবার জন্য বলি যে, আমরা তো সেই হাঙ্গামার মধ্যে ছিলুম না, অতএব ভয় করবার কিছু নেই। ভয়শূন্য মনে দু'কদম চলতে-না-চলতেই পাহারাওয়ালা দেখলেই লাগে ভয়। শেষকালে অত বড় ভয়ের বোঝা বয়ে নিয়ে ঘুরে বেড়ানো অসম্ভব হয়ে উঠল—আমরা মাঠে গিয়ে বসলুম।

সেখানে ব'সেও ঐ চিন্তা—ঐ কথা! কোথা থেকে কি হয়ে গেল! অমন যে ঠাণ্ডা মেজাজের কালী—সাত চড় মারলেও যে রাগে না—সে কিনা খামকা রাস্তার এক ভদ্রলোকের সঙ্গে মারপিট লাগালে! ভাগ্যে ভিখিরী-বন্ধুরা ছিল তাই রক্ষে, না হ'লে নিশ্চয় কালীকে পুলিসে ধরে নিয়ে যেত—কালীর সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও গিয়ে জুটতে হ'ত হাজত-ঘরে।

কোনোরকম ক'রে ঘণ্টা-দুয়েক কাটিয়ে আবার গিয়ে উপস্থিত হলুম সেই দোকানে। তখন সে-রাস্তা দেখে বোঝাও যায় না যে সন্ধ্যার সময় সেখানে হাঙ্গামা হয়ে গিয়েছে। ভিখিরীরা তখন ফিরে আসতে আরম্ভ করেছে। কেউ ঘুরে বেড়াচ্ছে, কেউ কেউ ইতিমধ্যে তাদের জায়গা দখল ক'রে শুয়ে পড়েছে, নয়তো চা বা অন্য কিছু খাবার খাচ্ছে।

আমরা যাওয়ামাত্র সেই দোকানদার বললে—তোমাদের বন্ধুর খোঁজ পাওয়া গিয়েছে। সে এইখানেই—এই কাছেই আছে এবং ভালোই আছে।

আমরা জিজ্ঞাসা করলুম—কোন্‌খানে আছে জানতে পারলে, যাই সেখানে।

দোকানদার বললে—কোন্‌খানে আছে তা ঠিক জানি না,—তবে দাঁড়াও দেখছি—

লোকটি দোকান থেকে নেমে আমাদের বললে—তোমরা দোকানের দিকে একটু নজর রেখো। তারপর কিছুক্ষণ এদিক-ওদিক করতে করতে দূরে কাকে দেখতে পেয়ে পা চালিয়ে এগিয়ে গেল।

একটু পরে সে একটি ছেলেকে ধরে নিয়ে এসে বললে—এই এরাই তোমাদের বন্ধুকে নিয়ে গিয়েছে।

আমরা বললুম —আমাদের নিয়ে চল সেখানে।

ছেলেটি বললে—এখন হবে না। ধোবিতালাওয়ে এক শেঠের মেয়ের বিয়ে হবে আজ রাত্রে। সেখানে ভিখিরী-বিদায় করা হবে। কাল বেলা আটটা-ন'টার সময় এসে তোমাদের বন্ধুর কাছে নিয়ে যাব। সে ভালো আছে, তোমরা কিছু ভেব না।

ব'লেই সে দৌড় দিল।

কালীচরণ সম্বন্ধে হাজার আশ্বাস পেয়েও আমরা নিশ্চিন্ত হতে পারলুম না। ভাবতে লাগলুম—বোম্বাই কি অদ্ভুত জায়গা বাবা, মুহূর্তের মধ্যে মানুষকে মানুষ গায়েব!

আমাদের অবস্থা দেখে সেই দোকানদার সহানুভূতির সঙ্গে বললে—তোমরা বৃথাই ভাবছ। তোমাদের বন্ধু দিব্যি ভালোই আছে।

খানিকক্ষণ পরে সে বললে—আজ রাত্রে তোমরা কোথায় শোবে?

কালীচরণের ভাবনায় এতক্ষণ নিজেদের কথা কিছুই মনে ছিল না। লোকটির প্রশ্ন শুনে বললুম—আজ রাত্রে এইখানেই কোথাও শুয়ে থাকব—কাল ভোরবেলা আবার ঐ ছেলেটিকে ধরতে হবে তো।

দোকানদার বললে—তোমরা এক কাজ কর। সেদিনকার মতো আজও দোকানের পেছনদিকে শোও।

আমরা বললুম—সেদিন সারারাত্রি ধরে যা জ্বালাতন হয়েছি—আর ওখানে শুতে ভরসা হয় না।

দোকানদার বললে—আমি ব'লে দিচ্ছি। কেউ তোমাদের বিরক্ত করবে না, বেপরোয়া প'ড়ে ঘুমুবে।

দোকানদার আবার দোকান থেকে রাস্তায় নেমে এদিক-ওদিক ঘুরে চার-পাঁচজন মুরুব্বি-গোছের ভিখিরীকে ধরে নিয়ে এসে আমাদের দেখিয়ে দিয়ে বললে—দেখ, আজ থেকে এরা আমার এই জায়গায় রাত্তিরে শোবে। পরদেশী লোক এরা—এদের জ্বালাতন করবে না।

মুরুব্বিরাও দেখলুম সেদিন আমাদের ওপর দয়া-পরবশ হয়ে বললে—বেপরোয়া শুয়ে থাক, কেউ তোমাদের কিছু বলবে না।

আমাদের এই নতুন অনর্থপাতে দেখলুম, সকলেই আমাদের ওপর দয়ার্দ্র হয়ে উঠেছে। আমি বরাবর লক্ষ্য করেছি যে জীবনাকাশ যখন ঘনঘটায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে, নিরাশার অন্ধকারে যখন মনে হয়—আর না, এই বুঝি সব শেষ হয়ে গেল, তখনই আকাশের অন্য কোণ দিয়ে কখনো একটু, কখনো বা অঝোরে করুণাধারা নেমে আসে। সে-রাত্রে সেই অপরিচিত দোকানদার, যে আমাদের বিদেশী ভিখিরী ব'লেই জানত, সে রাত্রি-যাপনের জন্য শুধু জায়গা নয়, মাটিতে পাতবার জন্য পুরোনো মোটা কাগজ ও মাথায় দেবার জন্য দু'জনকে দু'তাড়া পুরোনো 'টিট্-বিট্‌স্' দিলে। মনে হল অনেকদিন পর ভালো বিছানায় ঘুম হবে। কিন্তু হায়! মহাকবি বলেছেন যে ঘুমও দুঃস্বপ্ন দ্বারা আক্রান্ত হয়—'বাবা কালী'র চিন্তায় থেকে থেকে ঘুম ভেঙে যেতে লাগল—এই করতে করতে রাত্রি অবসান হল।

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই ভিখিরীদের খোঁজ করলুম। কিন্তু কে কার তোয়াক্কা রাখে, অধিকাংশই তখন রোঁদে বেরিয়ে গিয়েছে। যারা আছে তাদের মধ্যে কেউই কলকাত্তাওয়ালার খোঁজ জানে না। ইতিমধ্যে দোকানদারমশায় এসে পড়ল। সে বললে—তোমরা চা-টা খেয়ে এস, এর মধ্যে আমি ওদের কাউকে ধরে তোমাদের বন্ধুর খোঁজ করছি।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা চা খেয়ে ফিরে এলুম কিন্তু কোথায় কে! কারুরই দেখা নেই! দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বেলা চড়ে গেল, রোদ হয়ে পড়ল চড়চড়ে। বেলা প্রায় বারোটা অবধি অপেক্ষা করবার পর একজন একেবারে অচেনা ভিখিরী ছোকরা এসে আমাদের বললে—কলকাত্তাওয়ালার কাছে যাবে তো চল।

আর বাক্য-বিনিময় না ক'রে তার অনুসরণ করলুম।

আমরা যেখানটায় থাকতুম, অর্থাৎ যে রাস্তাটায় আমরা শুতুম, তারই একটু

দূরে একটা বড়-গোছের বাজার ছিল। মাছ-তরকারির বাজার নয়—কাপড়-চোপড়, কাঁচের বাসন ও মানুষের ব্যবহার্য প্রায় সব জিনিসের দোকানই ছিল এই বাজারে। আমরা বাজারের বাইরের দিকটাই এতদিন দেখেছিলুম। সেই ছেলেটি আমাদের নিয়ে বাজারের ভেতরে ঢুকল।

প্রকাণ্ড বাজার। বড় বড় দোকান,—লোকজন গমগম করছে। সে এক বিরাট কাণ্ড। কলকাতার চাঁদনী বাজারের মতনই সরু সরু রাস্তা আর তার দু'পাশে বড় বড় দোকান, কিন্তু চাঁদনীর চেয়ে অনেক অনেক বড়। এই বাজারের সরু সরু রাস্তা বেয়ে আমরা বাজারের শেষের দিকে এসে পৌঁছলুম।

এখানে অনেকখানি জমি জুড়ে সব অর্ধেক-তৈরী ঘর প'ড়ে রয়েছে। ঘর-গুলোর ইঁটের দেওয়াল ছাদ সবই আছে, কিন্তু দরজা-জানলা নেই। দেওয়ালের গায়ে বালির কাজও নেই। দেওয়ালের অবস্থা দেখে মনে হয় ঘরগুলো অনেকদিন আগেই তৈরি হয়েছে, কিন্তু কেন যে সেগুলি এমন অর্ধসমাপ্ত হয়ে প'ড়ে আছে তা বলতে পারি না। দেখলুম এইসব ঘরে ভিখিরীর দল বাস করছে—শত-শত হাজার-হাজার। ছেলে-মেয়ে নারী কুকুর বেড়াল সব কিলবিল ক'রে বেড়াচ্ছে। এ জায়গাটাকে ভিখিরীদের family quarter বলা চলতে পারে। এক-একটা ঘরে দু'টো-তিনটে ইঁট সাজিয়ে আগুন জ্বালিয়ে অনেক জায়গায় রান্নাও চড়ানো হয়েছে দেখলুম। কয়েকটা এইরকম ঘর পেরিয়ে গিয়ে সেই ছেলেটি আমাদের নিয়ে একটা ঘরে গিয়ে ঢুকল। সেই ঘরেরই একটা কোণ দেখিয়ে সে বললে—ঐ দেখ, তোমাদের দোস্ত শুয়ে রয়েছে।

একটু এগিয়ে গিয়ে দেখলুম আমাদের 'বাবা কালী' শুয়ে আছেন কালা-পাহাড়ের মতন। ঘরের মেঝে কাঁচা, তার ওপর চেটাইয়ের মতন কি-একটা পাতা। মাথায় একটা থান-ইঁট, ডান পায়ে একটা পাম্প্-শ্যু। ডান পা-খানা অসম্ভব ফোলা, হাঁটুর বিঘত-খানেক নিচে একটা দগদগে ঘা। তার ওপরে মাছি বসে রয়েছে। মুখখানাও ফুলেছে। আমরা ডাকাডাকি করায় কালী চোখ খুলে বললে—এই যে এসেছিস—বোস।

তার একপাশে একটা ভাঙা ময়লা কাঁচের গেলাস, তাতে দুধ লেগে রয়েছে, আর একটা জ্যামের টিনও তার পাশে রয়েছে। সেগুলিকে সরিয়ে তো বসে পড়া গেল। কালী বলতে লাগল—এরা ছিল ব'লে কাল বেঁচে গিয়েছি। নইলে ঠিক পুলিসে ধরে নিয়ে যেত।

হঠাৎ তার অমন বীরত্ব কেন চাগলো জিজ্ঞাসা করায় কালী যা বললে তার

তাৎপর্য হচ্ছে—যেদিন থেকে আমাদের জুতো চুরি গিয়েছে সেইদিন থেকে সে তক্কে-তক্কে আছে, ঐরকম জুতো-পরা লোক দেখলেই ধরবে। কারণ বোম্বাই শহরে ধুতিপরা লোক-মাত্রই চপ্পল পায়ে দেয়—পাম্প্‌শ্যু-জুতো সেখানকার দেশী লোক পরে না।

কালী বলতে লাগল—সেদিন বিড়ি কিনে ফেরবার সময় দেখি একটা লোক আমার জুতো-জোড়া পায়ে দিয়ে যাচ্ছে। ধরলুম ব্যাটাকে—তারপর এই ব্যাপার। এ বাবা আমার হক্কের ধন—এই দেখ, আমার পায়ে ঠিক ফিট্ করেছে—

এই ব'লে সে ডান পা তুলে দেখাতে লাগল। আর এক পাটি মাথার ইঁটের কাছ থেকে টেনে বার ক'রে আমাদের দেখালে। তাতে দেখলুম, সত্যিই সেটাতে কলকাতার দোকানের টিকিট তখনো লাগানো রয়েছে।

কালীচরণ বলতে লাগল—এরা আমায় খুব যত্ন করছে। ইঁটের বালিশ হলে কি হবে—দিব্যি শুয়ে আছি। এরা কোথা থেকে দুধ পাঁউরুটি চা নিয়ে আসছে। না-খেয়ে-খেয়ে আধমরা হয়ে গিয়েছিলুম। কাল সন্ধ্যে থেকে তিন গেলাস দুধ খেয়েছি। দেখছিস না, এই চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে কিরকম পোস্টাই হয়েছে ?

আমরা সেখানে ব'সে থাকতে-থাকতেই একজন কোট-প্যাণ্ট-পরা পার্শী ডাক্তার এসে উপস্থিত হলেন। ভিখিরীরাই তাঁকে আজ সকালে খবর দিয়েছে। দেখলুম, সে-মহলে তিনি খুবই পরিচিত। ভদ্রলোক খুব যত্ন ক'রে কালীকে দেখে আমাদের বললেন—বেশ জ্বর রয়েছে। আমি খাবার ও পায়ে লাগাবার ওষুধ দিচ্ছি। কালকের মধ্যে যদি জ্বর না যায় তা হ'লে হাসপাতালে পাঠাতে হবে।

আমরা বললুম—এখানে আমরা তো কারুকে চিনি না। হাসপাতালে পাঠাতে হ'লে কি ব্যবস্থা করতে হয় তা তো কিছুই জানি না।

ডাক্তার বললেন—সে যা করবার আমি ক'রে দেব—কিছু ভেব না।

ডাক্তারের সঙ্গে ওষুধ আনতে গেলুম তাঁর ডিস্‌পেন্‌সারিতে। বাজারের কাছেই মস্ত দাওয়াইখানা—ব্যবসা তাঁর নিজের। রুগীদের কাছে কিছু নেন না—খালি ওষুধের দাম। ওষুধ নেওয়ার পর জিজ্ঞাসা করলুম—কত দিতে হবে ?

ডাক্তার হেসে বললেন—একপয়সাও না। আজ বিশ বছর ধরে আমি ওদের বিনামূল্যে চিকিৎসা করি ও ওষুধ দিই। ওদের আশীর্বাদের জোরেই আমার এই ব্যবসা চলে। ওরা আছে ব'লে আমার এখানে এতদিন চুরিচামারি কিছু

হয়নি। শুধু আমার নয়—ঐ বাজারের সমস্ত দোকানদার ওদের সাহায্য দেয়—অত বড় বাজারেও কখনো চুরি হয় না—এমনকি পকেটমার পর্যন্ত ওখানে ঢুকতে পায় না। একবার বাজারের মালিকরা ওখান থেকে ভিখিরীদের বাস তুলে দেবার চেষ্টা করেছিল। ঠিক সেই সময়েই একদিন বাজারে ভীষণ আগুন লাগল। দু'দিন ধরে ফায়ার-ব্রিগেড দিন-রাত চেষ্টা ক'রে তবে সে-আগুন নেভায়। কে বা কারা সেই আগুন লাগিয়েছিল, পুলিস অনেক চেষ্টা ক'রেও তা ধরতে পারলে না। তবে খোঁজ ক'রে জানা গিয়েছিল যে, প্রথমে একসঙ্গে চার-পাঁচটি দোকানে আগুন লাগে। যাই হোক, সেই থেকে বাজারের মালিক অথবা দোকানদারেরা সকলেই ওদের সঙ্গে খুবই সদয় ব্যবহার করে—ওরাও বাজার পাহারা দেয় আর নির্বিবাদে ওদের বংশবৃদ্ধি করে।

কয়েকদিন পেটে ওষুধ ও পায়ে মলম লাগিয়ে কালীচরণ চাঙ্গা হয়ে আবার আমাদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াতে আরম্ভ করলে। চলা-ফেরা শুরু করতেই সেও আমাদের সঙ্গে সেই বই-এর দোকানের পেছনে শুতে লাগল।

একদিন এইরকম পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছি এমন সময়ে এক রাস্তায় একটা নতুন বাড়ির দোতলায় দেখলুম ইংরেজী, বাংলা ও হিন্দী অক্ষরে লেখা বড় বড় সাইনবোর্ড ঝুলছে—লক্ষ্মীর ভাণ্ডার—কে. বি. সেন এণ্ড কোং।

লক্ষ্মীর ভাণ্ডার ও কে. বি. সেন এণ্ড কোং—এই দুই নামই বাঙালীদের কাছে সে-সময়ে বিশেষ জানা ছিল। স্বদেশীর সময় কে. বি. সেন বোম্বাই থেকে দেশী ধুতি এনে কলকাতায় চালু করেছিলেন। বড়বাজারের তুলাপটিতে তাঁর দোকানে দু'তিনবার গিয়ে ধুতি কিনে এনেছি। সেখানে তাঁকে দেখেছিও। আমাদের পাড়াতেই সরলাদেবী ও তিনি লক্ষ্মীর ভাণ্ডার নাম দিয়ে একটা কারবার খুলেছিলেন। সেখানে যাবতীয় দেশী জিনিস পাওয়া যেত। সেই লক্ষ্মীর ভাণ্ডার বোম্বাই শহরে দেখে বড় আনন্দ হল। আমরা সোজা ওপরে উঠে গিয়ে দেখলুম—কলকাতার লক্ষ্মীর ভাণ্ডারেরই শাখা খোলা হয়েছে বোম্বাই শহরে। দোকানঘরে ঐ-দেশীয় একজন লোক রয়েছে। তাকে কে. বি. সেনের কথা জিজ্ঞাসা করায় জানা গেল যে, কুঞ্জবাবু ঐ ঘরে ব'সে আছেন।

কে. বি. সেনের নামই যে কুঞ্জবিহারী সেন এর আগে তা জানা ছিল না। সেই লোকটির কাছ থেকে জেনে নিয়ে আমরা কুঞ্জবাবুর সঙ্গে দেখা করতে গেলুম।

একটি ছোট্ট ঘর। প্রায় ঘর-জোড়া চৌকি। তাতে বেশ পুরু বিছানা, ধপধপে সাদা চাদর পাতা। তার ওপরে ধপধপে সাদা কুঞ্জবাবু বসেছিলেন।

আমরা গিয়ে তাঁকে নমস্কার করামাত্র তিনি স্মিতমুখে বললেন—এস, এস—ভেতরে এস।

মনে হল যেন তিনি এতক্ষণ আমাদেরই অপেক্ষায় বসেছিলেন। আমরা ভেতরে ঢুকতেই তিনি বললেন—দেখ, আমার ঘরখানি খুবই ছোট। বসবার জায়গা নেই বললেই হয়।

আমরা আমতা-আমতা ক'রে বললুম—তাতে কি হয়েছে! আমরা দাঁড়িয়েই আছি—আপনি ব্যস্ত হবেন না।

প্রথম সম্ভাষণাদি চুকে যাওয়ার পর কুঞ্জবাবু বললেন—তারপর! বোম্বাই কতদিন আসা হয়েছে? কি করছ এখানে? কিছু সুবিধা করতে পেরেছ?

কুঞ্জবাবুর কথাবার্তায় এমন একটা সহানুভূতি ও অমায়িকতা মাখানো ছিল যা এতদিন কারুর মধ্যেই পাইনি। আমরা ভাগ্যান্বেষণে বেরিয়েছি শুনে তিনি খুবই খুশী হলেন। উৎসাহ দিয়ে বললেন—এই তো চাই। বাঙালীরা বড় কুনো। তারা ঘর ছেড়ে কোথাও বেরুতে চায় না। কেরানীর কাজ ছাড়া সব কাজকেই হীন ব'লে মনে করে। দেখ—মাড়োয়ারীরা কোথায় কোথায় ভারতবর্ষ ছেড়ে দূরদেশে গিয়ে ব্যবসা করছে। বোম্বাইয়ের লোকেরাও এসব বিষয়ে মাড়োয়ারী-দের চেয়ে কম নয়।

এইসব ব'লে তিনি আমাদের বললেন—চলে যাও আফ্রিকা কি মরিশস দ্বীপে। দেখ সেখানে কিছু করতে পার কিনা। আমার বিশ্বাস নিশ্চয় কিছু করতে পারবে।

কুঞ্জবাবু কথা শুনতে শুনতে বুকে আবার জোর পেতে লাগলুম। তাঁকে বললুম—আমরা যদি মাঝে মাঝে আসি, আপনার কোনো অসুবিধে হবে না তো?

কুঞ্জবাবু হেসে বললেন—কিছু না, কিছু না। তোমরা দু'বেলা এস। আমি এখানে একলা থাকি, তোমরা এলে গল্পস্বল্প করা যাবে।

পরদিন সকালে আবার কুঞ্জবাবুর ওখানে গেলুম। আমাদের দেখে বললেন—এস এস।

বোম্বাইয়ে একরকম লম্বা-চওড়া কলার মতন দেখতে লঙ্কা পাওয়া যায়। দেখলুম ভদ্রলোক সেই লঙ্কা চিরে-চিরে মশলা ভরে রোদে দিচ্ছেন। বললেন—একলা থাকি, অনেক কিছুই নিজের হাতে ক'রে নিতে হয়।

সেদিনও তাঁর সঙ্গে অনেক কথা হল। কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করলেন—তোমরা এখানে কোথায় থাক?

বললুম—আমাদের থাকবার জায়গা কিছু নেই। সমস্ত দিন রাস্তায় ঘুরে ঘুরে বেড়াই, সমুদ্রে নেমে স্নান করি আর সমুদ্রের ধারেই বেঞ্চির ওপর প'ড়ে রাত কাটাই।

আমাদের কথা শুনে সেন-মশাই একেবারে চমকে উঠলেন। তিনি মনে করেছিলেন পালিয়ে এলেও তথাকথিত ভদ্রভাবে জীবনযাপন করবার সঙ্গতি আমাদের আছে। আমাদের অবস্থা শুনে বললেন—ঐ সমুদ্রে কখনো স্নান কোরো না। ঐ জলে অনেক বিষাক্ত সাপ থাকে। একবার ছুঁলে আর রক্ষে থাকবে না। সমুদ্রের ধারেও শুয়ো না, জুতো চুরি গিয়েছে, কোনোদিন হয়তো প্রাণ চুরি যাবে।

বই-এর দোকানের পিছনে শোবার যে আশ্রয় সম্প্রতি পাওয়া গিয়েছিল সে-কথা চেপে গিয়ে তাঁকে বললুম—কোথায় রাত কাটাই! যেখানে যাই সেখানেই পুলিসে তাড়া করে।

কুঞ্জবাবু একটু ভেবে বললেন—দেখ, এক কাজ কর। এই বাড়ির দোতলা থেকে পাঁচতলা অবধি অসংখ্য ঘর প'ড়ে রয়েছে, সব ঘর ভাড়া হতে এখনো অনেক কাল লাগবে। তোমরা রাত্রে একটা ঘরে শুয়ে থেক। কেউ কিছু বলে তো বলবে তোমরা আমার লোক।

সেদিন থেকে আমরা সেই নতুন বাড়ির চক্চকে মেঝেতে শুয়ে রাত কাটাতে লাগলুম। সেই বাড়িখানার নাম যতদূর মনে পড়ছে—নবাব বিল্ডিং।

যদুবাবুর আশ্রয়চ্যুত হয়ে অবধি এই প্রথম ঘরে শোবার সুযোগ মিলল।

এইরকম চলছে। রোজ দু'বেলা কুঞ্জবাবুর কাছে গিয়ে বসি, নানারকম কথাবার্তা হয়, আমাদের কাজের কিছু ঠিক নেই। একদিন মুখ ফুটে তাঁকে কাজের কথা ব'লেই ফেলা গেল। যদি মরিশসে কিংবা আফ্রিকায় অথবা যে-কোনো জায়গায় আমাদের কোনো কাজে লাগিয়ে দিতে পারেন তো বেঁচে যাই।

আমাদের কথা শুনে কুঞ্জবাবু কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বললেন—আপাতত তো কোনো কাজকর্ম হাতে নেই। আচ্ছা দাঁড়াও—মেটাজী আসুন, তাঁর সঙ্গে পরামর্শ ক'রে দেখি।

পরের দিন মেটাজীর সঙ্গে দেখা হল। কুঞ্জবাবুর সঙ্গে ব্যবসাসূত্রে তিনি প্রায় প্রতিদিনই লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে আসতেন। লোকটি দেখতে বেশ লম্বা-চওড়া

ধপধপে ফরসা, পরনে ধুতি অথচ মাথায় পার্শীদের মতন টুপি অথবা ডোঙার মতন একটা বস্তু। বোঁ বোঁ ক'রে বাংলা বলেন। কুঞ্জবাবু আমাদের বললেন—এখান থেকে কিছু দূরে কল্যাণ স্টেশনের কাছে পুনার এক শেঠ গভর্মেণ্টের কাছ থেকে একটা জঙ্গল কিনেছেন। খুব সুন্দর জঙ্গল—পাহাড়-ঝরনা ইত্যাদিও আছে। কল্যাণ থেকে পুনায় যেতে হলে যেসব জঙ্গল-পাহাড় ভেদ ক'রে যেতে হয় তারই খানিকটা আর কি! এই জঙ্গল কেটে সাফ ক'রে তিনি এখানে চাষ-বাস করছেন। সামান্য খানিকটা জায়গা সাফ ক'রে আপাতত চাষবাস শুরু করেছেন, পরে আস্তে আস্তে বাড়াবেন। দুই-একজন লোক এই জমির খানিকটা ক'রে ভাড়া নিয়ে নিজেরাও চাষবাস করছে। যাই হোক, এখানে নানা কাজের জন্য বিস্তর লোক খাটছে, মেটাজী সেখানে তোমাদের কিছু কাজ যোগাড় ক'রে দিতে পারেন। ভেবে দেখ—

এইসব কথা ব'লেই তিনি সংস্কৃত শ্লোক আওড়ালেন—যার অর্থ—বাণিজ্যে লক্ষ্মী বাস করে, তার অর্ধেক কৃষিকার্যে, ইত্যাদি ইত্যাদি। আমরাও মনে মনে সংস্কৃত শ্লোক আওড়ালুম—যার অর্থ—সর্বনাশ উপস্থিত হলে পণ্ডিতেরা অর্ধেক ত্যাগ করে। অতএব বাণিজ্য যখন হ'লই না তখন কৃষিকার্যই সই।

বলা বাহুল্য, আমরা তো তখুনি রাজী হয়ে গেলুম। মেটাজী বললেন—আমি শীগ্‌গিরই সেখানে গিয়ে তোমাদের জন্য সব বন্দোবস্ত ক'রে আসব।

এরপর আমরা রোজই খোঁজ নিই, কিন্তু শুনি যে, মেটাজীর সেখানে যাবার সুবিধা হয়নি। প্রায় দিন পনেরো পরে একদিন কুঞ্জবাবু বললেন—কাল সকালে মেটাজী তোমাদের নিয়ে যাবেন।

সংবাদটি পেয়ে আমরা যে কিরকম আনন্দিত হয়েছিলুম তা বোধহয় না বললেও চলবে। উৎসাহের আবেগে রাত্রে আমাদের ভালো ক'রে ঘুমই হল না। খুব ভোরে উঠে স্নান ক'রে চা খেয়ে এলুম। তারপরে আমাদের ছেঁড়া কাপড়ের পুঁটুলিগুলি বেঁধে কুঞ্জবাবুর ঘরে গিয়ে উপস্থিত হলুম। এ-কথা সে-কথার পর কুঞ্জবাবু একখানা কাগজ বের ক'রে আমার হাতে দিয়ে বললেন—দেখ, তোমাদের কতকাতার বাড়ির ঠিকানা আর অভিভাবকের নাম লিখে দিয়ে যাও।

কাগজখানা হাতে নিয়ে ভাবলুম—কি করা যায়! বন্ধুদের সঙ্গে পরামর্শ করবারও উপায় নেই—কুঞ্জবাবু মুখের দিকে চেয়ে আছেন। ওদিকে কাগজ হাতে নিয়ে বসে থাকাও চলে না। যা-তা একটা নাম ও ঠিকানা লিখে দিলুম। আমার দেখাদেখি পরিতোষ ও কালীচরণও যা-তা নাম-ঠিকানা লিখলে।

কুঞ্জবাবু কেন যে আমাদের অভিভাবকদের নাম ও ঠিকানা চেয়েছিলেন আজও সে-রহস্য আমি ভেদ করতে পারিনি। কারণ আমরা যে বাড়ি থেকে পলায়ন ক'রে গিয়েছিলুম, সে-কথা আমরাই তাঁকে বলেছিলুম। এই দুঃখ-কষ্ট না ক'রে ভালো ছেলের মতো বাড়ি ফিরে গেলে সেখানে অন্ন, বস্ত্র ও আশ্রয়ের অভাব আমাদের নেই, সে-কথাও তিনি জানতেন এবং আমাদের এই দৃঢ়তার জন্য প্রশংসাই করতেন ও প্রত্যক্ষভাবেই উৎসাহ দিতেন। হঠাৎ এতদিন পরে বাড়ি ও অভিভাবকদের ঠিকানা চাওয়ায় আমরা আশ্চর্য হয়ে গেলুম। যাই হোক, কিছু পরে মেটাজী এসে পড়লেন এবং তাঁর সঙ্গে ভিক্টোরিয়া টার্মিনাস স্টেশন থেকে কল্যাণ যাত্রা করলুম ; ট্রেন-ভাড়াটা কে দিলে তা বলতে পারি না।

যথাসময়ে কল্যাণে নেমে কিছুক্ষণ হেঁটে সেই জঙ্গলে এসে পৌঁছোনো গেল। সামনের দিকটা অর্থাৎ যে-দিকটা লোকালয়ের দিকে সেদিক থেকে আরম্ভ ক'রে ভেতরের প্রায় আধ-মাইলটাক লম্বা ও আধ-মাইলটাক প্রস্থ জমি পরিষ্কার ক'রে আবাদ করা হচ্ছে। আমরা জঙ্গলে ঢুকে সরু রাস্তা দিয়ে খানিকটা ভেতরের দিকে গিয়ে একখানা পাতা-দিয়ে-ছাওয়া ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালুম। মেটাজী উচ্চৈঃস্বরে কয়েকবার কি-একটা ব'লে চিৎকার করতেই ঘরের ভেতর থেকেই জবাব দিয়ে বেরিয়ে এল একজন বেঁটে-মতো বেশ গুণ্ডা-গোছের লোক, হাঁটুর ওপরে মালকোঁচা-মারা ধুতি পরা, গায়ে একটা ফতুয়া-গোছের হাতকাটা জামা। জামাটার সামনের দিকে একটা বড় তাপ্পি-পকেট। লোকটাকে দেখেই আমাদের 'বাবা কালী' আস্তে আস্তে বললে, এ যে ভুলু সর্দার দেখছি।

লোকটা কাছে এসে একবার আমাদের আপাদমস্তক দেখে, তারপর মেটাজীর সঙ্গে কথা বলতে আরম্ভ করল। মেটাজী ও ভুলু সর্দার আমাদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে অগ্রসর হতে লাগলেন আর আমরা তিনজনে তাঁদের পশ্চাদনুসরণ করতে লাগলুম।

জঙ্গলের মধ্যে কিছুদূর গিয়ে বিরাট একটা ফাঁকা জায়গায় উপস্থিত হলুম। দেখলুম, একদিকে অনেকখানি জায়গা নিয়ে কলার বাগান করা হয়েছে। বেঁটে-বেঁটে কলাগাছ—তাতে কাঁদি-ভর্তি বড় বড় মোটা কলা গাছ থেকে ঝুলে প্রায় মাটিতে ঠেকেছে। আরও খানিকটা এগিয়ে দেখা গেল, সেখানে চিচিঙ্গের ক্ষেত করা হয়েছে—তিন-চার হাত লম্বা হাজার হাজার চিচিঙ্গে উঁচু মাচা থেকে মাটির দিকে ঝুলছে। বড় বড় মানুষের সমান উঁচু ঘাসের জঙ্গল দু'-হাতে

সরিয়ে তার মধ্যে রাস্তা ক'রে মেটাজী ও ভুলু সর্দার আগে চলেছেন—তাঁদের পেছনে আমরা চলেছি। সম্মুখে পিছনে আশেপাশে মোটা মোটা বড় বড় গাছ—সেসব গাছের চেহারাও কখনো দেখিনি, নামও শুনিনি। এইসব গাছে জাহাজের কাছির মতন মোটা ও শক্ত পাকানো-পাকানো লতা ঝুলছে। কোনো কোনো জায়গায় জঙ্গল এত ঘন যে, গাছের মাথায় মাথায় ঠেকাঠেকি হয়ে আছে। কতদিন যে সেখানকার জমিতে সূর্যালোক স্পর্শ করেনি, তার ঠিকানা নেই। জায়গাটা একেবারে স্যাঁতসেঁতে হয়ে আছে। এক জায়গায় দেখলুম, অনেকখানি জমি পরিষ্কার ক'রে লাঙল দিয়ে চষা হয়েছে—প্রায় পঞ্চাশ-ষাটজন স্ত্রী-পুরুষে মিলে সেই জমি থেকে আগাছা ও পাথর ইত্যাদি বেছে এক জায়গায় জড়ো করছে। আমরা আসতেই তারা দাঁড়িয়ে উঠে অবাক হয়ে আমাদের দেখতে লাগল। পুরুষগুলির গায়ে কোনো জামা নেই, কোমরে একখণ্ড বস্ত্র জড়ানো, তাতে কোনোরকমে লজ্জা-নিবারণ হয়েছে মাত্র। মেয়েদের দেহেরও উত্তরার্ধ একরকম নগ্ন বললেই চলে। কোমরে একটু বস্ত্র জড়িয়ে রেখেছে। পুরুষ কিংবা স্ত্রী উভয়েই অত্যন্ত রোগা। পুষ্টিকর খাদ্য তো দূরের কথা, দেখে মনে হয়—কোনো রকমের খাদ্য তাদের পেটে পড়ে কিনা সন্দেহ। সকলেই অদ্ভুত একরকমের দৃষ্টিতে বিশেষ ক'রে আমাদের তিনজনকে দেখতে লাগল।

মেটাজী ও সর্দার আমাদের আগে আগে যাচ্ছিলেন। এইখানে মেটাজী পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে আমাদের বললেন—ওই এদের সঙ্গে তোমাদের কাজ করতে হবে। কাজ এমন হাতী-ঘোড়া কিছুই নয়—একটা বাচ্চা ছেলেকে বললেও সে করতে পারে।

এই অবধি ব'লে আবার তাঁরা কথা বলতে বলতে অগ্রসর হতে লাগলেন। আমাদের সামনে ও পেছনে বিস্তীর্ণ অরণ্য, দক্ষিণে ও বামে ছোট পাহাড়ের সারি। মনে হয় যেন প্রকৃতিদেবী জঙ্গলের দু'দিকে উঁচু পাথরের দেওয়াল গেঁথে রেখেছেন। এক এক জায়গায় জঙ্গল সংকীর্ণ হয়ে গেছে—দু'দিকের পাহাড় অনেক কাছাকাছি হয়েছে। দেখলুম প্রায় সর্বত্রই এই পাহাড়ের গা বয়ে নিরন্তর জল ঝরছে—তারই ফলে পাহাড়ের গায়ে শেওলা জন্মেছে। কিছু-দূর এগিয়ে গিয়ে এক জায়গায় দেখা গেল একখণ্ড প্রকাণ্ড পাথর—তারই ওপর দিয়ে একটা শীর্ণ জলধারা এসে নিচে একটা ডোবার মতন সৃষ্টি হয়েছে। মেটাজী আমাদের বললেন—এই দেখ কেমন সুন্দর ঝরনা। এরা এই জল খায়।

কিছুদিন আগে কুঞ্জবাবু আমাদের কাছে যে ঝরনার কথা বলেছিলেন, বোধ হয় এই সেই ঝরনা। আরও কিছুদূর অগ্রসর হবার পর মনে হল যেন এতক্ষণে আমরা গভীর জঙ্গলের মধ্যে এসে পড়েছি। ছোট-বড় গাছ ও লতায় মাথার ওপর চাঁদোয়ার মতন একটা আচ্ছাদন সৃষ্টি হওয়ায় জায়গাটা অপেক্ষাকৃত অন্ধকার ও নির্জন ব'লে মনে হতে লাগল। এখানকার পথও পরিষ্কার নয়, বেশ বুঝতে পারা গেল যে এদিকে লোকজন বড একটা কেউ আসে না।

এইদিকে খানিকটা এগিয়ে যাবার পর দূরে একটা বাড়ি দেখতে পাওয়া গেল। বাড়িখানা দেখে কালী বললে—এই পাণ্ডববর্জিত স্থানে কোন্ শৌখিন এমন বাড়ি তৈরি করলে!

এমন সময় মেটাজী পেছন ফিরে আমাদের বললেন—ঐ দেখ তোমাদের বাড়ি। এমন জায়গায় এমন সুন্দর বাড়িতে লাটসাহেবও থাকতে পায় না!

একটু এগিয়েই আমরা বাড়ির কাছে এসে উপস্থিত হলুম। আমাদের অজ্ঞাতসারে প্রায় দশ-বারোজন নারী ও পুরুষ শ্রমিক যে আমাদের অনুসরণ করছিল তা আমরা টেরই পাইনি। এইখানে এসে দাঁড়াতেই তারা আরও কাছে এগিয়ে এসে আমাদের ভালো ক'রে দেখতে লাগল। কিন্তু সর্দার রক্তচক্ষু বার ক'রে বিকট চিৎকার ক'রে তাদের ভাষায় কি-সব বলায় সকলেই ধীরে ধীরে ফিরে চলে গেল। সর্দারমহাশয়ের এই বিকট আওয়াজ শুনে তাঁর মেজাজের কিছু পরিচয় পাওয়া গেল। তিনি ভাঙা-ভাঙা হিন্দীতে অর্থাৎ আমরা যাতে বুঝতে পারি—মেটাজীকে বললেন—শুয়ারের বাচ্চারা অত্যন্ত পাজি, শয়তান এবং অসম্ভব রকমের চালাক। আপনার সঙ্গে কথা বলতে বলতে ভুলে ডাণ্ডাটা ফেলে এসেছি—হাতে ডাণ্ডা নেই—বুঝতে পেরেছে যে, এখন আর মারতে পারবে না—অমনি আমাদের পেছু পেছু এসেছে মজা দেখতে! কাজে কোনো-রকমে ফাঁকি দিতে পারলে হয়।

লোকগুলো চলে যাওয়ার পর বাড়িখানা ভালো ক'রে দেখলুম। বেশ বড় পাথরের বাড়ি—অনেকটা গির্জা-ধরনের। মাটি থেকে প্রায় আড়াইতলা উঁচু পাথরের গাঁথুনি ক'রে, সেখানে ঘর বানানো হয়েছে। ঘরের চারিদিকে দরজার মতো বড় বড় জানলা। মেটাজী ও সর্দার কাঠের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেলেন। বলা বাহুল্য, আমরাও তিনজনে তাঁদের পশ্চাদনুসরণ করলুম।

ওপরে গিয়ে দেখলুম প্রকাণ্ড একখানি ঘর—যেমন লম্বা তেমনি চওড়া—ঠিক গির্জাঘরের মতন। ঘরের মেঝে ও দেওয়াল কাঠের। দেওয়ালে চমৎকার

ওয়াল-পেপার মারা। ঘরখানাকে মাঝে পার্টিশন দিয়ে ভাগ করা হয়েছে। ঘরের পাশেই আলাদা ভিতের ওপরে তৈরী ছোট্ট একখানি ঘর। বেশ বুঝতে পারা গেল, একসময়ে এই ঘরে কমোড ইত্যাদি থাকত।

মেটাজী বললেন—এই ঘরে সায়েবদের পায়খানা ছিল, তোমরা এইখানেই রান্নাবান্না কোরো।

মেটাজী আরো বললেন—নিচে একখানা রান্নাঘর আছে বটে, কিন্তু তোমরা এইখানেই ব্যবস্থা কোরো। আজ থেকেই কাজে লেগে যাও—একটা দিনের 'রোজ' কেন আর মারা যায়।

সেই বিরাট ঘরের এক কোণে আমাদের ছেঁড়া ন্যাকড়ার পুঁটলিগুলো রেখে তখুনি তৈরি হয়ে নিলুম। মেটাজী ব'লে দিলেন—দেখ, ভোর ছ'টার সময়ে কাজে লাগতে হবে। বেলা এগারোটায় ছুটি পাবে। ঘণ্টা-দুয়েকের মধ্যে খেয়ে-দেয়ে আবার বেলা একটার সময় গিয়ে কাজে লাগবে আর ছুটি পাবে বিকেল ছ'টায়। দুপুরে ছুটির সময় জল-টল তুলে রাখবে। কারণ বিকেলে ঘরে এসেই সিঁড়ির দরজা ভালো ক'রে বন্ধ ক'রে দেবে। তারপরে আর নিচে নামা চলবে না।

জিজ্ঞাসা করলুম—কেন মশায় ?

তিনি বললেন—এ জায়গাটাতে আবার সন্ধ্যের পর জানোয়ার বেরোয় ব'লে শুনেছি।

কী জানোয়ার বেরোয় সে-কথা জিজ্ঞাসা করায় মেটাজী ধমকে উঠে বললেন —সে-কথায় তোমাদের দরকার কি ? বারণ করলুম, দরজা খুলে রেখো না। বাস্।

কথায় কথায় মেটাজী বললেন—মনে কোরো না যে, তোমরা এসে এখানে থাকবে ব'লে শেঠজী তোমাদের জন্য এই বাড়ি তৈরি ক'রে রেখেছেন।

মেটাজীর মুখে অনেকক্ষণ থেকে এইসব কঁ্যাটকেঁটে কথা শুনতে শুনতে আমার ধৈর্যচ্যুতি হল। ব'লে ফেললুম—তা যে হয়নি তা আমরা জানি। ভাগ্যদোষে আজ আমাদের এই অবস্থার মধ্যে পড়তে হয়েছে ব'লে মেটাজী মনে করবেন না আপনার চাইতে আমাদের বুদ্ধি কিছু কম আছে।

আমার জবাব শুনে মেটাজীর মেজাজ একেবারে জল হয়ে গেল। তিনি ব'লে উঠলেন—না না, রাগ করছ কেন ? আমি ঠাট্টা করেছি।

মেটাজী বলতে লাগলেন—এইখানে তিনজন ক্রীশ্চান পাদরী থাকতেন।

ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, বেলজিয়াম বা আমেরিকা—এইরকম কোনো একটা জায়গায় ছিল তাঁদের বাড়ি। ঠিক কোন্ জায়গায় তাঁদের বাড়ি তা তিনি জানেন না, তবে তাঁরা ছিলেন একেবারে গোরা।

জিজ্ঞাসা করলুম—তাঁরা এখানে কী করতেন?

—তাঁরা এসেছিলেন এখানকার আদিবাসীদের মধ্যে আলোক-বিকিরণ করতে। কিন্তু কয়েক বছর যেতে-না-যেতে পালাতে পথ পেলেন না—ব'লেই মেটাজী উচ্চহাস্য করলেন।

কিন্তু মেটাজীর কথাটা শুনে আমরা বিশেষ উৎসাহ বোধ করলুম না। জানোয়ারের কথা শুনে মনটা আগেই দমে ছিল—তার ওপর ক্রীশ্চান পাদরীদের পলায়নের কথা শুনে আরও দমে গেলুম। ভাবলুম, ক্রীশ্চান পাদরী—যাঁরা আফ্রিকার সিংহসঙ্কুল গভীর অরণ্যে নরখাদক অর্ধমনুষ্যদের মধ্যে সারাজীবন কাটিয়ে দিতে ভয় পান না, তাঁরা কিসের ভয়ে এখান থেকে পালিয়ে চলে গেলেন! আর আমরাই বা এমন কি তালেবর লোক যে, সে-স্থানে আমাদের নিয়ে এসে রাখা হচ্ছে।

ব্যাপার বিশেষ সুবিধের নয় মনে ক'রে মেটাজীকে জিজ্ঞাসাই ক'রে ফেলা গেল—হ্যাঁ মশাই, ক্রীশ্চান পাদরীরা এখান থেকে ভেগে গেলেন কিসের ভয়ে?

মেটাজী সে-কথার কোনো উত্তর না দিয়ে বললেন—যেতে দাও। অনেকক্ষণ গল্প হয়েছে—এবার কাজে চল। তোমাদের খাওয়া-দাওয়ার কোনো ব্যবস্থা করেছ?

বললুম—কী বন্দোবস্ত হবে! আমরা তো এই এলুম। তা ছাড়া আমাদের ট্যাঁকে তো কানাকড়িও নেই। রসদ কিনতে হলে পয়সা চাই তো।

আমাদের কথা শুনে মেটাজী সর্দারের সঙ্গে একটু পরামর্শ ক'রে বললেন—আচ্ছা, আজকের দিনটা কোনোরকমে চালিয়ে যাও। কাল বিকেলে তোমাদের দু'দিনের 'রোজ' দেওয়া হবে—তাই দিয়ে বাজার থেকে জিনিসপত্র কিনে এনো। চল, এখন কাজে লেগে যাও।

ঘর থেকে নেমে আমরা চললুম আবার যেখানে কাজ হচ্ছে। চলতে চলতে আমরা মেটাজীকে বললুম—সর্দারকে বলুন আমাদের একটা ঝাঁটা ও একটা জলপাত্র দিতে। জল না খেয়ে থাকব কি ক'রে?

মেটাজী সর্দারের সঙ্গে কথা ব'লে আমাদের বললেন—কাজ শেষ ক'রে বাড়ি ফেরবার সময় সর্দারের বাড়িতে গিয়ে চাইলে উনি ঝাঁটা দেবেন।

মেটাজী ও সর্দারের পেছনে পেছনে চলতে লাগলুম। এক জায়গায় এসে তাঁরা দাঁড়াতেই আমরাও দাঁড়ালুম। সেখানে দেখলুম পথের দু'ধারে বড় বড় মানুষ-সমান ঘাস হয়ে রয়েছে। সর্দার বললেন—এই যে বড় বড় ঘাস দেখছ—এর নিচে করোগেটেড আয়রনের মতন জমিতে আলুর ক্ষেত আছে।

মেটাজী আবার ব'লে দিলেন—রাঙা আলুর ক্ষেত—লতানে গাছ চেনো তো? দেখো যেন ঘাস তুলতে আসল গাছ তুলে ফেলো না।

মেটাজী যাবার সময় বললেন—বেশ মন দিয়ে কাজকর্ম করবে। আমি সর্দারকে ব'লে গেলুম, সে কাল তোমাদের 'রোজ' দেবে, তাই দিয়ে বাজার ক'রে এনো।

মেটাজী বিদায় নিলেন আর আমরা 'জয় দুর্গা' ব'লে মনের আনন্দে আলুর ক্ষেতে ঘাস তুলতে লেগে গেলুম। আমাদের আশেপাশে যেসব নরনারী মজুরের কাজ করছিল তারা কিছুক্ষণ এই জামা-পরা মজুরদের দিকে অবাক হ'য়ে দেখে নিজেদের মধ্যে কিছুক্ষণ বোধ হয় আমাদের সম্বন্ধে কথাবার্তা ব'লে আবার যে যার কাজে লেগে গেল।

বোধ হয় ঘণ্টাখানেক কাজ করবার পর একবার ঘাসের জঙ্গল থেকে উঠে দেখি, চারিদিক একেবারে ফাঁকা—মজুররা সব চলে গিয়েছে। এগারোটা বেজে গিয়েছে তা তারা যে কি ক'রে জানতে পারলে তা বুঝতে পারলুম না। লোক-জন কোথাও কেউ নেই দেখে আমরাও বুঝলুম যে, সকালবেলাকার কাজ শেষ হয়েছে। আমাদের খাওয়া-দাওয়া ও রান্নাবান্নার হাঙ্গামা নেই। ঝাঁটা ও জলপাত্রের জন্য সর্দারের কুটীরে গিয়ে হানা দেওয়া গেল। দেখলুম, সে সেখানে সপরিবারে বাস করে। আমাদের দেখে সে বাড়ির ভেতরে গিয়ে যে জিনিসটি এনে দিলে তাকে ঝাঁটা তো দূরের কথা, খ্যাংরা বললেও ইজ্জত দেওয়া হয়। ঝাঁটা ও জলপাত্র দুই-ই সে আগে থেকে ঠিক ক'রে রেখেছিল।

সে ঝাঁটা ও জলপাত্রের কথা মনে পড়লে আজও হাসি পায়। হাতখানেক লম্বা গুটি চার-পাঁচ ঝাঁটার কাঠি একটু সরু সুতো দিয়ে বাঁধা আর একটা ভাঙা মাটির পাত্র। সেটা আস্ত অবস্থায় হাঁড়ি ছিল কি কলসী ছিল তা স্থির করবার জন্য প্রত্নতাত্ত্বিকের প্রয়োজন হয়। তবে বেশ বোঝা গেল যে বর্তমানে সেটাতে সংসারের আবর্জনা ফেলা হত—সদ্য আঁস্তাকুড় থেকে তুলে এনে দিয়ে সর্দার আমাদের জানালে যে আমার ঘরের জিনিসপত্র কুলীদের দিলে আমার নিজের কাজ চলবে কি ক'রে। যা হোক, তোমরা মেটাজীর লোক, তোমাদের কথা

আলাদা। কাল যখন বাজারে যাবে, একটা ঝাঁটা ও জলপাত্র কিনে এনে আমার এই জিনিসগুলি ফিরিয়ে দিও।

যে আজ্ঞে।—এই কথা ব'লে তখনকার মতো সর্দারের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে এসে সেই ঝাঁটা দিয়ে কোনোরকমে সেই বিরাট ঘরের খানিকটা পরিষ্কার ক'রে গেলুম সেই ঝরনায়। সেখানে সর্দার-প্রদত্ত সেই পাত্রটি পরিষ্কার ক'রে জল নিয়ে স্নান ক'রে ঘরে এসে বসতে-না-বসতে লোকজনের চেঁচামেচি শুনতে পাওয়া গেল। কাজে যাবার সময় হয়েছে মনে ক'রে বেরিয়ে এসে দেখি সত্যিই মজুরেরা আসতে আরম্ভ করেছে। তাদের দেখে আমরাও গিয়ে আবার ঘাস ছিঁড়তে আরম্ভ ক'রে দিলুম। ইতিমধ্যে দু'-তিনটি মজুর ও মজুরানী আমাদের কাছে এসে কি-সব জিজ্ঞাসা করলে—তাদের ভাষা শুনে মনে হল মারাঠা-ভাষারই অপভ্রংশ। দুই-চারটে শব্দ যেন চেনা-চেনা মনে হতে লাগল। সেই শব্দগুলির সূত্র ধরে আমরা হিন্দীভাষায় জবাব দিতে লাগলুম। তারা কি বুঝলে জানি না, তবে দু'-একজন খুব বিজ্ঞের মতন মাথা নাড়তে লাগল। কিন্তু তাদের সঙ্গে ভাব বেশ জমবার আগেই সর্দারের সাড়া পেয়ে যে যার কাজে লেগে গেলুম।

আমরা যে-জায়গাটিতে ঘাস ছিঁড়ছিলুম সেখানে আরও গুটি দুই-তিন পুরুষ ও নারী কাজ করছিল। তারা আমাদের অনভ্যস্ত হাতের কাজ দেখে মাঝে মাঝে কি-সব বলাবলি ও হাসাহাসি করতে লাগল। দুনিয়ায় ঘাস-ছেঁড়ারও ভালোমন্দ আছে।

ভালোই হোক আর মন্দই হোক, কোনোরকমে বিকেল ছ'টা অবধি কাজ করবার পর সেদিনকার মতো কাজ শেষ হল। আমরা তো একরকম ছুটতে ছুটতে এসে সেই ভাঙা পাত্রে জল তুলে হাত-মুখ ধুয়ে নিজেদের বাসস্থানে এসে ঢুকলুম।

প্রকাণ্ড দরজা বন্ধ করতে গিয়ে দেখি যে, সেটি বন্ধ করবার অসংখ্য হুড়কো, খিল ও ছিটকিনির ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেই পুরোনো ও অনেকদিন অব্যবহারে প্রায় অকর্মণ্য হুড়কো প্রভৃতি যথাস্থানে সংযোজন করতে আমাদের তিনজনের প্রায় দম-বন্ধ হবার অবস্থা। কোনোরকমে সেগুলি লাগিয়ে আমরা পূর্বদিকের একটি প্রকাণ্ড জানলা খুলে দিয়ে দাঁড়ালুম।

তখনও সূর্য একেবারে অস্ত যায়নি। অস্তগামী তপনের নিবন্ত আলো এসে পড়েছে গাছের চূড়ায়। আমাদের সম্মুখে দক্ষিণে বামে—যতদূর দৃষ্টি যায়

সুদূরপ্রসারী বনশ্রেণী। গাছের পর গাছ—উঁচু নিচু সরু মোটা—সবলে ধরিত্রী-মাতাকে আঁকড়ে ধরে দাঁড়িয়ে আছে। দূর—দূর—আরো দূরে পাহাড়ের সারি স্পষ্ট থেকে অস্পষ্ট হতে হতে মেঘলোকে মিলিয়ে সত্য ও কল্পনায় জড়াজড়ি হয়ে গিয়েছে। তারই মধ্যে শত-লক্ষ বিহঙ্গমের কাকলীতে মর্ত্য ও অন্তরীক্ষ পরিপূর্ণ। আমাদের চোখে সেই দৃশ্য ফুটে উঠছে—কানের মধ্যে সেই বিরাট শব্দ এসে পৌছচ্ছে বটে, কিন্তু মন শূন্য—চিত্তে এসবের প্রতিক্রিয়া কিছুই হচ্ছে না। দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ অনুভব করলুম কখন পাখীদের কলরব থেমে গিয়েছে, বনভূমি অন্ধকারে আচ্ছন্ন।

অরণ্যমাতার কোলে আমাদের প্রথম সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। তাড়াতাড়ি জানলা বন্ধ ক'রে দিয়ে সেখান থেকে সরে এলুম। মোমবাতি অনেকদিন আগে থেকেই কেনা ছিল, তাই জ্বালিয়ে নিজের নিজের ধুতি পেতে বিছানা করলুম। আমাদের কারো মুখে কোনো কথা নেই—সকলেরই মন ভারী। মনের কোন্ গহনে বিরাট বেদনা ও অভিযোগ জমা হচ্ছিল। কিসের বেদনা ও কার ওপরে অভিযোগ—তার স্পষ্ট ধারণা নেই। মন যেমন ভারী সেই অনুপাতে উদর তেমনি হালকা। তার ওপরে সারাদিনের সেই পরিশ্রমে দেহ ক্লান্ত। শুয়ে শুয়ে এই তিনের ভারসাম্য করতে করতে ঘুমিয়ে পড়লুম।

* * *

ভোর হতে তখনও অনেক দেরি কিন্তু পাখীদের বিপুল চিৎকারে ঘুম ভেঙে গেল। ঘুম ভাঙল বটে, কিন্তু শরীর এত দুর্বল যে, পাশ ফিরতে পারি না। আরও কিছুক্ষণ শুয়ে থেকে বন্ধুদের ডেকে তুলে মুখ ধুয়ে একটু বসতে-না-বসতে ভোর হয়ে গেল।

আমাদের পরিতোষ একটু ছিমছাম-গোছের লোক ছিল। ধুতি-জামা ছেঁড়া হলেও ওরই মধ্যে সুবিধা পেলেই সে সাবান দিয়ে কেচে পরিষ্কার ক'রে নিত। যতদূর সম্ভব ছেঁড়া জায়গাটুকু ঢেকে সে গুছিয়ে ধুতি পরত। একটি আয়না ও চিরুনি সর্বদা সে কাছে রেখে দিত। স্নান করবার সুবিধে না হলেও সে রুক্ষ চুল চিরুনি দিয়ে আঁচড়ে রাখত। সেদিন দুপুরবেলা স্নান ক'রে পরিতোষ যখন চুল আঁচড়াচ্ছিল সেই সময় তার আরশিখানা নিয়ে নিজের চেহারা দেখে চমকে উঠলুম। দেখলুম ডান দিকের কানের ওপরে অনেকখানি জায়গা একেবারে সাদা হয়ে গিয়েছে। প্রথম যাত্রার ফলে আমার দাঁতগুলো নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, এবারের যাত্রায় চুলে পাক ধরল। অর্থাৎ স্থবির মহাস্থবিরে

উন্নীত হল, তখনও আমার সতেরো বৎসর পূর্ণ হয়নি। কিন্তু যেতে দাও সে-কথা—

সেদিন বেলা তখন প্রায় দু'টো হবে, আমরা খিদের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে একরকম কাঁপতে কাঁপতে সর্দারের কাছে গিয়ে বললুম—হয় আমাদের কিছু খেতে দিন আর না-হয় পয়সা ও ছুটি দিন—আমরা বাজারে গিয়ে কিছু খেয়ে আসি।

সর্দার তখন ঘুমোচ্ছিল। আমাদের চেঁচামেচি শুনে সুখশয্যা ছেড়ে এসে খিদের কথা শুনে প্রথমে তো মহা তম্বি শুরু ক'রে দিলে। শেষকালে একটা লোক ডেকে, তাকে ইকড়ি-মিকড়ি ক'রে কি-সব বললে বুঝতে পারলুম না। শেষকালে আমাদের বললে—এই লোকের সঙ্গে বাজারে গিয়ে জিনিসপত্র কিনে নিয়ে এসো।

আমরা বললুম—পয়সাকড়ি দাও।

সর্দার একবার 'ও' ব'লে, ন'গণ্ডা পয়সা একবার দু'বার তিনবার গুনে আমার হাতে দিলে। আমিও বার-তিনেক পয়সাগুলো গুনে জিজ্ঞাসা করলুম—ন'-আনা কি হিসাবে দিচ্ছেন?

সর্দার বললে—তোমাদের রোজ ছ'পয়সা ক'রে মজুরি। দু'দিনের মজুরি তিন আনা, তিনজনের ন'-আনা।

পয়সা হাতে নিয়ে তো একেবারে হক্‌চকিয়ে গেলুম।

অ্যাঁ! এই ফরেস্ট-ডিপার্টমেণ্টে কাজ ক'রে দৈনিক মাত্র ছ'পয়সা! এতে সবাই খাবই বা কি? আর পরবোই বা কি?

কিন্তু ক্ষুধার তাড়নায় তখন আর পরবার কথা চিন্তা করবার অবসর নেই। তখুনি সেই লোকটিকে সঙ্গে নিয়ে ছুটলুম বাজারের দিকে। পথ চলেছি তো চলেইছি। কিন্তু কোথায় বাজার! সঙ্গের লোকটিকে যত প্রশ্ন করি সে কিছুই জবাব দেয় না। অনেক সাধাসাধি করবার পর হয়তো বা যদি কিছু বলে কিন্তু সে-ভাষা কিছুতেই বুঝতে পারি না। শেষকালে প্রায় ঘণ্টা-দেড়েক পথ চলে একটা জায়গায় এসে পৌঁছলুম—শোনা গেল, সেটা নাকি বাজার।

বাজার বললে বটে, কিন্তু দোকানপত্র কোথায়! দু'-একখানা পাতা-ছাউনি ঘর—তারও দরজা অর্থাৎ ঝাঁপ বন্ধ। একটা এইরকম ঘরের সামনে নিয়ে গিয়ে লোকটা আমাদের বললে—এই একটা দোকান।

প্রায় মিনিট পাঁচেক ধরে চেঁচামেচি করার পর দোকানদার দরজা খুলতে

আমাদের গাইড তাকে কি বললে। দেখা গেল, খরিদ্দারের শুভাগমনে লোকটি বেশ উৎফুল্ল হয়ে উঠল। তাকে জিজ্ঞাসা করলুম—ভালো চাল আছে?

সে অবাক হয়ে আমাদের দিকে চেয়ে রইল। বেশ বোঝা গেল যে 'চাল' শব্দটি তার কর্ণকুহরে ইতিপূর্বে প্রবেশ করেনি। আমরা খাদ্য, অন্ন, তণ্ডুল, ধান্য ইত্যাদি নানা শব্দ দিয়ে তাকে বোঝাবার চেষ্টা করতে লাগলুম। ইতিমধ্যে পিলপিল ক'রে চারিদিক থেকে লোক এসে আমাদের ঘিরে দাঁড়াতে আরম্ভ করলে। আমাদের কথা শুনে তারাও নিজেদের বিদ্যে অনুসারে দোকানদারকে বোঝাতে চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে, সে কিছুতেই বুঝতে পারলে না। শেষকালে চলে যাচ্ছি দেখে সে ঘরের ভেতর থেকে একটা পুঁটলি নিয়ে এসে সেটা আমাদের খুলে দেখাল। দেখলুম তার মধ্যে ধুলোর মতন কালো খানিকটা কী জিনিস পড়ে রয়েছে, তাতে আবার পোকা ধরেছে।

সেটি কী দ্রব্য জিজ্ঞাসা করায় দোকানদার ও আমাদের চারপাশের যত নরনারী দাঁড়িয়ে ছিল সবাই মিলে চিৎকার ক'রে সে-দ্রব্যটির গুণাগুণ বোঝাবার চেষ্টা করতে লাগল। অনেক ধস্তাধস্তির পর বোঝা গেল যে, সে-বস্তুটি বাজরার আটা—খুবই রুচিকর ও পুষ্টিকর খাদ্য। চাল যখন পাওয়া গেল না তখন আপাতত বাজরার আটাই দিতে বললুম এক সের। দোকানদার আবার বাড়ির ভেতর থেকে একটুকরো পাথর নিয়ে এসে বাটখারার বদলে তাই দিয়ে সেই ধুলোরূপী পুষ্টিকর ও রুচিকর গুঁড়ো ওজন ক'রে দিলে। সেখান থেকে একপয়সার নুন কিনে বেরোলুম অন্য দোকানের সন্ধানে। পেছনের সেই ভিড়ও চলল আমাদের সঙ্গে।

অনেক বলা-কওয়া ও জিজ্ঞাসাবাদের পর তারা এক কুমোর-বাড়িতে নিয়ে গিয়ে উপস্থিত করলে। দেখলুম, সেখানে নানারকম মাটির তৈরী জিনিস রয়েছে, কিন্তু হাঁড়ি নেই। অনেক চেষ্টা ক'রেও হাঁড়ি কী দ্রব্য তা বোঝাতে না পেরে শেষকালে আধা-কলসী ও আধা-হাঁড়ি গোছের একটা জিনিস কিনে প্রায় ছুটতে-ছুটতে স্টেশনে এসে মুড়ি-ছোলাভাজা ইত্যাদি যা পাওয়া গেল একরকম পেট ভরে খেয়ে নিয়ে দৌড়লুম নিজের ডেরার দিকে।

—

জঙ্গলে গিয়ে যখন পৌঁছলুম তখন সন্ধ্যে হয়ে এলেও একটু আলো ছিল। ওরি মধ্যে একরাশ শুকনো কাঠি যোগাড় ক'রে, নতুন পাত্রে জল ভরে, ঘরে উঠে দরজা বন্ধ ক'রে দিলুম। বাড়ি থেকে ফিরে আসবার মুখে সন্ধ্যার

আবছায়ায় কালীচরণ একটা চিচিঙ্গে ছিঁড়ে এনেছিল। সে বললে—এই রুটি খাওয়ার অভ্যেস তো কখনো নেই, এই চিচিঙ্গের কালিয়া দিয়ে রুটি মারা যাবে।

প্রায় তিনদিন একরকম নির্জলা উপবাসের পর এই মহাভোজের আয়োজন দেখে মনটা খুশীই হয়ে উঠল। যাই হোক, তিনজনে মহা-উৎসাহে আমাদের রান্নাঘর অর্থাৎ পাদরীদের ভূতপূর্ব পায়খানা-ঘরে তো ঢোকা গেল। তখনো ঘরের মেঝেতে ছু'টো-তিনটে কমোডের দাগ ঝকমক করছিল, কিন্তু জীবনে উন্নতি করতে গেলে ওসব ছোটখাটো দাগকে গ্রাহ্যের মধ্যে আনলে চলবে না।

হাত-পা মোছা ও সর্দার-প্রদত্ত সেই তিন-গাছা ঝাঁটার কাঠি দিয়ে ঘরের মেঝে যতখানি পরিষ্কার করা সম্ভব তা ক'রে রান্নার জন্য প্রস্তুত হলুম। উনুনের জন্য তিনখানা পাথর আগেই সংগ্রহ ক'রে রাখা হয়েছিল। ঠিক হল আধখানা চিচিঙ্গে এখন রাঁধা হবে আর আধখানা ভবিষ্যতের জন্য রেখে দেওয়া হবে। কিন্তু আধখানা চিচিঙ্গে ছুরি দিয়ে কুচিয়ে মনে হল রান্না হবে কিসে! পাত্র কোথায়? রাঁধবার একটা পাত্র কিনে আনা হয়নি ব'লে আপসোস হতে লাগল। শেষকালে সর্দারের দেওয়া হাঁড়ির অংশ—যা এই ছু'দিন আমাদের জলপাত্রের অভাব দূর করেছে, তাইতে জল দিয়ে আগুনে চাপিয়ে দেওয়া গেল। জল একটু সোঁ-সোঁ করতেই কুঁচোনো চিচিঙ্গে তাতে ছেড়ে দিয়ে নুন দিয়ে আমরা আটা মাখবার বন্দোবস্ত করতে লাগলুম।

মাটিতে কোঁচার খুঁট পেতে তাতে সেই ধুলোরূপী বাজরার গুঁড়ো ঢেলে একটু একটু ক'রে জল দিয়ে মাখবার চেষ্টা করতে লাগলুম। মধ্যে মধ্যে উনুনে কাঠি দেওয়াও চলতে লাগল। ছোট ছোট লেচি ক'রে থাবড়ে-থুবড়ে রুটি গড়বার চেষ্টা করছি—উনুন থেকে সোঁসোঁ-চোঁচোঁ শব্দ আসছে—মধ্যে মধ্যে কাঠি দিয়ে এক-আধটুকরো তরকারি নামিয়ে দেখা হচ্ছে—সেদ্ধ হয়েছে কিনা। কখনো-বা পরামর্শ করছি যে রুটিগুলো সেঁকা হবে কি করে!—ঠিক হল যে জলপাত্র ঢাকা দেবার জন্য খুরির মতো যে-পাত্রটা আনা হয়েছে আজকের মতন সেটাতে তরকারি রেখে, যে হাঁড়িভাঙায় তরকারি রান্না হচ্ছে সেইটেতেই কোনোরকমে রুটিগুলো সেঁকে নেওয়া যাবে—এইরকম নানা কথা চলেছে—এমন সময় টাঁই ক'রে এক বিরাট আওয়াজে চমকে উঠলুম। পরমুহূর্তেই অর্থাৎ চমক ভাঙবার আগেই একটি বজ্রনির্ঘোষ এবং তারপরেই অগ্নিবৃষ্টি—মুহূর্তের মধ্যে আমাদের মুখ হাত পিঠ গরম চিচিঙ্গে-চূর্ণে চড়চড়িয়ে উঠল।

—বাপ্‌রে—ব'লে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এসে চিচিঙ্গের টুকরোগুলো গা

থেকে ঝেড়ে ফেলে দিলুম। তারপর ঘরের মধ্যে ঢুকে দেখি—মেঝেতে তরকারির টুকরোগুলো প'ড়ে রয়েছে। সেই ভাঙা হাঁড়ির কানা—আবর্জনা বহন ক'রে যার শেষজীবন কাটছিল—অতিরিক্ত চাপ সহ্য করতে না পেরে সে দেহরক্ষা করেছে।

ভাবতে লাগলুম—হাঁড়ি-ভাঙা তো দেহরক্ষা করলে কিন্তু আমাদের এখন দেহরক্ষার উপায় কি! তখন সেই নিবন্ত আগুনে ময়দার ঢেলাগুলো পুড়িয়ে নিয়ে আর আধখানা চিচিঙ্গে যে ছিল তাই দিয়ে দু'দিন নিরম্বু উপবাসের পর পরমানন্দে পারণে প্রবৃত্ত হলুম।

প্রসঙ্গক্রমে ব'লে রাখি যে সে-যুগে কলকাতার বাঙালী হিন্দুরা এমন সর্বভুক্ জাতিতে পরিণত হয়নি। চিচিঙ্গে জিনিসটা অনেক হিন্দুর বাড়িতে ঢুকতেই পেত না। অনেকের বাড়িতে সভয়ে ঢুকত—কেন তার কারণ বলতে পারি না।

যাই হোক, সে-রাত্রে রান্না করার চেষ্টা ক'রে আমরা বুঝতে পারলুম যে নিজে রান্না ক'রে খেয়ে এখানে কাজ করা চলবে না।

সকালবেলা সর্দার আমাদের কাজের তদন্ত করতে এলে তাকে কাল রাত্রের অভিজ্ঞতা বর্ণনা ক'রে বললুম—রোজ রান্না ক'রে খাওয়া আমাদের দ্বারা সম্ভব হবে না। আমরা ঠিক করেছি—সকালে কিছু খাব না, রোজ বিকেলে স্টেশনে গিয়ে খেয়ে আসব। আমাদের বেলা চারটের সময় ছুটি দিতে হবে আর সেই সময় রোজের মজুরি চুকিয়ে দিতে হবে।

সর্দার অনেক ভেবেচিন্তে বললে—আচ্ছা তাই হবে, কিন্তু সকালবেলা কিছু না খেয়ে কাজ করবে কি ক'রে?

বললুম—ছ'পয়সা মজুরিতে একবেলাই পেট ভরে খাওয়া হয় না, তো দু'বেলা!

সর্দার চটে বললে—এত লোক ওই মজুরিতে দু'বেলা পেট ভরে খাচ্ছে—আর তোমরা কি নবাব এসেছ যে ওতে দু'বেলা খাওয়া হয় না? তোমাদের সেধে কেউ এখানে আনেনি! ওতে পোষায় তো কাজ কর—নইলে সোজা রাস্তা পড়ে রয়েছে—সরে পড়।

সেদিন বেলা চারটের সময় সর্দারের কাছ থেকে পয়সা নিয়ে ইস্টিশনে গিয়ে সেই তল্লাটে খুঁজে খুঁজে রুটি-গোস্ত-এর দোকানে বসে আহার করা গেল। তিনজনে মিলে সেখানে দু'-আনার খেয়ে পরদিন দুপুরবেলায় খাবার জন্য এক

আনার রুটি কিনে নিয়ে ফিরে এলুম। আমাদের থাকবার জায়গায় এসে তখনো অনেকখানি বেলা রয়েছে দেখে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে দেখে বেড়াতে লাগলুম।

সেখানকার একটা দৃশ্য আজও মনের মধ্যে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। এক জায়গায় দেখা গেল—একটা বিরাট গাছকে বেড়ে একটা লতা ওপরে উঠে নিজের ডালপালা দিয়ে গাছটার ডালপালাকে একেবারে ঢেকে দিয়েছে, আর সেই লতায় ফুটেছে ছোট ছোট সাদা ফুল। এত ফুল যে, গাছ আর লতা সে-ফুলে একেবারে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। ওপর থেকে সেই ফুল ঝরে-ঝরে গাছটার চারিদিকের মাটিতে যেন ফুলের বিছানা পাতা হয়েছে। আর সেই ফুলের সৌরভে বন আকুল হয়ে উঠেছে। আমরা কাছে যাওয়ামাত্র মৌমাছির দল ভোঁ-ও-ও ক'রে আপত্তি জানাতেই পেছু ফিরে পালিয়ে একটু দূরে গিয়ে দাঁড়ালুম। তারপর সেই ফুল-সৌরভে মন-প্রাণ-দেহ ভরে নিয়ে নেশায় টলতে টলতে ডেরায় ফিরে এলুম।

ফুলের গন্ধে নেশা লেগেই হোক কিংবা কয়েকদিন অনশন ও অর্ধাশনের পরে শত শরতের পুরাতন বলদের মাংস পেটে পড়েই হোক—ঘরে এসে দোর-জানলা দিয়ে বসতে-না-বসতেই আমাদের কালীচরণের কিরকম ভাবদশা লেগে গেল। সে শুরু ক'রে দিলে—কি ছার আর কেন মায়া—কাঞ্চনকায়া তো রবে না।

অনেককাল আগে তাদের পাড়ায় একবার বিল্বমঙ্গল না ওই নামে কি-একটা নাটকের অভিনয় হয়েছিল। কালী একটার পর একটা সেই নাটকের গান গাইতে লাগল। সেদিন অনেক রাত্রি অর্থাৎ সন্ধ্যে থেকে প্রায় ছ'ঘণ্টা গল্প ক'রে আমরা শুয়ে পড়লুম।

ঘুমের মধ্যে বিরাট একটা শব্দ কানে যেতে ধড়মড়িয়ে উঠে পড়লুম। আচমকা ওইরকম আওয়াজে আমি যেন জ্ঞানহারা হয়ে গেলুম। আমার পাশেই যে বন্ধুরা শুয়ে আছে সে-কথা স্রেফ ভুলে গিয়ে ভয়ে দিলুম দৌড়, কিন্তু আছড়ে পড়ে মাথা ও মুখে বিষম আঘাত লেগে সম্বিৎ ফিরে পেলুম। ততক্ষণ কালী ও পরিতোষ উঠে মোমবাতি জ্বালিয়ে ফেললে।

সেই স্বল্পালোকেই দেখতে পেলুম ভয়ে তাদের মুখ শুকিয়ে গিয়েছে আর হাত কাঁপছে একটু একটু ক'রে। আওয়াজ তখনো সমানভাবে চলেছে। মনে হতে লাগল—হাজার হাজার রাজহাঁস যেন একটা গলা দিয়ে চিৎকার ক'রে চলেছে।

পরিতোষ ও কালী আমাকে সেইরকম দেওয়ালের কাছে দেখে মনে করেছিল

আমার সঙ্গে সেই আওয়াজের কোনো প্রত্যক্ষ যোগ স্থাপিত হয়েছে। কিন্তু যখন তাদের বুঝিয়ে দিলুম যে আওয়াজ শুনে ভয় পেয়ে ঘুমের ঘোরে আমি ওই-রকম ভাবে ছুটে গিয়েছিলুম তখন তারা কথঞ্চিৎ শান্ত হল।

কিন্তু শান্ত হবার জো কি! ওদের আওয়াজের প্রচণ্ডতা ক্রমেই বাড়তে লাগল। ঘরের পূর্বদিকে চারটে দরজায় বড় বড় সমান আকারের জানলা ছিল। মনে হতে লাগল যেন পালা ক'রে এক-একবার এক-একটা জানলার কাছে আওয়াজ হচ্ছে আর তারই ধমকে জানলাগুলো থরথর ক'রে কাঁপছে।

আমরা আস্তে আস্তে ভূমিশয্যা ত্যাগ ক'রে পা টিপে টিপে ঘরের দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম। কেন যে সেখানে গিয়ে দাঁড়ালুম তা ঠিক জানি না। দরজার কাছে যেতেই জানলার দিকের আওয়াজ কমে গেল। বেশ মনে হতে লাগল আওয়াজটা যেন দূরে সরে যাচ্ছে। একটুখানি প্রাণে ভরসাও এল। কিন্তু তখুনি আমাদের ভ্রম ছুটে গেল। বুঝতে পারলুম যে আওয়াজটা জানলা ছেড়ে দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। পরিতোষ অনেক গবেষণা ক'রে বললে—এ মনে হচ্ছে হাঁসভূত।

অতি দুঃখেও হাসি পেল। হংসদূতের কথা শোনা আছে, কিন্তু হংসভূতের কথা তো কখনো শুনিনি বাবা! ওদিকে হংসভূতের গর্জনের ঠেলায় মনে হতে লাগল ঘরের মধ্যে যমদূত এসে উপস্থিত হয়েছেন। ভয়ে আমাদের দেহে কালঘাম ছুটতে আরম্ভ করলে। সন্ধ্যাবেলার রুটি-গোস্ত ও কালরাত্রের কাঁচা চিচিঙ্গে ও কাঁচা ময়দার ঠুলি জল হয়ে দেহ বেঁয়ে ঝরতে লাগল।

কতক্ষণ ধরে এই দুর্ভোগ আমাদের ভোগ করতে হয়েছিল তা ঠিক বলতে পারি না। আমাদের তো মনে হয়েছিল—এই গর্জন শুনতে-শুনতেই জীবন অবসান হবে।

হংসভূতের গর্জন থেমে যাওয়ার পর বুকের ধড়ফড়ানি থামতে থামতে রাত্রিভোর হয়ে গেল।

সকালবেলা কাজে লাগবার খানিক পরে সর্দার যখন রোঁদে এল তখন তাকে কালরাত্রের অভিজ্ঞতার কথা বললুম। সর্দারের সঙ্গে কথাবার্তা বলছি এমন সময় দেখলুম আমাদের চারপাশে অনেকগুলি মজুর এসে দাঁড়িয়েছে। দেখলুম, আমাদের কথা শুনে তাদের মধ্যে জস্তুর মতো চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়েছে। আস্তে কথা বলার রীতি তাদের মধ্যে নেই—তারা নিজেদের ভাষায় সশব্দে কি-সব আলোচনা আরম্ভ ক'রে দিলে। সর্দার একটা বিরাট ধমক ও তাড়া দেওয়ায়

তারা যে যার কাজের দিকে চলে গেল। সর্দার আমাদের একটু দূরে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললে—এসব কথা তোমরা ওদের বলেছ নাকি?

—না তো।

সর্দার বললে—খবরদার! ওদের কিছু বোলো না, তা হ'লে ওরা সব কাজে আসা বন্ধ ক'রে দেবে।

আমরা জিজ্ঞাসা করলুম—ওটা কি জানোয়ার?

সর্দার তার হাঁড়ি-মুখে হাসি আনবার চেষ্টা ক'রে বললে—ও জানোয়ার না, ও হচ্ছে দেও। জঙ্গলে কত রকমের জিনিস আছে তার ঠিক-ঠিকানা নেই।

মনে মনে বললুম—একরকম জিনিসেই যা অবস্থা হয়েছে—

সর্দার বললে—তোমরা কিছুতেই দরজা কিংবা জানলা খুলো না—তা হ'লে বিপদে পড়বে ব'লে দিচ্ছি।

সর্দার রোঁদ দিয়ে বাড়ি ফিরে যেতেই চারিদিকে মজুরের দল—যুবক-যুবতী বৃদ্ধ-বৃদ্ধা এসে আমাদের নানারকম প্রশ্ন করতে আরম্ভ ক'রে দিলে। এ কয়েক-দিন তাদের কথা শুনে শুনে সে-ভাষা বলতে না পারলেও কিছু কিছু বুঝতে আরম্ভ করেছিলুম। আমাদের রাত্রের অভিজ্ঞতা শুনে তারা যা বললে—তার তাৎপর্য হচ্ছে—এ জঙ্গলে অনেকদিন থেকেই দেবতারা বাস করছেন। এ জায়গাটা পরিষ্কার করার ফলে তাঁরা এখন সদলে বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে ভেতরের দিকে চলে গেছেন। মাঝে মাঝে ওই বাড়িটাতে এসে কেউ কেউ হানা দিয়ে থাকেন। ওইখানে সায়েবরা থাকত। দেবতারা এসে চলে যেতে বলায় তারা বাড়ি ফেলে চলে গিয়েছে।

মজুরেরা নানারকম মন্তব্য ক'রে চলে গেল।

আমরা তখন একটা লাঙল-চষা জমিতে পাথর ও আগাছা বাছবার কাজে লিপ্ত ছিলুম। আমার কাছেই একটা অল্পবয়সী মেয়ে কাজ করছিল।

তার বয়স বোধ হয় পনেরো-ষোলো বছর হবে। অত্যন্ত রোগা, কিন্তু বসন্তের বাতাস পেলে যেমন কোনো কোনো শুকনো কাঁটাগাছেও ফুল ধরে, তেমনি তার দেহে যৌবনের আগমনীর সামান্য স্বরের আমেজ লেগেছে মাত্র। কাজ করতে করতে একবার দু'জনে খুব কাছাকাছি এসে পড়ায় সে আমাকে কি-যেন বললে। তার কথা ভালো ক'রে বুঝতে না পারায় আমি আরও কাছে সরে যাওয়ায় সে আবার বললে—কাল রাতে কি হয়েছিল তোমাদের?

বললুম—তুমি কি ক'রে জানলে?

সে বললে—সবাই বলছে কাল রাতে তোমাদের ঘরে নাকি দেও এসেছিল।

বললুম—দেও কিনা জানি না, তবে এসেছিল কেউ।

মেয়েটিকে কাল রাত্রের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতেই সে দাঁড়িয়ে উঠে তার মাকে ডাকলে। মা দূরে আমাদের ক্ষেতেই কাজ করছিল, মেয়ের ডাক শুনে একরকম ছুটে কাছে এল। মায়ের দেখাদেখি বাপ, একটি ছেলে ও একটি মেয়ে যারা সকলেই কাছাকাছি কাজ করছিল—ছুটে এগিয়ে এল। মেয়েটি সকলকে কি-সব বলায় মা এগিয়ে এসে আমাদের বললে—ও-বাড়িতে আর তোমরা থেকো না। দেও বড় সব্বনেশে জিনিস!

আমরা বললুম—কিন্তু সর্দার ব'লে দিয়েছে ঘরের দরজা বন্ধ থাকলে আর কোনো ভয় নেই—আমরা দরজা কিছুতেই খুলব না।

তারা বলতে লাগল—প্রথম প্রথম মনে হয় বটে কিছুতেই দরজা খুলব না, কিন্তু দেওদের এমন মায়া যে, দরজা না খুলে থাকা যায় না। ওই বাড়িতে পাদরী-সায়েবেরা থাকত। কয়েকদিন ভয় পাবার পর দু'-তিনজন সায়েব পালাল—দু'-তিনজন থেকে গেল। একদিন দেখা গেল যে ঘরের দরজা খোলা আর দরজার সামনে দু'জনে মরে প'ড়ে রয়েছে।

খবরটি শুনে আমরা যে কিরকম খুশী হয়ে উঠলুম সে-কথা বোধ হয় কাউকে আর বুঝিয়ে বলতে হবে না। সর্দার তো ব'লে গেল—হাজার গোলমাল হলেও দরজা খুলবে না, কিন্তু দেওদের মায়ার প্রভাবে যদি খুলে ফেলি! হায়! হায়! শেষকালে জঙ্গলে এসে ভূতের হাতে প্রাণ খোয়াব! কিং-কর্তব্য-বিমূঢ় হয়ে সেই চষা মাঠে শুয়ে পড়লুম। কিন্তু সংসারে অনাবিল সুখও যেমন নেই তেমনি অনাবিল দুঃখও দুর্লভ। এই দুঃখের অবকাশেই আমার অরণ্যমাতা রূপ ধরতে আরম্ভ করলেন।

আমাদের অবস্থা দেখে সেই মেয়েটির মা বাবা সবাই সহানুভূতি জানাতে লাগল। তারা বলতে লাগল—ও-জায়গায় আর থেকো না। আমাদের বাড়ির কাছেই তোমরা থাকবার একটা ঝোপড়ি তৈরি ক'রে নিয়ে সেইখানেই বসবাস কর। আমরা অনেক ঘর সেখানে কাছাকাছি বাস করি ব'লে দেওরা আর সেদিকে বাস করেন না।

এই ব'লে তারা বারবার কার উদ্দেশে মাটিতে মাথা ঠুকতে লাগল।

তাদের মন রাখবার জন্য আমরা বললুম—আচ্ছা, তাই করা যাবে—কিন্তু

আপাতত ঝোপড়ি যতদিন না তৈরি করতে পারছি ততদিন অন্য কোনো একটা ব্যবস্থা করতে হবে।

সেদিন বিকেলে স্টেশনে গিয়ে ঠিক করা গেল যে, আজ রাতে আর ফেরা নয়। খাওয়া-দাওয়ার পর সেইখানেই তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের বিশ্রাম করবার ঘরে এক কোণে প'ড়ে থেকে রাত্রি কাটিয়ে, খুব ভোর থাকতে উঠে বাগানে এসে কাজে লেগে গেলুম।

এইরকম ক'রে তো দিনকয়েক কাটিয়ে দেওয়া গেল। দুপুরবেলা খাবার জন্য খানকয়েক রুটি আনা হ'ত। ঝরনার জলে স্নান ক'রে খাবার জল তুলে আমাদের প্রাসাদে বসে খেয়ে একটু গড়ানো যেত। তারপর আন্দাজমত উঠে কাজে লেগে বেলা চারটের সময় সর্দারের কাছ থেকে পয়সা নিয়ে স্টেশনে গিয়ে খেয়ে সেইখানেই শুয়ে পড়তুম। এই ছিল আমাদের নিত্য-কর্মপদ্ধতি।

এর মধ্যে কোনো সপ্তাহে দু'বার, কোনো সপ্তাহে বা একবার মেটাজী আসতেন। তিনি এসেই আমাদের ওপর তম্বি লাগাতেন। বলতেন—সর্দার বলছে, তোমরা রোজ দু'ঘণ্টা ক'রে কাজে ফাঁকি দাও। তোমাদের আর ছ'পয়সা ক'রে 'রোজ' দেওয়া চলবে না—আসছে সপ্তাহ থেকে পাঁচপয়সা ক'রে দেওয়া হবে।

মেটাজী আরও বললেন—সর্দার আরও বলছে মন না দিয়ে কাজ করলে সে আর তোমাদের রাখবে না।

আমরা কাজ করতে করতে ভাবলুম যে মেটাজী এলেই তাঁকে আমাদের 'রোজ' কিছু বাড়িয়ে দিতে বলব। কিন্তু তিনি এসেই আমাদের ওপর যেরকম চাপ লাগাতেন, তাতে আমরা আর ভরসা ক'রে 'রোজ' বাড়াবার কথা তাঁকে বলতে পারলুম না। কিন্তু মেটাজী হাজার চেঁচামেচি করলেও আমরা বেশ বুঝতে পারতুম যে, পাছে 'রোজ' বেশি ক'রে চাই তাই আগে থাকতেই এইসব চালের কথা ব'লে আমাদের থামিয়ে দেবার চেষ্টা হ'ত।

আগেই বলেছি, আমাদের সঙ্গে এক ক্ষেতে কাজ করত সেই যে-মেয়েটা ও তার মা-বাবা, তাদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ক্রমেই ঘনিষ্ঠ হচ্ছিল। তারাই একদিন এসে বললে—তোমাদের 'রোজ' থেকে ওরা দু'পয়সা ক'রে মারে। আমরা সকলেই 'রোজানা' দু'-আনা ক'রে পেয়ে থাকি।

এসব কথা শোনা সত্ত্বেও আমরা ওই ছ'পয়সাতেই দিন চালিয়ে নিতে লাগলুম। কিন্তু আর বেশীদিন ওরকম চলল না। প্রতিদিন জঙ্গল থেকে স্টেশন

এবং স্টেশন থেকে জঙ্গল—এই প্রায় দশ মাইল হাঁটা, তার ওপরে দিন-ভোর রোদে পরিশ্রম, একবেলা প্রায় উপবাস ও সন্ধ্যাবেলায় অর্ধাহার, রাত্রে শয্যাহীন পাথরের মেঝেতে শোয়া, এইসব কারণে আমাদের সকলের শরীরই খারাপ হয়ে চলেছিল। কালীচরণ আমাদের মধ্যে বেশ মোটাসোটা কিন্তু সেও খুব রোগা হয়ে পড়ল। স্টেশন থেকে ভোরবেলা জঙ্গলে আসবার সময় আমরা পাঁচ-ছ'মাইল দৌড়েই পার হতুম। কিন্তু ক্রমেই আমাদের গতির বেগ ক'মে আসতে লাগল। ইদানীং আসতে-যেতে পথে অনেকখানি সময় বিশ্রাম করতে হ'ত।

একদিন আমার অবস্থা এমনি হল যে স্টেশন থেকে আর জঙ্গলে পৌঁছতে পারি না। বন্ধুদের বললুম—আমায় একখানা রুটি দিয়ে তোরা চলে যা। আমি এইখানেই প'ড়ে থাকি—বিকেলবেলা স্টেশনে যাবার সময় আমায় তুলে নিয়ে যাস।

তারা আমার কথা মানলে না। বললে—ধীরে ধীরে নিয়ে যাব।

কিন্তু তখন আমার দু'-পা ও দেহ অবশ হয়ে আসছিল। দু'কদম চলেই আবার ব'সে পড়লুম।

কালী বললে—আচ্ছা তুই আমার পিঠে চড়।

ধীরে ধীরে তার পিঠে চড়ে দুই হাতে গলা জড়িয়ে ধরলুম। কিন্তু এক রশি পথ যেতে-না-যেতে কালীর অবস্থাও সঙ্কটাপন্ন হয়ে উঠল। সে আমাকে নামিয়ে দিয়ে একেবারে শুয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ সেইভাবে প'ড়ে থেকে সে উঠল বটে, কিন্তু আমাকে আর পিঠে নিতে পারলে না। এবার পরিতোষের পিঠে সওয়ার হলুম। কিন্তু তার অবস্থাও আমাদের চাইতে ভালো থাকবার কথা নয়। কিছুদূর চলতে-না-চলতে সে আমাকে নামিয়ে দিয়ে বললে—একটু বিশ্রাম ক'রে নিই, তারপর আবার চড়িস।

কিন্তু তার অবস্থা দেখে আমি বললুম—এবার আমি নিজেই যেতে পারব।

যাই হোক কোনোরকমে বসে শুয়ে গড়িয়ে হেঁটে কর্মস্থলে তো গিয়ে পৌঁছনো গেল। আমার অবস্থা দেখে সহকর্মীরা সকলেই সহানুভূতি দেখাতে লাগল। কেউ কেউ বললে—তোমাদের ঘরে গিয়ে শুয়ে থাক।

কিন্তু সেই মেয়েটি ও মা বললে—না না—তা হ'লে সর্দার আজকের রোজ দেবে না। তার চেয়ে তুমি এইখানেই বসে থাক। বসে না থাকতে পারলে শুয়ে থাক। সর্দার আসছে দেখতে পেলে আমরা তোমায় তুলে দেব—তখন একটু কাজের ভান ক'রো।

তখুনি আমাদের কাছাকাছি যত মজুর ও মজুরানী কাজ করছিল তাদের মধ্যে খবর চালাচালি হয়ে গেল যে সর্দারকে দূরে দেখতে পেলেই যেন. আমাদের সতর্ক ক'রে দেওয়া হয়।

আমি তো আর ক্ষণবিলম্ব না ক'রে মাটিতে দেহ বিছিয়ে দিলুম। কিছুক্ষণ বাদে সর্দারকে দূরে দেখতে পেয়ে সেই মা এসে আমায় তুলে দিলে। তখনো আমার আচ্ছন্ন অবস্থা কাটেনি। তবুও সেই অবস্থাতেই ভূমিশয্যা ছেড়ে উঠে কাজের ভান করতে লাগলুম। সর্দার এসে যথারীতি চেঁচামেচি ক'রে চলে গেল। সবাই মিলে বলতে লাগল—সর্দার চলে গেছে—এবার শুয়ে পড়।

বলামাত্র আমি শুয়ে পড়লুম। সেইখানে প'ড়ে প'ড়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম কি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলুম বলতে পারি না। কালীচরণ আমায় ঠেলে তুলে বললে—চল, ঘরে চল।

খানিকক্ষণ বিশ্রামলাভ করায় কথঞ্চিৎ সুস্থবোধ করছিলুম। এতক্ষণ অসুস্থ হয়ে প'ড়ে ছিলুম বটে, কিন্তু দেহে কোনো তাপ ছিল না। বন্ধুদের সঙ্গে স্নান ক'রে ঘরে উঠে এলুম। ঝরনার ঠাণ্ডা জলে স্নান ক'রে অনেকটা সুস্থ বোধ করতে লাগলুম। তারপর রুটি আর জল খেয়ে আবার শুয়ে পড়া গেল।

যথাসময়ে উঠে আবার কাজ করতে গেলুম বটে, কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই সেখানে আবার শরীর খুব খারাপ বোধ করতে লাগলুম। কাছেই সেই রোগা মেয়েটির মা কাজ করছিল। শরীরে আমি যে অস্বস্তি বোধ করছিলুম আমাকে দেখেই সে তা বুঝতে পেরে তার ভাষায় ও ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলে যে এখন আর সর্দার এখানে আসবে না—তুমি নিশ্চিন্তে শুয়ে পড়তে পার।

আমি নিশ্চিন্তে ধরণীর কোলে নিজেকে বিছিয়ে দিলুম।

* * *

তখন দিন প্রায় অবসান হয়ে এসেছে, পাখিদের চিৎকারে বনভূমি সরগরম। চোখ চেয়ে দেখলুম আমার বন্ধুরা ও আরও কয়েকজন মজুর-মজুরানী আমার পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে। পরিতোষ বললে—তুই ইস্টিশন অবধি হেঁটে যেতে পারবিনে। আজ রাত্রির মতো এদের বাড়িতে গিয়ে থাক্। সন্ধ্যে হয়ে এসেছে—আমরা চললুম।

সঙ্গে সঙ্গে আমার চারদিকের আরও অনেকে অনেক কথা বলতে লাগল। তাদের ভাষা অবোধ্য হলেও বুঝলুম যে তারা আমায় সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করছে। কিন্তু আমি তখন প্রায় অজ্ঞান—নিয়তির কাছে আত্মসমর্পণ করেছি। তাদের

সেই প্রবোধবাক্য কানেই যাচ্ছিল মাত্র, কিন্তু অন্তরে কোনো প্রতিক্রিয়াই হচ্ছিল না। তারপর বন্ধুরা কখন চ'লে গেল—কখন সেই স্ত্রীপুরুষের দল আমাকে তুলে—কখনো চ্যাংদোলা ক'রে, কখনো ঝুলিয়ে—কখনো হিঁচড়ে—কখনো হাঁটিয়ে নিয়ে চলল তাদের ঘরের দিকে। এ-যাত্রার স্পষ্ট চেতনা আমার নেই।

শুধু মনে পড়ে—আমি চলেছি তো চলেইছি। কখনো অর্ধচেতন—কখনো-বা অচেতন অবস্থায়। আমার মনে হচ্ছিল, আমি যেন যুগযুগান্ত ধরে এই জরাভাব বহন ক'রে চলেছি—এই বন্ধুর পথ বেয়ে—কত জীবন পার হয়ে চলেছি—এর আরম্ভও নেই—শেষও নেই। চলতে চলতে কখনো সম্পূর্ণ জ্ঞানহারা, কখনো-বা পারিপার্শ্বিক বস্তুসমূহ সম্বন্ধে সামান্য চেতনা—তারপরে সম্পূর্ণ অচেতন। যখন সামান্য জ্ঞান ফিরে এল তখন বুঝতে পারলুম আমি একটা ঝোপড়ির মধ্যে শুয়ে আছি। মাথার ওপরে পাতার আচ্ছাদন, তারই শত-সহস্র রন্ধ্র দিয়ে অজস্রধারায় চন্দ্রালোক ঝরে পড়ছে আমার অঙ্গে, আমার চারদিকের মাটিতে—এখানে, ওখানে, সেখানে।

চোখ চেয়েই আমার মুখ দিয়ে মাতৃনাম উচ্চারিত হল। ক্ষীণ কণ্ঠে ডাকলুম—মা—মা!

কণ্ঠ দিয়ে শব্দ বেরুনো-মাত্র একখানি শীর্ণ-কঙ্কাল-হস্ত আমার কপালে এসে পড়ল। সে-হাতের স্পর্শ কঠিন ও কর্কশ হলেও স্পর্শের অতীত মাতৃহৃদয়ের যে বাৎসল্য—সেই অনুভব আমার মনে শরীরে সঞ্চারিত হয়ে আমায় যেন মৃত্যুর দুয়ার থেকে টেনে নিয়ে এল।

আজ মনে ভাবি সৃষ্টিকর্তা কী অপূর্ব কৌশলে সেই অরণ্যের মধ্যে আমার জন্য একখানি মাতৃহৃদয় সঞ্চিত ক'রে রেখেছিলেন!

আমার অরণ্যমাতা বিড়বিড় ক'রে কি বলতে বলতে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। কিছুক্ষণ বাদেই সেই মেয়েটি, যার মাধ্যমে আমরা এই পরিবারের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলুম, সে এগিয়ে এসে দু'হাত দিয়ে আমার দু'হাত ধরে টেনে তুলে বসালে। আমি ততক্ষণে অনেকটা আরাম বোধ করছিলুম। মেয়েটি, তার বাবা ও ভাই সকলে নানারকম প্রশ্ন করতে লাগল।

ছোট একখানা নিচু ঘর—পাহাড়ের গায়ে ঘেঁষা অর্থাৎ একদিকের দেওয়াল হচ্ছে পাহাড়। পাহাড়ের গায়ে শেওলা ধরে আছে, তাই ব'য়ে নিরন্তর জল পড়ছে। তাই সেইদিকে বেশ চওড়া একটা নালা ক'রে রাখা হয়েছে, কারণ

বর্ষাকালে পাহাড়ের গা বেয়ে বেশ তোড়ে জলধারা নামে। ঘর নিচু—কোনো-রকমে ঘাড় নিচু ক'রে একজন পুরুষমানুষ দাঁড়াতে পারে।

গাছের সরু-সরু ডাল লম্বা ও আড়াআড়িভাবে সাজিয়ে চাল করা হয়েছে। কোনো কোনো ডাল মধ্যে ঝুলে প'ড়ে সাংঘাতিক খোঁচার মতন হয়ে আছে। অনভ্যস্ত ব্যক্তির চোখে নাকে লাগলে বিষম কাণ্ড হতে পারে। চালের সহস্র অবকাশ দিয়ে আকাশ দেখা যাচ্ছে। ঘরের তিনদিকের দেওয়ালও সেই মেকদারের। ঘরের মেঝে অত্যন্ত স্যাঁতসেঁতে। তারই মধ্যে এক জায়গায় স্রেফ কাঁচা ও শুকনো পাতার শয্যায় একটি বালক ঘুমুচ্ছে—এদেরই ছোট ছেলে। অদূরে এক কোণে একখানা বড় পাথরের ওপরে ছোট্ট একটি মাটির প্রদীপ জলছে। কোণে মেঝে খুঁড়ে একটা উনুন করা হয়েছে। সরু ও ছোট ছোট শুকনো গাছের ডাল জ্বালানো হয়েছে। বাড়ির বড মেয়ে অর্থাৎ আমাদের সেই প্রথম বন্ধু তারই সামনে ব'সে রুটি তৈরি করছে। আধ-ইঞ্চি মোটা ও গ্রামোফোনের দশ-ইঞ্চি রেকর্ডের মতো গোল বাজরার রুটি তৈরি হচ্ছে। চাকি নেই বেলুন নেই,—বড় বড কালো-কালো সেই বাজরার আটার তাল অর্থাৎ লেচি দিয়ে স্রেফ দু'হাতে পটাপট শব্দে পিটে পিটে অদ্ভুত তৎপরতার সঙ্গে রুটি তৈরি ক'রে সেই গন্‌গনে আগুনের মধ্যে ছেড়ে দিয়ে আবার নেচি ছিঁড়ছে। আশ্চর্য এই যে প্রত্যেকটি রুটি সমান মাপে গ্রামোফোনের দশ-ইঞ্চি রেকর্ডের মতো গোল ও প্রায় আধ-ইঞ্চি মোটা। রুটি তৈরি করতে করতে ঠিক সময় বুঝে সে আগুনের রুটিখানা আবার উল্‌টে দিচ্ছে।

আমি ব'সে ব'সে সেই দৃশ্য দেখছিলুম, এমন সময় আমার অরণ্যমাতা উঠে গিয়ে ঘরের কোণ থেকে একটা সদ্য-ভাঙা গাছের ডাল টেনে নিয়ে এসে তা থেকে পড়পড ক'রে কতকগুলো পাতা ছিঁড়ে নিয়ে হাতের তেলোয় ফেলে দু'হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সেগুলোকে থেঁতো করতে আরম্ভ ক'রে দিলে।

কিছুক্ষণ এই প্রক্রিয়ার পর পাতাগুলো নরম হয়ে এলে আমাকে হাঁ করতে বললে। তারপর কয়েক ফোঁটা সেই পাতার রস নিংড়ে আমার মুখে দিয়ে বললে—যা এবার তুই ভালো হয়ে যাবি।

আরও কিছুক্ষণ কাটবার পর রুটি তৈরি হয়ে গেল। সবার ভাগে একখানা ক'রে রুটি। সেই পাঁচবছরের শিশু ও ঘরের কর্তা—আধবুড়ো, সবারই সমান ভাগ। বলা বাহুল্য আমিও একখানা রুটি পেলুম। কালো কাঠের মতো শক্ত বাজরার রুটি, তার মধ্যে এক-আধটা আস্ত বাজরা বা বাজরার খোসা

খোঁচার মতো সিং উঁচিয়ে রয়েছে যা বেকায়দায় গলায় বেধে গেলে সাংঘাতিক মাছের কাঁটার কাজ হতে পারে। আমি অন্য সবার দেখাদেখি তাই একটু একটু ভেঙে মুখে দিয়ে খেতে আরম্ভ ক'রে দিলুম। খেতে খুব খারাপ নয়, তার ওপর খিদের মুখে সে-খাদ্য অমৃতের মতন লাগতে লাগল। বিনা তরকারিতে খেতে অসুবিধা হচ্ছে বুঝতে পেরে মেয়েটি তার মাকে কি বললে। মেয়ের কথা শুনে মা কাছেরই একটা ছোট্ট গর্ত থেকে কি-সব বেছে বেছে তুলে আমার হাতে দিয়ে বললে—এই দিয়ে খাও, ভালো লাগবে।

দেখলুম কালো-কালো কতকগুলো নুনের টুকরো।

আমাকে সেই নুনটুকু দেওয়ামাত্র ছেলেমেয়েরা সকলেই বায়না ধরলে। তখন মা আবার সেই গর্ত থেকে, কারুকে বেছে—কারুকে মাটি চেঁছে নুন দিয়ে, নিজে খানিকটা সেই নোনতা মাটি চেঁছে নিয়ে তাই টাকনা দিয়ে-দিয়ে রুটিখানা খেয়ে ফেললে।

একখানা সেই রুটি খেতে আমার প্রায় পনেরো মিনিট সময় লেগে গেল ও পেটও ভরে গেল। কিন্তু অন্য সবাই দেখলুম দু'-তিন মিনিটের মধ্যেই রুটি নিঃশেষ ক'রে ফেললে। সকলেরই, এমনকি সেই পাঁচ-ছ'বছরের বাচ্চাটারও মুখ দেখে মনে হল যে খেয়ে তাদের পেট ভরল না। আরও অন্তত গড়ে দু'খানা ক'রে রুটি খেতে পারলে হত। কিন্তু উপায় নেই!

ঘরের কোণে একরাশ শুকনো পাতা জড়ো করা ছিল। আমি এতক্ষণ মনে করেছিলুম যে উনুন জ্বালাবার জন্যে সেগুলি সংগ্রহ ক'রে রাখা হয়েছে। কিন্তু খাওয়ার পরই দেখা গেল, এক-একজনে দু'হাতে ক'রে এক এক বোঝা পাতা তুলে এনে, একটুখানি ক'রে জায়গায় তাই বিছিয়ে বিছানার মতন ক'রে সেখানে যে-যার শুয়ে পড়ল। মাথায় বালিশ নেই, ভূমির ওপর একখণ্ড ছেঁড়া বস্ত্র পর্যন্ত নেই।

তাদের কাণ্ড দেখছি—এমন সময় আমার অরণ্যমাতা একবোঝা পাতা এনে এক কোণে বিছিয়ে আমায় ইঙ্গিতে বললে—শুয়ে পড়।

ঘরের কোণে টিমটিম ক'রে একটা মাটির প্রদীপ জ্বলছিল, সেটাকে ফুঁ দিয়ে নিবিয়ে সেও শুয়ে পড়ল। আমি কোঁচা খুলে সেই পাতাগুলোর ওপর বিছিয়ে শুয়ে পড়লুম। যদিও মাটিতে বিনা উপাধানে শোওয়া অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল—তবুও সেই প্রায়-ভিজে মাটির ওপরে শুতে প্রথমটা বেশ অসুবিধা হ'তে লাগল। কিন্তু কিছুক্ষণ এ-পাশ ও-পাশ করতে-করতেই চিন্তার সমুদ্রে ডুবে গেলুম—দেহের অসুবিধার কথা আর মনেই রইল না।

ঘরের মধ্যে অন্ধকার, এক কোণে সেই উনুনের আগুন ভস্মরাশির ভেতর থেকে একটু চকচক করছে, আমার চারপাশে প্রায়-নগ্ন কয়েকটি নরনারীর কঙ্কাল প'ড়ে রয়েছে। সারাদিন হাড়ভাঙা পরিশ্রমের পর আধপেটা-সিকিপেটা খেয়ে স্রেফ শ্রান্তিতে গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে প'ড়ে আছে। বাইরে নিস্তব্ধ বনানী স্তব্ধ নিঃঝুম—তারই মধ্যে মাঝে মাঝে কিসের যেন চিৎকার উঠছে—হয়তো কোনো রাত-পাখির কিংবা কোনো জানোয়ারের কিংবা কোনো 'দেও'—সবই হ'তে পারে।

আমার চোখে ঘুম নেই। সমস্তদিনই ঘুমিয়ে কাটিয়েছি। মাথার মধ্যে নানারকম চিন্তা এসে জুটতে লাগল। মনে হ'তে লাগল—আমি কোথাকার লোক—কেমন ক'রে এদের মধ্যে এসে এখানে রাত্রে শুয়ে আছি! কী অসম্ভব সংঘটন! আমার চারপাশে এই যে যারা শুয়ে আছে, যারা কিছুদিন আগে পর্যন্ত সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিল, অথচ আজ তারা পরমাত্মীয়ের মতন আমার জীবন রক্ষা করেছে,—এদের সঙ্গে আমার কিসের সম্বন্ধ! কোন্ অজ্ঞাত বন্ধনের মায়ায় আমার প্রতি বাৎসল্য জেগে উঠেছে এই অরণ্যমাতার হৃদয়ে! এই পরিবারের ছেলেমেয়েরা সকলেই আমাকে ভাইয়ের মতন শুশ্রূষা ক'রে সুস্থ করবার চেষ্টা করছে। ভাবতে ভাবতে এদের প্রতি, এমনকি সেই বনভূমির প্রতি আমি যেন আত্মীয়তার বন্ধন অনুভব করতে লাগলুম।

মনে হ'তে লাগল—কোনো জন্মান্তরে এই বনভূমিই ছিল আমার মাতৃভূমি, এখানকার ছেলেমেয়েরা ছিল আমার সেদিনের খেলার সঙ্গী ও সঙ্গিনী। বিশেষ ক'রে এই পরিবারের সঙ্গেই ছিল আমার বিশেষ সম্বন্ধ! সেই আকর্ষণেই আজ আমি অভাবিতরূপে এদের আশ্রয়ে এসে পড়েছি। তা না হ'লে আজ আমি অসুস্থ না হয়ে পরিতোষ কিংবা কালী এদের মধ্যেই যে-কেউ অসুস্থ হয়ে পডতে পারত। ভাবতে লাগলুম—এখান থেকে কিছুদূরেই তো সুন্দরী বোম্বাই নগরী; কিন্তু সেখানকার সুখ-দুঃখ-ভোগ-ঐশ্বর্য-সমারোহের কিছুই এরা জানে না, সেখানকার জীবনযাত্রার কোনো প্রতিক্রিয়াই এদের জীবনযাত্রায় প্রতিফলিত হয়নি। সকাল-সন্ধ্যা দু'খানা মোটা-মোটা অখাদ্য বাজরার রুটি—তাও আবার বিনা তরকারিতে। যেখানে একদিন সামান্য একটু নুন রাখা হয়েছিল সেখানকার মাটি চেঁছে নিয়ে তাই দিয়ে খাওয়া—এমনি ক'রে একদিন এই মাটিতেই এখানকার জীবন শেষ ক'রে দিয়ে চলে যাবে। ভাবতে ভাবতে আমার মাথা গরম হয়ে উঠতে লাগল। কয়েকবার উঠে বসলুম। সেই জীর্ণ

কুটীরের চাল ও আশপাশের দেওয়ালের শত-সহস্র ফাঁক দিয়ে ঘরের মধ্যে অজস্রধারায় চন্দ্রকিরণ বর্ষিত হচ্ছিল। সেই আলোতে দেখতে লাগলুম চারদিকের ঘুমন্ত সেই মানুষগুলিকে—অনেক বাল্যকালে রাত্রে ঘুম থেকে জেগে উঠে যেমন দেখতুম আমার আপনজনকে। আবার আমি এদের মধ্যে ফিরে এসেছি। এই ফিরে আসার মধ্যে কোনো প্রাকৃতিক রহস্য, কোনো ইঙ্গিত কি লুকিয়ে আছে ?

মনে মনে প্রতিজ্ঞা করতে লাগলুম—এদের অবস্থা, এদের দারিদ্র্য দুঃখ দূর করবার চেষ্টা করতে হবে। এই উদ্দেশ্যেই সৃষ্টিকর্তা আমায় এদের মধ্যে এনে ফেলেছেন। এদের নগ্ন অঙ্গে বস্ত্র দিতে হবে, অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার শক্তি জাগিয়ে তুলতে হবে এদের বুকে। এইসব কথা চিন্তা করতে করতে আনন্দে আমার বুকের মধ্যে গুরগুর করতে লাগল, কাঁপতে কাঁপতে আবার শুয়ে পড়লুম।

একদিন এই সংকল্প মনের মধ্যে নিয়ে সংসার-সমুদ্রে জীবন-তরণী ভাসিয়েছিলুম। তারপরে সুখ-দুঃখ, শোক-তাপ, ভোগ-দুর্ভোগ, সাচ্ছল্য-দারিদ্র্যের তরঙ্গাঘাতে চলেছিলুম—কখনো স্রোতের মুখে কুটোর মতন, কখনো-বা তরঙ্গের বিপরীতে। কখনো এসেছে তমসাময়ী ঝটিকাচ্ছন্ন রাত্রি, কখনো-বা নাতিশীতোষ্ণ আনন্দময় স্নিগ্ধোজ্জ্বল প্রভাত। ঘাটে ঘাটে, বন্দরে বন্দরে নতুন অভিজ্ঞতা-সম্ভার বোঝাই ক'রে—অতীতে কখনও কোন্ একদিন কোন্ দিনদরিদ্র পরিবারের ছেলেমেয়েদের অন্তরে ভাই ব'লে আলিঙ্গন করেছিলুম, তাদের মাকে মা ব'লে মেনেছিলুম,—তাদের দুঃখ-দুর্দশা দূর করব, তাদের অবস্থার উন্নতি করব ব'লে একদিন গভীর রাত্রে নিজের অন্তরের কাছে যে প্রতিজ্ঞা করেছিলুম—কোথায় মনের কোন্ অতলে তলিয়ে গেল—তার অস্তিত্ব—তার লেশমাত্রও মনে রইল না।

তাদের স্থানে কত লোককে ভাই বললুম, কত শয়তানকে আলিঙ্গন করলুম ভাই ব'লে, কত মহৎকে পদাঘাত করলুম শত্রু ব'লে। এমনি ক'রে বহুদিন—বহু-বৎসর দুর্লভ মানবজীবনের তৃতীয়াংশ ক্ষয় ক'রে একদিন জীবন-তরণী চড়ায় আটকে গেল। আকস্মিক বজ্রপাতের মতন অভাবিতরূপে মনে প'ড়ে গেল সেই আমার জীবন-প্রভাতের ফেলে আসা দিনটির কথা। সেই কথাটিই আগে শেষ করি।

কল্যাণে এসে দু'টি বিষয়ে আমার যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল—তার একটি হচ্ছে

অতিলৌকিক, আর একটি ইহলৌকিক। অতিলৌকিক অভিজ্ঞতার সূত্রপাত ঠিক কবে হয়েছিল বলতে পারি না, তবে হংসভূতের কণ্ঠে তার প্রথম সরব আমন্ত্রণ শুনেছিলুম। পরবর্তী জীবনে এই অদৃশ্য রহস্যের বিপুল বৈচিত্র্য অনুভব করলেও সে-দেশের কথা আজও আমার বুদ্ধির অগম্য হয়ে আছে।

দিন-কয়েকের মধ্যেই আমি অপেক্ষাকৃত সুস্থ হলুম।

আমি, কালী আর পরিতোষ—তিনজনে মিলে পরামর্শ ক'রে স্থির করলুম—এখানে সমস্ত দিন বিরামবিহীন পরিশ্রমের বিনিময়ে ছ'পয়সা রোজগার করি। একদিন অন্তর একবেলা চালভাজা কিংবা চিঁড়ে খেয়ে কাটাতে হয়। এর চেয়ে বোম্বাইয়ে গিয়ে মুটেগিরি করব। স্টেশনে মুটের কাজ করলে পরে দৈনিক এক-একজন একটাকার চেয়েও বেশী রোজগার করতে পারে। ইদানীং সর্দার হপ্তায় একদিন ক'রে আমাদের মাইনে চুকিয়ে দিত। সন্ধ্যেবেলায় এক হপ্তার মাইনে পেয়ে তাকে বললুম—আমরা আর এখানে কাজ করব না।

সর্দার বললে—আচ্ছা—যা।

তিনজনের পয়সা একত্র ক'রে প্রায় টাকা-দেড়েক হয়েছিল। বোম্বাই যাওয়ার ট্রেনের ভাড়া তাতে কুলোয় না। সুতরাং বিনা-টিকিটের তিন যাত্রী হ'য়ে বোম্বাই-গামী এক ট্রেনে চ'ড়ে বসা গেল। ট্রেনটা ছিল প্যাসেঞ্জার গাড়ি। অনেক দেরি ক'রে শহরের মধ্যে এসে পৌঁছল।

দাদর স্টেশনে আমাদের পাশের কামরা থেকে জনকয়েক বিনা-টিকিটের যাত্রীকে টিকিট-চেকাররা নামিয়ে নিয়ে গেল দেখে আমরা টপ্‌টপ্‌ ক'রে ট্রেন থেকে নেমে প্ল্যাটফরমের দেয়ালে আঁটা বিজ্ঞাপন পড়তে লাগলুম।

ট্রেন চলে গেল, ভিড়ও পাতলা হয়ে গেল। আমরাও সাবধানে প্ল্যাটফরম থেকে বেরিয়ে পড়লুম।

এখন চিন্তা হ'ল রাতটা কোথায় কাটাই! স্থির করা গেল নবাব-বিল্ডিং-এ কুঞ্জবাবুর ওখানে একবার ঢুঁ-মারা যাক। আমরা ভদ্রলোকের ছেলে জেনে-শুনে যেরকম চাকরি আমাদের জুটিয়ে দিয়েছিলেন সেজন্য তাঁর প্রাপ্য ধন্যবাদটা তাঁকে দেওয়া উচিত। ওখানে ফাঁকা ঘর যদি থাকে তো সেইখানেই রাতটা কাটানো যাবে। নচেৎ ভিখিরীপাড়ায় গিয়ে রাস্তায় শুয়ে থাকব। চেহারা ও পোশাকের যা খোলতাই হয়েছে তাতে সেখানে আমাদের বিশেষ বেমানান হবে না।

চলতে চলতে নবাব-বিল্ডিং-এর কাছে পৌঁছনো গেল। বাইরে থেকে দেখলুম—লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের দরজা-জানলা সব বন্ধ। ভেতরে কোনো আলোও জ্বলছে না। বুঝলুম এ-সময়ে কুঞ্জবাবুর দেখা পাওয়া যাবে না। 'জয় তারা' ব'লে বাড়ির মধ্যে তো ঢুকে পড়া গেল।

ভেতরে ঘুটঘুটে অন্ধকার, অবারিত সিঁড়ি। পা টিপে টিপে আমরা ওপরে উঠতে লাগলুম। মাঝে মাঝে অন্ধকার এত ঘন যে দেশলাই জ্বালাতে হচ্ছিল। এইসব বাড়ি কারুর থাকবার জন্য তৈরি হয়নি। এখানে প্রত্যেক তলায় বড় বড় ঘর ব্যবসাদারদের ভাড়া দেবার জন্য। কোথাও দোকান হয়, কোথাও আপিস বসে। দোতলায় উঠে কুঞ্জবাবুর ঘরের কাছে গিয়ে দেখলুম যে দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। দোতলায় দু'-একখানা ঘরে তালা লাগানোও দেখতে পেলুম। তখন তেতলার দিকে অগ্রসর হওয়া গেল।

সেখানে রাস্তার ধারের ঘরখানা তখনও খালি প'ড়ে ছিল। দরজা-জানলা সব খোলা। মেঝেতে ক্লান্তদেহ বিছিয়ে দেওয়া গেল।

শুয়ে শুয়ে মনে হতে লাগল—কোথাকার কে নবাব, তার এই বিল্ডিং—কোথাকার কোন্ দূরদেশের ছেলে আমরা অন্ধকার এই ঘরে প'ড়ে আছি। এখন যদি এর মালিক পুলিস নিয়ে এসে আমাদের গ্রেফ্তার করে! কথাটা ভাবতেও শিউরে উঠলুম। ওদিকে 'বাবা কালী'র নাসারন্ধ্র ঘন ঘন গর্জন ক'রে জানিয়ে দিতে লাগল : যা হবার তাই হবে—এখন তো ঘুমিয়ে পড।

খুব ভোরবেলা উঠে আমরা গরম গরম চা খেয়ে দোকানেই খানিকক্ষণ কাটিয়ে কুঞ্জবাবুর সঙ্গে দেখা করতে এলুম। মনে করেছিলুম আমাদের দেখে তিনি খুব আশ্চর্য হয়ে যাবেন, কিন্তু তাঁকে দেখে মনে হ'ল—তিনি যেন আমাদের জন্যই অপেক্ষা করছেন।

আমরা বললুম—খুব চাকরি জুটিয়ে দিয়েছিলেন যা হোক! দৈনিক ছ'পয়সায় কী খাব, কীই-বা পরব।

তিনি সে-কথার কোনো জবাব না দিয়ে বললেন—কিন্তু তোমরা বাপু কিরকম বাড়ির ঠিকানা আমাকে দিয়েছিলে?

আমরা আশ্চর্য হবার ভান করলুম।

তিনি বললেন—আমি কলকাতায় আমার বাড়িতে চিঠি দিয়েছিলুম তোমাদের খোঁজ করবার জন্য। কিন্তু তারা গিয়ে জেনেছে—ও-নামের ঠিকানায় কেউ থাকে না। আমাকে তা হ'লে তোমরা মিথ্যে ঠিকানা দিয়েছিলে!

এবার স্বরূপমূর্তি বার করতে হ'ল।

—আমাদের ঠিকানা কেন চেয়েছিলেন ?

তিনি বললেন—তোমরা এখানে কষ্ট পাচ্ছ সে-কথা তোমাদের বাড়িতে জানিয়ে দেওয়া উচিত বিবেচনা করলুম।

বললুম—কষ্ট পাচ্ছি ব'লেই তো আপনার শরণাপন্ন হয়েছিলুম। বাড়িতে জানাবার হ'লে তো আমরা নিজেরাই জানাতুম।

আমাদের কথা শুনে ভদ্রলোক আর কোনো জবাব দিলেন না। তিনি নীরবে ঘরের কাজ করতে লাগলেন, আমাদের সঙ্গে আর কথাও বললেন না।

ধীরে ধীরে সেখান থেকে বেরিয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়ালুম।

অতঃপর কী করা যায়!

স্টেশনের দিকে পা চালিয়ে দেওয়া গেল।

মনের মধ্যে নবীন আশা নবীন উৎসাহ, জীবনের নতুন ক্ষেত্রে প্রবেশ করব। ওঃ, কী উন্নতি! ভদ্রলোকের ছেলে—সুখে বিছানায় শুয়ে দু'বেলা রাঁধা ভাত ছেড়ে দিয়ে এসে আজ ঝাঁকামুটে হতে চলেছি।

ঝাঁকামুটে বললেও অত্যুক্তি হয়, কারণ ঝাঁকা তখনও কেনা হয়নি। ঠিক করা আছে—স্টেশনে মুটেগিরি ক'রে কিছু পয়সা জমিয়ে ঝাঁকা কেনা হবে।

পায়ে পায়ে স্টেশনে পৌঁছনো গেল। রাস্তার দিকে প্ল্যাটফরমে গিয়ে দেখি—লোকজন খুবই চঞ্চল হয়ে এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করছে। ক্যালকাটা মেল অর্থাৎ কলকাতায় যেটা বোম্বাই মেল তা এখনও এসে পৌঁছয়নি। কুলীরা সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। দীর্ঘ বলিষ্ঠ চেহারা তাদের। তাদের সামনে আমরা কিছুই নই। তবুও আমরা কোঁচা খুলে সেইটেকে বিঁড়ের মতন পাকিয়ে তাদেরই পেছনে একজায়গায় দাঁড়ালুম।

কিছুক্ষণের মধ্যে দূরে ট্রেন দেখা গেল।

তারপরেই বিরাট শব্দ ক'রে ট্রেন ঢুকে পড়ল স্টেশনের মধ্যে—সঙ্গে সঙ্গে প্যাণ্ডিমোনিয়াম খাঁচা ছাড়া।

প্ল্যাটফরমে গাড়িখানা ঢুকতেই স্টেশনে যে লোকগুলো এতক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিল তারা সব যেন দিগ্‌বিদিকে ছুটোছুটি আরম্ভ ক'রে দিলে। আমরাও যাত্রীগাড়ির একটা একটা জানলার ফাঁক দিয়ে তিন-চারজন বাঙালী প্যাসেঞ্জারকে লক্ষ্য ক'রে দৌড়তে লাগলুম।

স্টেশনের মধ্যে গাড়ি ঢুকেই আধমিনিটের মধ্যেই থেমে গেল। গাড়ি

থামতেই লোকজনের পায়ের ফাঁক দিয়ে ভেতরে ঢুকে গিয়ে দেখলুম—সত্যিই তারা বাঙালী যাত্রী। আমি হাঁপাতে হাঁপাতে বললুম—দেখুন, আমরা বাঙালী মুটে। আমাদের এরা মোট বইতে দেয় না।

কে দেয় না?—ব'লেই এক ভদ্রলোক তাঁর সুটকেসটা আমাকে দিয়ে বললেন—এইটে নিয়ে বাইরে চল।

ঘরের মধ্যে প্ল্যাটফরমের কুলী যে দু'চারজন উঠেছিল, তারা আমার হাত ধ'রে ওদের বললে—না বাবু, তা হ'তে পারে না, এখানে মুটেগিরি করতে হ'লে লাইসেন্স নিতে হবে।

ব'লেই লোকটা আমার কাঁধ খিমচে ধ'রে—'যা বাহার'—ব'লে আমাকে কামরার ভেতর থেকে বাইরে ছুঁড়ে ফেললে।

আমি ছিটকে গিয়ে একটা ভিড়ের মধ্যে পড়লুম। সম্বিৎ ফিরে আসতেই দেখলুম আমাদের কালীচরণের মুখখানা হয়ে উঠেছে ক্রুদ্ধ চিতাবাঘের মতো এবং সে একাধারে কতকগুলো প্ল্যাটফরমের কুলীকে কামড়ে খিমচে মেরে অস্থির ক'রে তুলেছে। কোনোরকমে জড়িয়ে ধরে কালীকে তো থামানো গেল।

ওদিকে আমাদের ঘিরে বেশ বড়রকমের একটা ভিড় জমে উঠেছিল। কি ভাগ্যি—পুলিস তখনও আসেনি। কারণ শহর তো দূরের কথা—ভিক্টোরিয়া টার্মিনাস স্টেশনেও সর্বসময় পুলিসের ভিড় লেগেই থাকে।

সকলেই হাত-পা-মুখ নেড়ে আমাদের বুঝিয়ে দিতে লাগল যে, লাইসেন্স না হ'লে স্টেশনের মধ্যে কারুকে মুটেগিরি করতে দেওয়া হয় না এবং লাইসেন্স্‌ড্‌ কুলীরও কেউ জামিন হওয়া চাই।

এক সেকেণ্ডেই আমরা "নিচল বলিয়া উচলে উঠিতে পড়িনু অগাধ জলে"।

আর বাক্যব্যয় করা বৃথা এই ভেবে ভিড় ঠেলে বাইরে আসছিলুম। এমন সময় একটি লোক, মোটা-সোটা তার দেহ, বোধহয় পাগড়ি বাঁধবার চেষ্টা করা হচ্ছিল কিন্তু তাড়াতাড়িতে তা আর হয়ে ওঠেনি। মাথার সবখানিই প্রায় দেখা যাচ্ছে। গায়ে জামা পরা, গলায় একটা পৈতে ঝুলছে—যার শেষ অবধি গিয়ে পৌঁছেচে পায়ের গাঁটের কাছে—"কি হয়েছে, কি হয়েছে?"—বলতে বলতে রণাঙ্গনে প্রবেশ করল।

অবিশ্যি তার অঙ্গে যথোচিত ফতুয়া, হাফ্‌কোট ইত্যাদি চড়ানো। তিনি আসরে প্রবেশ করা-মাত্র দু'চারজন ক'রে এগিয়ে এসে বললে—এরা কুলীগিরি করছে। আমরা ধ'রে ফেলেছি।

এরই মধ্যে একজন কুলী চেঁচিয়ে আমাদের বললে—ইনি হচ্ছেন আমাদের সর্দার, ইনি সরকারকে কুলীর যোগান দেন। এঁর 'গিরিফিট' না পেলে কুলী নেওয়া হয় না।

কুলীর সর্দার আমাদের অপরাধ শুনে বললে—তোমরা খবরদার আর এ-কাজ করতে যেও না। তোমাদের কখনো কুলীগিরি দেওয়া হবে না। দ্বিতীয়-বার ধরা পড়লে তোমাদের হাতে-পায়ে শেকল বেঁধে রাত্রিবেলা ইঞ্জিনের সামনে ফেলে দেব। বুঝলে? যাও, আপনার কাজে যাও।

মনে হল আমাদের হাতে-পায়ের শেকল খুলে গেছে। গুটিগুটি স্টেশন থেকে বেরিয়ে আসছি, এমন সময় একটি লোক আমাদের কাছে এগিয়ে এল। প্রায় সাড়ে-ছ'ফুট উঁচু এবং দেহের বেড়ও সেই মাপের। মাথায় একটা কালো মখমলের টুপি, বুকে চেনঘড়ি ঝুলছে। একটা চোখ বন্ধ ক'রে, ঠোঁট ও ডান হাতের তর্জনী বেঁকিয়ে আমাকে ইশারায় ডাকলে।

এগিয়ে যেতেই সে জিজ্ঞাসা করলে—তোমরা চাকরি করবে?

—নিশ্চয়ই করব।

—আমার হোটেল আছে হর্নবি রোডে—বোম্বে-বরোদা-বেঙ্গল হিন্দু হোটেল। তোমরা স্টেশন থেকে হোটেলের জন্য লোক ধ'রে নিয়ে যাবে। খেতে পাবে, কিন্তু মাইনে কিছু পাবে না। আমি এখনি হোটেলে যাচ্ছি—তোমরা এসো।

তারপর কালীর দিকে আঙুল বাড়িয়ে বললে—কিন্তু ঐ লোকটাকে সঙ্গে ক'রে এনো না।

হোটেলটা আমাদের জানা ছিল। তখুনি বেরিয়ে গিয়ে সেখানে উঠলুম।

লোকটা জাতিতে সিন্ধী। নাম সেদিন কি বলেছিল আজ আর তা মনে নেই। সে আরো বললে—দু'খানা লাইসেন্স আমার করা আছে।

এই ব'লে সে টিনে-বাঁধানো দু'খানা ছোট ছোট লাইসেন্স আমাদের দিয়ে বললে—সকালবেলা এগারোটার মধ্যে খেয়ে নেবে। তিনটে থেকে সন্ধ্যে অবধি চা হয়। তারপরে রাতের খাবার যত তাড়াতাড়ি খেয়ে নিতে পার। রাত্রিবেলা হোটেলেই থাকবে।

সে বার বার ক'রে ব'লে দিলে—মাইনে কিছু দিতে পারব না, আর ঐ লোকটাকে যেন সঙ্গে না নিয়ে যাই।

কালীকে দেখিয়ে কথাটা বলায় আমাদের তিনজনের বুকেই চাবুকের মতো

কথাটা এসে লাগল। পরস্পরের মধ্যে সে-সম্বন্ধে আর কোনো উচ্চবাচ্য না ক'রে আমরা হোটেলের দিকে অগ্রসর হ'তে লাগলুম।

কালীর চেহারাটা সত্যিই খারাপ। এ নিয়ে আমরা নিজেদের মধ্যে কত হাসাহাসি করেছি। কালী বলত—তোরা আমার যেগুলোকে খারাপ বুঝিস আসলে সেইগুলোই হচ্ছে সুন্দর। এসব রূপের ব্যাপার তোরা বুঝবিনি।

কিন্তু আজ বাইরের ঐ লোকটার কথা শুনে কালীর মুখখানাও ম্লান হয়ে গেল।

চলতে চলতে আমরা হোটেলের দরজার কাছে এসে দাঁড়ালুম। কালী বললে—তোরা যা, আমি নবাব-বিল্ডিং-এর ঐ তেতলাতেই থাকব।

কালীকে বললুম—হ্যাঁ, তুই যা। আমাদের যে খাবার দেবে তা থেকে মেরে তোর জন্যে নিয়ে যাব।

কালী চলে গেল।

হোটেলের সামনেও দাঁড়িয়েও হোটেলের মধ্যে ঢুকতে আমার আর ইচ্ছে করছিল না। কিন্তু তবুও ঢুকে পড়লুম এবং আস্তে আস্তে তিনতলায় উঠে দরজার কাছে এসে দাঁড়ালুম।

কিছুক্ষণ পরে হোটেলের মালিক হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বলল—এই যে, তোমরা এসেছ।

তারপর আমাদের ভিতরে ডেকে নিয়ে বললে—তোমাদের কিছুই করতে হবে না—শুধু সকালবেলা স্টেশনে গিয়ে ক্যালকাটা মেল থেকে প্যাসেঞ্জার ধ'রে নিয়ে আসবে। দু'-চারদিন বাদে তোমাদের নামে লাইসেন্স করিয়ে দেব, তখন মাইনের কথা ঠিক হবে। এখন খালি খেতে পাবে। কি? করবে কাজ?

আমরা বললুম—আজ্ঞে, করব।

মালিক রান্নাঘরের দু'জন লোককে ডেকে নিয়ে এসে আমাদের দেখিয়ে দিয়ে বললে—আজ থেকে এই দু'জন লোক দু'বেলা খাবে, দু'বেলা চা-ও খাবে। এদের পেট ভ'রে, যত খুশী এরা খেতে পারে, খাওয়াবে। বুঝলে? হোটেলের বাইরে একটুখানি বারান্দা-মতো ছিল। মালিক আমাদের সেইখানে নিয়ে এসে বললে—এইখানে রাত্তিরে শোবে। এগারোটার সময় হোটেলের দরজা বন্ধ হয়ে যাবে—তখন আর তোমরা ভেতরে ঢুকতে পাবে না।

বারান্দায় একখানা তক্তাপোশ পাতা ছিল। আমরা দু'জনে ব'সে ব'সে ভাবতে লাগলুম কালীকে এইরকম একলা ছেড়ে দেওয়াটা ভালো হল কিনা। ভাবতে ভাবতে একঘণ্টা-দু'ঘণ্টা কেটে গেল—কিছু ঠিক করতে পারলুম না।

ইতিমধ্যে রান্নাঘর থেকে লোক এসে ডাকলে—চল, খাবে চল।

কথাটা কানে যেন মধুবর্ষণ করলে। তার সঙ্গে সঙ্গে রান্নাঘর অবধি পৌঁছনো গেল।

এইখানে রান্নাঘরের বিবরণ কিছু দেওয়া দরকার মনে করছি। আজকের এই বিজ্ঞানের যুগে কোনো প্রথম শ্রেণীর হোটেলের রান্নাঘরে যদি কেউ হঠাৎ গিয়ে উপস্থিত হয়, তা হ'লে তার খাবার প্রবৃত্তি তখনকার মতো উবে যাবে। আর আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে সেই হোটেলের রান্নাঘরের অবস্থা কি ছিল তা যতটুকু স্মরণে আছে তা বলছি।

রান্নাঘরটি বেশ বড় হ'লেও জিনিসপত্রে ঠাসা হয়ে এমন অবস্থায় দাঁড়িয়েছে যে, দাঁড়াবার জায়গাটি নেই। ঘরটিকে আধা-আধি ভাগ করা হয়েছে। দেওয়ালের গায়ে চারটি উনুন—তাতে কাঠকয়লার আগুন গনগন করছে। চারটে বড় বড় ডেক তাতে চাপানো। অ্যালুমিনিয়াম জিনিসটা তখনও ওঠেনি কিংবা জাতে ওঠেনি। ডেক্‌চিগুলো সব পেতলের—তার ওপরে কলাই-করা।

একটা লোক রান্না করছে। সে যে কোন্‌ দেশের কিংবা কি জাতের, তা বুঝতে পারা গেল না। তিন-চারটে ছেলে তাকে সাহায্য করছে। ছেলেরা তাকে 'মিস্তিরী' ব'লে সম্বোধন করছে। একদিকে একতাড়া হাতে-গড়া রুটি প'ড়ে রয়েছে। তার ওপর ছোট-বড় লাল কালো সাদা আরশোলার দল ভ্রমণ ক'রে বেড়াচ্ছে। একটা ডেকে কিমা, আরেকটাতে ডাল, বিরাট একটা থালায় ঢ্যাঁড়সের তরকারি আর ঐরকম আর-একটা থালায় চাঁদামাছ-ভাজা স্তূপীকৃত। একটা ডেক্‌চিতে ভাতও চূড়ো-করা, তাতে মাছি ভনভন করছে—সবগুলি ডেক-ডেক্‌চিরই মুখ খোলা, গোটাকয়েক বেড়াল চোখ বুজে ব'সে আছে। ঘরের আর-একদিকে বিরাট কাঠকয়লার পাহাড়, বাসনপত্তর সাজানো, ঝাঁটা ইত্যাদি রাজ্যের জঞ্জাল ও জঞ্জালসাফের যন্ত্র।

যে ছেলেটি আমাদের ডেকেছিল, সে আমাদের বললে—একটা ক'রে প্লেট নিয়ে ব'সে যাও।

আমরা একটা ক'রে প্লেট নিয়ে ব'সে গেলুম।

প্রথমেই দু'টো ক'রে চাপাটি আর এনামেলের চামচে-হাতার এক হাতা ক'রে

সিদ্ধী ডাল। আমি সবায়ের অলক্ষিতে আধখানা রুটি খানিকটা ডালে জড়িয়ে পকেটে পুরে ফেললুম।

পকেটে ভরে ফেলে আবার খাবার দিকে মন দিলুম। ওদিকে পাতে চাপাটি পড়ামাত্র পরিতোষ একটা চাপাটি পকেটে ভরে ফেললে। আমাদের যে-ছেলেটা পরিবেশন করছিল সে বোধ হয় পরিতোষের কাণ্ড দেখতে পেয়েছিল, কেননা তার চোখে মুখে সন্দেহের ছায়া ফুটে উঠেছিল। যাই হোক, সেই রুটি আর ডাল—'তাতল সৈকতে বারিবিন্দু-সম' উবে গেল। কতদিন যে এই খাবার খেতে পাইনি তার ঠিকানা নেই। পাত খালি দেখে এবার তিনখানা ক'রে চাপাটি ও আরো খানিকটা ডাল এল। মিস্তিরী ছেলেটাকে বললে—ওদের তরকারি, কিমা—এইসব দাও।

আরো চাপাটি, তরকারি, কিমা এসে হাজির হতে লাগল। ওদিকে হয়েছে কি, একটি ঝিমায়মান মার্জারতনয় গুটিগুটি অগ্রসর হতে হতে সকলের অলক্ষ্যে টপ্ ক'রে একখানা মাছ তুলে নিয়ে দূরে পালিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে মিস্তিরী উনুন থেকে রুটি তোলবার চিমটেখানা নিয়ে ছেলেটাকে এক ঘা বসিয়ে দিলে। বিনা বাক্যব্যয়ে আবার এখানকার সংসার চলতে লাগল।

কিছুক্ষণ বাদে পেট ও পকেট দুই-ই ভর্তি হওয়ায় আমরা উঠে পড়লুম। মিস্তিরী বললে—চারটের সময় চা হবে।

আমরা সেখান থেকে উঠে বাথরুমে ঢুকে কলে জল খেয়ে মুখ ধুয়ে বেরিয়ে পড়লুম নবাব-বিল্ডিং-এর উদ্দেশে।

বেলা বারোটা—রোদ্দুর ঝাঁ-ঝাঁ করছে। নবাব-বিল্ডিং-এর তেতলায় উঠে দেখি কালী ইজি-চেয়ারে শুয়ে ঘুমোচ্ছে—বিষণ্ণ মলিন মুখ, শরীর প্রায় আধখানা হয়ে গিয়েছে। আমরা তাকে ডেকে পকেট থেকে খাবার বার ক'রে দিলুম।

অনেকদিন পর খাবার পেয়ে কালী একেবারে গোগ্রাসে গিলতে আরম্ভ করল। কিন্তু সে সবটা খেতে পারলে না। খান-দুয়েক রুটি ও কিছু তরকারি রেখে দিয়ে বললে—পরে খাব।

বিকেলবেলা আমরা চা খেতে চ'লে গেলুম, কালীকে ব'লে গেলুম—একেবারে খাবার নিয়ে আসব।

রাত্রি প্রায় দশটার সময় আমাদের খাবারের ডাক পড়ল। দুই বন্ধুতে দুই পকেট ভর্তি ক'রে কালীর জন্য খাবার নিলুম। কিন্তু হোটেল থেকে বেরুতে

গিয়ে দেখি—দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। চাবি মালিকের কাছে—সে খেয়ে ঘুমোচ্ছে। অতএব এবং অগত্যা সেই নিরাবরণ তক্তাপোশে গা ঢেলে দিলুম।

পরের দিন যথাসময়ে স্টেশনে গিয়ে জন-চার-পাঁচ বাঙালী ভদ্রলোক নিয়ে এলুম। মালিক খুব খুশী। ভদ্রলোকদের থাকবার জায়গা-টায়গাগুলো ঠিকঠাক ক'রে দিয়ে ছুটলুম কালীর কাছে। কালী বললে—রাত্রে কিছু কষ্ট হয়নি; ঐ দু'খানা রুটি খেয়েই কাটিয়েছি।

নতুন রসদের ভাণ্ডার তার কাছে খুলে দেওয়া গেল। সে রেখে দিয়ে বললে—এখন থাক্।

এগারোটা অবধি বাস্তায় রাস্তায় ঘুরে খাবার সময় হোটেলে গিয়ে উপস্থিত হলুম।

দিনকয়েক এমনিভাবেই খেয়ে বেড়িয়ে কাটল।

কিন্তু ভাগ্যনদীতে দিনকয়েক জোয়ার এসেই আবার ভাঁটার টানে যে-কে-সেই হয়ে দাঁড়াল। কলকাতা-মেলে বাঙালী যাত্রী বিরল থেকে বিরলতর হয়ে উঠল। আমরা আর লোক ধরতেই পারি না।

দিন-কতক এইরকম দেখে হোটেলের মালিক আমাদের ডেকে বললে—একটু মন দিয়ে কাজকর্ম দেখ। লোক না আনতে পারলে হোটেল চলবে কি ক'রে? বসিয়ে বসিয়ে তো আর খাওয়ানো চলবে না।

ভাবতে লাগলুম।

কিন্তু লোক আনি কোথা থেকে?

এইরকম চলেছে—এই সময় একদিন সকালবেলা আমরা হর্নবী রোড ধরে যাচ্ছি—এমন সময় অপর ফুটপাথ থেকে একটি পার্শী ভদ্রলোক হাততালি দিয়ে আমাদের দাঁড়াতে বললে। ভদ্রলোকটি কালীকে ইংরেজীতে জিজ্ঞাসা করলে—তোমার নাম কি?

কালী নাম বললে। লোকটি বললে—তোমার কোনো ভাই কলকাতায় রেলী-ব্রাদার্সে চাকরি করে।

—হ্যাঁ, করে।

—কি তার নাম?

কালী নাম বলতেই সে বললে—ঠিক আছে। তোমার ভাই ও আমি এক-সঙ্গে কাজ করি। বোম্বাই আসছি শুনে তোমার ভাই আমাকে বলেছিল তোমার সঙ্গে যদি দেখা হয় তো তাকে নিয়ে এসো। আমি তখন বললুম—তাকে আমি

চিনব কেমন ক'রে ? সে তোমার চেহারার বিবরণ দিয়ে ব'লে দিলে যে, দেখলেই চিনতে পারবে। ঠিকই সে বলেছিল। তোমাকে দেখেই আমি চিনতে পেরেছি। কলকাতায় যাবে ?

কালী ইতস্তত করেছিল। আমরা তার হয়ে জবাব দিলুম—হ্যাঁ—যাবে যাবে—

—তা হ'লে কাল বেলা দশটা নাগাদ আমার বাড়িতে গিয়ে দেখা করবে।

ভদ্রলোক তাঁর ঠিকানা দিয়ে গেলেন।

পরদিন সকালবেলায় স্টেশনের কাজ শেষ ক'রে কালীকে নিয়ে চললুম সেই ভদ্রলোকের বাড়ি। ফোর্ট অঞ্চলে একটি নির্জন গলিতে বাড়ি। দোরগোড়ায় একজন লোকের সঙ্গে দেখা হতে সে বললে—চ'লে যান দোতলায়—তিনি ঘরে ব'সে আছেন।

পার্শীর বাড়ি।

তক্‌তকে ঝক্‌ঝকে, কোথাও একটু মালিন্য নেই।

সিঁড়ি থেকে আরম্ভ ক'রে ঘরের দরজা চৌকাঠ অবধি ছাপা আল্‌পনা দেওয়া। ঘরের বাইরে গিয়ে বললুম—ভেতরে আসতে পারি কি ?

তখুনি সেই ভদ্রলোক দরজার কাছে এসে আমাদের অভিবাদন ক'রে ভেতরে নিয়ে এলেন।

ছোট্ট ঘর। কম আসবাবপত্রে সুন্দর ক'রে সাজানো। দেওয়ালে এক জায়গায় ভগবান জরাথুস্ত্রের ছবি। তারই নিচে একটি অনির্বাণ দীপ জ্বলছে। খানকয়েক সোফা, তার একটিতে দু'টি মহিলা আর তারই পাশের একটি গদি-আঁটা চেয়ারে একটি বৃদ্ধা ব'সে আছেন। আমাদের ভদ্রলোকটি ঘরের মধ্যে ঢুকেই গুজরাটী ভাষায় মহিলাদের বললেন—এই এঁরাই বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছেন।

আমরা সেই সোফায় বসতে সঙ্কুচিত হচ্ছি দেখে মহিলাদের মধ্যে একজন বললেন—বোসো, বোসো।

বস্তুত আমাদের চেহারা ও বসন এই পরিবেশের মধ্যে খাপ খাচ্ছিল না ব'লে আমরা বসতে সঙ্কুচিত হচ্ছিলুম। আমরা বসতে-না-বসতেই প্রশ্নের বাণ বর্ষিত হতে শুরু হল—এরকম ক'রে বাড়ি থেকে কখনো পালাতে আছে ? বাড়ি থেকে পালালে কেন ? কে কে আছেন বাড়িতে—ইত্যাদি।

ভদ্রলোক বললেন—কাল বেলা সাড়ে তিনটের সময় নাগপুরের গাড়িতে

আমি কলকাতায় যাব। সকালবেলাতেই আমি টিকিট কিনে রাখব। তুমি এসে তোমার টিকিটখানা নিয়ে যাবে।

তারপর ভদ্রলোক পাঁচটি টাকা কালীর হাতে দিয়ে বললেন—যদি এখানকার কিছু খরচপত্র থাকে তো এই নাও।

টাকা পেয়ে আমরা তখুনি উঠে পড়লুম।

শেঠজীর বাড়ি থেকে বেরিয়ে কালী তিনটে টাকা আমাদের দিয়ে বললে—এটা তোরা রাখ্। পথের খরচা আমি এই দু'টাকাতেই চালিয়ে নেব।

মনে পড়ে সেদিন প্রথম কাঁচি-সিগারেটের প্যাকেট কিনে তিনজনে তিনটে আগেই ধরিয়ে ফেলা গেল। এই জাতকের গোড়াতেই বলেছি যে কালী হুঁকো টেনে নতুন কল্‌কে ফাটিয়ে দিতে পারত। সেই কালী কতদিন সিগারেটের আস্বাদ পায়নি। সে পরমানন্দে এক এক টানে মুখ দিয়ে ইঞ্জিনের মতন ধোঁয়া বার করতে লাগল।

যাই হোক, পরদিন সকালবেলা স্টেশনের কর্তব্য সমাধা ক'রে আমরা শেঠজীর ওখানে গেলুম। তিনি আগেই টিকিট কিনে রেখেছিলেন। একখানা থার্ড ক্লাসের বি.এন.আর.-এ হাওড়ার টিকিট কালীকে দিয়ে বললেন—যথাসময়ে গিয়ে ট্রেনে চড়বে। ঐ ট্রেনে আমিও যাচ্ছি কলকাতায়—দেখা হবে। আর এই পাঁচটা টাকা নাও—পথে খাওয়া-দাওয়া ও অন্য খরচের জন্য।

এই পাঁচটাকা থেকেও কালী আমাদের তিনটে টাকা দিলে। বেলা প্রায় চারটের সময় কলকাতা-যাত্রী গাড়িতে কালীকে চড়িয়ে দিলুম। সেই গাড়িতেই সেকেণ্ড ক্লাসে শেঠজীও গেলেন। ধীরে ধীরে চোখের সামনে দিয়ে ট্রেনখানা প্ল্যাটফরম থেকে বেরিয়ে গেল।

কালী চ'লে যেতেই মনটা অত্যন্ত খারাপ হয়ে গেল। আমরা ধীরে ধীরে সমুদ্রের দিকে পা চালিয়ে দিলুম।

কালীর কথাই থেকে-থেকে মনের মধ্যে উঠছিল। সে বরাবরই হাসিখুশি আত্মভোলা লোক। কিন্তু কলকাতায় বাড়ির খাবার খেয়ে, বাড়ির যত্ন পেয়ে বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে হাসিখুশি থাকা এক কথা, আর নিত্য অনাহার, অর্ধাহার, অপমান এবং যতরকম ক্লেশকর অবস্থা হতে পারে তা সহ্য ক'রে হাসিখুশি থাকা আর এক কথা।

মনে পড়তে লাগল আমাদের অরণ্যবাসের সময় প্রতিদিন অর্ধাহার তো ছিল, কোনো কোনো দিন অনাহারেও কেটেছে। সন্ধ্যেবেলায় কর্মাবসানে এক এক

দিন শরীরের এমন অবস্থা হ'ত যে, সেখান থেকে তিন মাইল দূরে ইস্টিশনে গিয়ে একমুঠো ছোলাসেদ্ধ ও চালভাজা খেয়ে রাত্তিরে ফেরবার সময় জঙ্গলে জানোয়ার বেরিয়ে পড়ত। সেই জীবনমৃত্যুর সন্ধিক্ষণে ক্লান্ত ও অনাহারক্লিষ্ট গলায় কালী এক এক দিন গান ধরত—

"কি ছার আর কেন মায়া
কাঞ্চন-কায়া তো আর রবে না—
দিন যাবে তো দিন রবে না—
কি হবে তোর তবে—
আজ পোহাবে কাল কি রবে" ইত্যাদি।

কালীর সেই গান শুনে কান্নার বদলে আমরা হেসে ফেলতুম। ভাবতে ভাবতে অনেকখানি পথ চ'লে এসে আমরা সমুদ্রের ধারে এসে পড়লুম।

বোম্বাইয়ে এসে এই জায়গাটির সঙ্গে আমাদের খুবই ভাব জমে গিয়েছিল। সমস্ত দিন, এমনকি রাত্তিরেও অনেকসময় আমরা এখানেই কাটাতুম। জুতো-চুরির পর এদিক থেকে স'রে পড়তে হয়েছিল।

তখনকার এই শান্ত সমাহিত ও জনবিরল সমুদ্রতটের সঙ্গে আজকের এই মুখর ও ঘটনাবহুল চৌপাটীর কোনো তুলনাই হয় না। সমুদ্র-উপকূলে একটুখানি ঘাটের মতো করা ছিল আর পেছনেই ছিল সমুদ্রকে বেষ্টন ক'রে বেড়াবার জন্য একফালি সরু রাস্তা এবং এই রাস্তার ধারে ধারে ভারী লোহার বেঞ্চি সার বেঁধে সাজানো ছিল আর তারপরেই ছিল চার্চগেট স্টেশন অবধি তৃণাচ্ছাদিত সুন্দর ময়দান।

সন্ধ্যের পরই এইসব বেঞ্চিতে আমরা শুয়ে পড়তুম।

বোম্বাই এসে এই জায়গাটিকেই আমরা ঘরবাড়ি ক'রে তুলেছিলুম। অন্ধকারে জনশূন্য প্রান্তরে সেই বেঞ্চিতেই শুয়ে শুনতুম একদিকে মহানগরীর ক্ষীণ জন-কল্লোল অন্যদিকে মহাসমুদ্রের সঙ্গীতময়ী কলধ্বনি—আর এদের সঙ্গে মিলিত হ'ত আমাদের অন্তরের আশা ও ভবিষ্যতের চিন্তা। পায়ে পায়ে এসে সমুদ্রের ধারে সেই ঘাটের মতো জায়গাটিতে এবার আমরা ব'সে পড়লুম।

দেখতে দেখতে বেলা প'ড়ে যেতে লাগল। বৃদ্ধ ও প্রৌঢ় পার্শী নর-নারীরা সেই জায়গাটিতে এসে অস্তমান দ্যুমণিকে প্রণাম জানাতে লাগল। কোমর থেকে পৈতে খুলে জলে ভিজিয়ে আবার তা কোমরে জড়িয়ে নতুন গ্রন্থি দিয়ে আবার শহরের দিকে ফিরে যেতে লাগল। আমাদের পেছনে একদল ফুলের মতো শিশু

খেলা করছিল—মাথায় তাদের জরির-কাজ-করা ভেলভেটের গোল টুপি—ছুটতে ছুটতে তারা হাসাহাসি ক'রে এ ওর গায়ে ঢ'লে পড়ছিল আর তাদের পেছনের বেঞ্চিগুলিতে এখানে সেখানে দু'টি-চারটি ক'রে নরনারী ব'সে গল্প করছিল।

সেদিনের সেই সন্ধ্যাটি আমার স্মৃতির কোন্ অতলে লুকিয়েছিল; আজ মানসপটে তা স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে। সঙ্গে সঙ্গে এ-কথাও মনে হচ্ছে যে সেদিন যাদের দিনমণিকে প্রণাম করতে দেখেছিলুম আজ তারা কোথায়! সেই যে ফুলের মতো ছোট ছোট শিশুগুলি আমাদের পিছনে কোলাহল করছিল তারাই বা আজ কোথায়! নিজের সম্বন্ধেও প্রশ্ন উঠেছে—ওরে স্থবির! তুই বা কোথায় এসেছিস্? পথের সন্ধান কি হয়েছে? কি আছে পথের শেষে?

ব'সে থাকতে থাকতে আমাদের চারদিকে অন্ধকার ঘনিয়ে উঠতে লাগল। সময়ের কোনো জ্ঞানই ছিল না। কখন লোকজন সব ফিরে গিয়েছে—শহরের জন-কল্লোল ক্ষীণতর হয়েছে, তা বুঝতেই পারিনি। হঠাৎ আমাদের চমকে দিয়ে দূরে রাজাবাই টাওয়ারের ঘণ্টা-ঘড়ি বেজে উঠে জানিয়ে দিলে—সময়মত পৌঁছতে না পারলে হোটেলের দরজা বন্ধ হয়ে যাবে।

অবশ্য হোটেলের দরজা আমাদের জন্য বেশিদিন খোলা থাকেনি। প্রতিদিন সকালে উঠে কলকাতা-মেল ধরতে স্টেশনে ছোটা—তারপর খদ্দের জুটিয়ে না আনতে পারায় হোটেলের মালিকের মুখভঙ্গি আমাদেরও আর ভালো লাগছিল না। ইতিমধ্যে মিস্তিরীর দরাজ হাতও ক্রমশ কমতে কমতে ক্রমে কিমা, ঢ্যাঁড়শের তরকারি, এমনকি রুটির ওপরেও কামড় বসালে। তারপর একদিন মালিকের নির্দেশেই আমাদের দরজা দেখিয়ে দিলে।

আমরাও বেঁচে গেলুম।

বেঁচে তো গেলুম—কিন্তু এখন আসল বাঁচার উপায় কি?

দুই বন্ধুতে মিলে নিত্যকার মতো সমুদ্রের ধারে এসে বসলুম পরামর্শ করতে।

আজ থেকে পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে বোম্বাই শহর ছিল অন্যরকম। এই সময়ের মধ্যে তার আঙ্গিক, মানসিক ও সামাজিক পরিবর্তন যা হয়েছে তা দেখে সে-সময়ে কি ছিল তার আন্দাজ করা যাবে না। সে-সম্বন্ধে কিছু বললে হয়তো এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

আজ যেখানে মেরিন ড্রাইভের চওড়া রাস্তা ও প্রাসাদের মতো বড় বড় বাড়ি দেখা যাচ্ছে সেসব জায়গা ছিল সমুদ্রগর্ভে। এত নাম-করা ব্র্যাবোর্ন স্টেডিয়াম—তাও ছিল জলের মধ্যে। বাড়ি-ঘরের এমন বাহার ছিল না বললেই হয়। বড় বড় পাঁচতলা-ছ'তলা হেলে-পড়া বাড়ি। মাথায় খোলার চাল। সেগুলোকে বলা হ'ত চৌল। তাতে সব রকমেরই লোক অসংখ্য বাস করত। হিন্দুরা প্রকাশ্যে মাছ-মাংস খেত না, তা তিনি মহারাষ্ট্রীয়ই হন বা গুজরাটীই হন। কোনো হিন্দু ইরানীর দোকানে ঢুকত না।

তখনকার দিনে বোম্বাই শহরে হামেশাই এখানে-সেখানে আগুন লাগত। মাথায় টুপিবিহীন লোক রাস্তায় চলতে দেখলে লোকেরা দাঁড়িয়ে তাদের দেখতে থাকত। আমাদের মাথার টুপি নেই দেখে কতবার যে পুলিস-কনস্টেবল ধ'রে নিয়ে গিয়েছে থানায় তার ঠিকানা নেই। আরো কত বলব!

আমরা একবার শুনলুম—কোনো বিশেষ একটি চৌলে একজন বাঙালী ভদ্রলোক থাকেন। তিনি এখানে বড় চাকরি করেন। ভদ্রলোক অত্যন্ত দয়ালু এবং কোনো বাঙালী সাহায্যপ্রার্থী হয়ে গেলে কখনো তাকে নিরাশ করেন না।

এমন দুর্লভ সংবাদ বহুদিন শুনিনি। রাত্রি পোয়াতে-না-পোয়াতে আমি আর পরিতোষ চললুম সেই বাড়ির উদ্দেশে। শহরের এক কোণে হেলে-পড়া একটা চৌল, তারই পাঁচতলায় থাকেন ভদ্রলোক সপরিবারে। বাড়িটাতে গুজরাটী বেশি। একতলায় দোকানপত্র আছে।

জিজ্ঞাসা ক'রে ক'রে পাঁচতলায় গিয়ে উঠলুম। দরজাটা খোলা ছিল। উঁকি মেরে দেখলুম দূরে একটা ঘরে বোধ হয় একখানা 'সাপ্তাহিক বসুমতী' পেতে তার ওপরে উপুড় হয়ে প'ড়ে ভদ্রলোক কাগজখানা পড়ছেন।

আমরা দু'জন হা-পিত্যেশ ক'রে সেই দিকে তাকিয়ে রইলুম। কালো রোগা লম্বা-মতন চেহারা। হঠাৎ একবার মুখ তুলে আমাদের দিকে চোখ পড়তেই তক্তাপোশ ছেড়ে আমাদের দিকে এগিয়ে আসতে আসতে বলতে লাগলেন—এসেচো বাবা! এই ছ'মাস হল দু'টোকে বিদেয় করেচি। আবার দুই মূর্তি হাজির। দেশে কি দুর্ভিক্ষ লেগেছে? কোথায় বাড়ি?

আমরা বললুম—আজ্ঞে, বর্ধমান জেলার কাটোয়া সাব-ডিভিসনে।

এমন সময় কোনো এক ঘর থেকে নারীকণ্ঠের আওয়াজ শুনতে পাওয়া গেল। ভদ্রলোক সেইখান থেকেই চেঁচিয়ে উত্তর দিলেন—আজকাল জোড়ায় জোড়ায় আসচে।

এবার নারীকণ্ঠ স্পষ্টতর হয়ে উঠল—কোঁতায়? দেঁকি—ইঁদিকে পাঁটিয়ে দাঁও।

ভদ্রলোক বললেন—ওই ঘরে যাও। গিন্নী ডাকছেন।

গুটিগুটি সেই ঘরে গিয়ে ঢুকলুম। একটি নারী—বয়স চব্বিশ-পঁচিশ হবে। রঙ ফরশা, স্বাস্থ্যবতী ব'লেই মনে হল। কোঁকাতে কোঁকাতে প্রতিটি শব্দের আদিবর্ণে একটি ক'রে অনুনাসিক যোগ ক'রে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন—কি জাত?

বললুম—আজ্ঞে, আমরা সচ্চাষী।

—দুইজনেই কি এক জাত?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, এ আমার মাসতুতো ভাই।

—রাঁধতে-বাড়তে জানো?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, ডাল ভাত চচ্চড়ি—এই গেরস্ত বাড়ির রান্না।

—ব্যস! সোজা চ'লে যাও ওই রান্নাঘরে। চাল-ডাল আছে। মশলা-পাতি বেটে নাও। বাড়ির কর্তা দশটায় আপিস যান। ওঁকে রোজ ঠিক সময়ে ভাত দিতে পারবে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, পারব।

—তো ব্যস্—গিয়ে শুরু কর। অন্য কথা পরে হবে। আমাকে যখন হয় খেতে দিও।

ফ্ল্যাটের রান্নাঘর। বেশ গুছোনো। উনুনের জায়গা রান্নাঘরের মধ্যেই। কল, ছোট চৌবাচ্চা, কয়লা রাখবার জায়গা—সবই বেশ গুছোনো। আমরা কেরোসিন তেল যোগাড় ক'রে তখুনি উনুনে আগুন ধরিয়ে দিলুম। বাড়ির গিন্নী তখনো শুয়ে। গিয়ে বললুম—মা, চাল-ডাল মশলা-পাতি কোথায় আছে?

—হতভাগারা সেই ওটালে তবে ছাড়লে— ব'লে দশ মিনিট ধ'রে চেষ্টা ক'রে উঠলেন। তারপর আমাদের সঙ্গে বেরিয়ে এসে চাল-ডাল তেল-নুন ইত্যাদি সব দেখিয়ে দিয়ে ক্যাঁকাতে ক্যাঁকাতে পাশেই চানের ঘরে মুখ ধুতে লাগলেন।

কাঠকয়লার উনুন, ধরতে সময় লাগল না। চাল ধুয়ে চড়িয়ে দিয়ে মশলা-বাটা ও অন্যান্য কাজে মন দিলুম। গিন্নী ততক্ষণে আবার শুয়ে পড়েছেন। খানিকক্ষণ বাদে গিন্নীর গলার আওয়াজ শুনতে পেলুম। চ্যাঁ চ্যাঁ ক'রে চেঁচিয়ে বলছেন—এই—এই—এই—

কাছে গিয়ে দেখি কর্তাও সেখানে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি আমাকে বললেন—ও কোথায়, ডেকে নিয়ে এসো—

পরিতোষকে ডেকে আনলুম। কর্তা বললেন—দেখো, আমাদের সংসার ছোটো কিন্তু কাজ অনেক। রান্না-করা বাসন-মাজা ঘর-ঝাঁট-দেওয়া। সব এখন মনে পড়ছে না—সব কাজই করতে হবে। খাবে-দাবে আর ওইখানে বিছানা ক'রে শুয়ে থাকবে। মাইনের নামটি কোরো না। বুঝলে ?

বুঝলুম, এবং বুঝে ফিরে যাচ্ছিলুম। এমন সময় গিন্নী আবার চ্যাঁ চ্যাঁ ক'রে জিজ্ঞাসা করলেন, কি নাম— ?

বললুম—আমার নাম প্রফুল্ল ঘোষ আর এর নাম বিশ্বনাথ সুর।

বন্ধু পরিতোষ নির্বিকার। সে তখন কানে একবারেই শোনে না। এই নামের সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য একতলায় না গিয়ে আর উপায় নেই। তবে সে ছিল ইঙ্গিতজ্ঞ। দু'-চারবার 'বিশে' 'বিশে'—'বিশ্বনাথ' ব'লে ডাকতেই নতুন নামকরণ বুঝতে পারল।

ওদিকে ভাত ফুটে গেল। আলোচাল একটু তাড়াতাড়ি সেদ্ধ হয়। ডাল চাপিয়ে দেওয়া গেল, কাঁচামুগের ডাল। সে আর হতে কতক্ষণ! ততক্ষণে কর্তা চানটান ক'রে জিজ্ঞাসা করলেন—কি রে, রান্না রেডি ?

বললুম—আজ্ঞে, রেডি। আপনি ঘরে বসুন, সেইখানেই নিয়ে যাচ্ছি।

—আচ্ছা।

কর্তা তাঁর কামরায় চ'লে গেলেন। ভাত বেড়ে বাটিতে ডাল আর গেলাসে জল নিয়ে ঘরে গেলুম। কর্তার দেখলুম এঁটো কিংবা সকড়ির বালাই নেই। তিনি তক্তাপোশের ওপরে ব'সেই খেতে আরম্ভ ক'রে দিলেন। প্রথম গ্রাস মুখে তুলেই তিনি বললেন—এ তো বেড়ে রেঁধেছিস রে !

বললুম—আজ্ঞে, ঘরে কিছু নেই—রাঁধতে পারলুম না। আজকে বাজারে গিয়ে তরকারি আর ডাল কিনে নিয়ে আসবো।

কর্তা বললেন—বলিস কি ? তরকারি রাঁধবি ?

—আজ্ঞে, চেষ্টা ক'রে দেখবো। দেখুনই না।

কর্তা কোট প'রে বিড়ি ধরিয়ে গিন্নীর ঘরে ঢুকে কি-সব ব'লে আপিসে বেরিয়ে গেলেন। তিনি চ'লে যাবার পর রান্নাঘর গুছিয়ে দু'জনে গিন্নীকে গিয়ে বললুম—মা, এখন কি খাবেন ?

তিনি বললেন—না, চান করবো, মুখ ধোবো, আমার খেতে সেই বারোটা।

—তা হ'লে আমাদের কিছু পয়সা দিন, আমরা বাজার থেকে তরকারি কিনে নিয়ে আসি।

গিন্নী বললেন—তরকারি রাঁধতে পারবি তো? কিসের তরকারি রাঁধবি?

—আলু-পটলের ডালনা।

গিন্নী কপালে করাঘাত ক'রে বললেন—একি তোদের বর্ধমান পেয়েচিস? এদেশে কি পটল পাওয়া যায়?

—পটল না পাওয়া যায় অন্য তরকারি তো আছে?

গিন্নী মাথার তলা থেকে একটা টাকা বার ক'রে দিয়ে বললেন—যাবার সময় দরজাটা বন্ধ ক'রে দিয়ে যাস। আর দু'জনে যাচ্ছিস—একটু তাড়াতাড়ি ফিরিস।

বাজারে যেতে যেতে দু'জনে পরামর্শ করা গেল। ভগবান যখন দিন দিয়েছেন তখন তার সদ্ব্যবহার করতে হবে, আবার কবে তিনি পথে দাঁড করাবেন কিছুই তার ঠিক নেই। পথে দু'জনে মিলে স্থির করলুম যে দৈনিকের নানান কাজে অন্তত আট আনা পয়সা সরিয়ে রাখতে হবে।

সেদিন বাজার ক'রে ফিরে গিন্নীকে খাইয়ে নিজেরা খেয়ে সারা দুপুর ধ'রে ঘরদোর ঝেঁটিয়ে জিনিসপত্র ঝেড়ে ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে ক'রে ফেললুম। আমাদের কাজ দেখে গিন্নীর সদাক্লিষ্ট মুখ খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তারপর সেদিন রাত্রে কর্তাগিন্নী আমাদের আলুর দম খেয়ে প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠলেন।

মোট কথা, ক'দিনেই আমরা তাঁদের একান্ত প্রয়োজনীয় হয়ে তো উঠলুমই, তার সঙ্গে আমাদের ব্যাঙ্কও বেশ মোটা হতে লাগল।

আমাদের অন্নদাতার নাম সদানন্দ বিশ্বাস। ভদ্রলোক সেখানে একটা বিলিতী ওষুধের আপিসে পাম্ফ্‌লেট লিখতেন। ইংরেজী বাংলা গুজরাটী মারাঠী ও হিন্দী ভাষায় তাঁর সমান দক্ষতা ছিল। আপিসে বেশ মোটা মাইনে পেতেন। তা ছাড়া ইন্সিওরেন্সের দালালি করতেন—তাতেও তাঁর ভালো রোজগার ছিল। ছুটির দিনে তাঁর আর নাইবার-খাবার সময় থাকত না। কাপড়-চোপড়েরও কোনো বাবুয়ানি ছিল না। ধুতি কোট ও দু'জোড়া জুতো ছিল তাঁর—যাতে কখনো কালি পড়ত না। আমরা এসে তার সংস্কার করলুম। দু'টো পেণ্টুলান ছিল, বিশেষ বিশেষ দিনে সেগুলো পরতেন। সদানন্দ তাঁর নাম ছিল বটে, কিন্তু তিনি কেন জানি না সদাই নিরানন্দ থাকতেন। সন্ধ্যেবেলা বোতল-গেলাস নিয়ে বসতেন। এই সময়টা তাঁকে একটু প্রফুল্ল দেখতে পাওয়া যেত। তাঁর এই সান্ধ্য-আসরে গুজরাটী, মারাঠী ও বাঙালী অনেকেই এসে জুটতেন। এইসব দিনে আমাদের অন্নদাতার প্রফুল্লতার মাত্রা একটু বেড়ে যেত।

এই আসরে একটি বাঙালী ভদ্রলোক মাঝে মাঝে আসতেন এবং শ্যামা-সংগীত গাইতেন। ভদ্রলোকের কণ্ঠস্বর ছিল মধুর এবং গানগুলিও আমাদের ভালো লাগত। প্রত্যেক গানের আগে ভদ্রলোক 'ম্যা ম্যা' ব'লে খানিকক্ষণ ভীষণ চেঁচাতেন। আমরা যে পরিবেশে জন্মেছিলুম সেখানে শ্যামা-সংগীতের বিশেষ প্রচলন ছিল না। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেখেছি—শ্যামা-সংগীত গাইবার আগে ওইরকম দু'-চারবার 'ম্যা ম্যা' ব'লে 'চিকুর পাড়া'র রীতি আজও প্রচলিত আছে।

কর্তার এইসব সান্ধ্য-আসরের জন্য আমরা মাঝে মাঝে ইরানীদের দোকান থেকে মাছ-মাংস কিনে এনে দিতুম। এইসব আহার্যে গিন্নীও বঞ্চিত হতেন না। মৎস্য-মাংসে তো বটেই—নিষিদ্ধ-মাংসেও তাঁর অরুচি ছিল না।

আমাদের এইরকম কর্তাভজা ভাব দেখে মনিব-মশাই খুশি হয়ে প্রথম মাসেই আমাদের দু'টাকা ক'রে মাইনে ঠিক ক'রে দিলেন। হোটেলে কাজ করবার সময় সকাল দশটা অবধি স্টেশনে থাকতে হ'ত—তারপর সারাদিন ছিল ছুটি। এই অবসরের অধিকাংশ সময়ই আমরা রান্নাঘরে কাটাতুম। হোটেলে দু'বেলা কিমা রান্না হ'ত এবং এই বস্তুটি আমাদের খুবই প্রিয় ছিল। রান্না দেখে দেখে আমরাও কিমা তৈরি করতে শিখেছিলুম।

একদিন গিন্নীর কাছে কিমা রাঁধবার প্রস্তাব ক'রে ফেললুম। গিন্নী তো প্রথমে শুনেই শিউরে উঠলেন এবং বললেন—ওরে বাবা, এ-বাড়িতে এসব চলবে না।

আমরা বললুম—কেউ টের পাবে না, কিছুই গন্ধ বেরুবে না।

কর্তা আমাদের প্রস্তাব শুনে নিমরাজী হয়ে গেলেন। ব্যস্, আর যায় কোথায়! একদিন কর্তাগিন্নীকে না জানিয়ে আমরা বোম্বাই-একসের অর্থাৎ আটাশ তোলা কিমা এনে দুপুরবেলা চড়িয়ে দিলুম।

সেদিন রাত্রে কিমা খেয়ে কর্তাগিন্নী যেমন অবাক হলেন তেমনি খুশিও হলেন। সেই থেকে কর্তাগিন্নীকে হঠাৎ অবাক এবং খুশি ক'রে দেবার ইচ্ছে আমাদের মনের মধ্যে জমা হতে লাগল। বোম্বাই শহরকে মাছের দেশ বললেই চলে। সেখানকার বিখ্যাত মাছ—চাঁদামাছ—যিনি পম্‌ফ্রেট নামে সর্বদেশবিদিত এবং যেমন সুস্বাদু তেমনি অপর্যাপ্ত। তা ছাড়া ইলিশ চিংড়ি ইত্যাদিও প্রচুর পাওয়া যায়। ইরানীর দোকানে চাঁদামাছগুলোকে সেদ্ধ ক'রে একরকম নরম ক'রে ভাজে। তাই খাবার জন্যে সন্ধ্যের পর মাতালের দল

সেখানে ভিড় জমায়। এইখান থেকে চাঁদামাছ মধ্যে মধ্যে নিয়ে যাওয়া হ'ত বটে, কিন্তু আমাদের বাঙালীর জিহ্বা তাতে পরিতৃপ্ত হ'ত না। বেশ ক'রে প্যাজ আর কাঁচা-লঙ্কা দিয়ে চাঁদামাছের তেল-ঝোল খাবার বাসনা মনের মধ্যে প্রায়ই গর্জে উঠত। একদিন কর্তামশায়ের কাছে এই মাছ নিয়ে আসবার প্রস্তাবও ক'রে ফেললুম। কর্তা তো শুনে লাফিয়ে উঠে বললেন—না, না—অমন কাজও করিস্‌নি। এই ফ্ল্যাট ভাড়া নেবার সময় আমাকে মুচলেকা দিতে হয়েছে—এখানে কখনো মাছ হবে না। যদি ধরা পড়ি তো তৎক্ষণাৎ এ-বাড়ি ছেড়ে যেতে হবে।

ওখানকার কোনো এক শেঠ সস্তায় গরিব নিরামিষভোজীরা যাতে থাকতে পারে সেইজন্যে এই বাড়ি ঠিক করেছেন এবং নামমাত্র ভাড়ায় তাদের বাস করতে দেন। কাঁচা-লঙ্কা দিয়ে চাঁদামাছ খাবার বাসনা তাই পরিত্যাগ করতেই হল।

সকাল সাড়ে-ন'টার মধ্যেই কর্তামশাই খেয়ে-দেয়ে আপিসে চ'লে যেতেন। আমরা ইদিক-ওদিক একটু-আধটু কাজ শেষ ক'রে ফেলতুম। গিন্নী শুয়ে গড়িয়ে এগারোটা সাড়ে-এগারোটার সময় উঠে স্নান ক'রে খেয়ে-দেয়ে আবার ক্যাঁকাতে-ক্যাঁকাতে বিছানা নিতেন।

সারা দুপুরে কিছু করবার নেই। পরিতোষের সঙ্গে যে একটু গল্প করব তার উপায় নেই, কারণ তিনি ছোট-কথা বড়-একটা কানে তুলতে চান না। বাড়িতে একখানা সাপ্তাহিক বাংলা কাগজ আসত, সেটা পড়বার ইচ্ছা হ'ত বটে, কিন্তু চাকরে খবরের কাগজ পড়ছে—এ দৃশ্য মনিবেরা সহ্য করতে পারবে কিনা সন্দেহ হ'ত। কাজেই সে-সময়টা আমি খুঁটিনাটি কাজ ক'রে বেড়াতুম।

সেদিন কি-একটা কাজে দুপুরবেলা গিন্নীর ঘরে ঢুকে পড়েছিলুম ; এ-সময়টা তিনি প্রায়ই নিদ্রাগত হতেন। সেদিনে ঘরে যেতেই তিনি চোখ থেকে হাত-খানা নাবিয়ে ফেললেন। দেখলুম তাঁর দুই চোখ থেকে অশ্রুধারা ব'য়ে চলেছে। অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলুম—একি মা! আপনি কাঁদছেন কেন?

তিনি কাঁদতে কাঁদতে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন—হ্যাঁ রে, তুই গাঁজার দোকান চিনিস?

ভাবলুম—কি সর্বনাশ! গাঁজা দিয়ে কি হবে? কর্তা সন্ধ্যেবেলা মাল টানেন, গিন্নী কি দুপুরবেলা গাঁজা টানবেন? জিজ্ঞাসা করলুম—গাঁজা দিয়ে কি হবে মা?

তিনি বললেন—গাঁজার দোকানে আপিং বিক্রি হয় না। আমি তোকে দশটা টাকা দিচ্ছি, তুই আমায় এক ভরি আপিং কিনে এনে দে। বাকি টাকা তুই নিয়ে নে।

—আপিং দিয়ে কি হবে মা?

ভদ্রমহিলা উচ্ছ্বসিত হয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললেন—আমি আর এ-যন্ত্রণা সহ্য করতে পারছি না—আমি আপিং খেয়ে মরব।

একবার মনে হল এক-দৌড়ে এখান থেকে পালিয়ে যাই। ভদ্রমহিলা ব'লে চললেন—এই নির্বান্ধব পুরীতে সমস্ত জীবন ধ'রে এই যন্ত্রণা সহ্য করা যে কি পাপ, তা আর কি বলব! আমি জিজ্ঞাসা করলুম—গরম জলের সেঁক-টেঁক দিলে আরাম হয়?

গিন্নী বললেন—তা কখনো দিয়ে দেখিনি। তুই গরম জল ক'রে দিতে পারিস?

কর্তার প্রসাদে বাড়িতে বোতলের অভাব ছিল না। তখুনি একটা বোতল ধুয়ে গরম জল ক'রে বোতলের চারদিক ন্যাকড়া দিয়ে মুড়ে গিন্নীর হাতে দিলুম। গিন্নী কাঁদতে কাঁদতে বোতলটা আমার হাত থেকে নিয়ে আমার সামনেই বোতলটা চেপে ধরলেন।

বললুম—রোগ পুষে রেখে লাভ কি মা! ডাক্তার ডেকে চিকিচ্ছে করান।

তিনি বললেন—ডু'বার হাসপাতালে গিয়েছিলুম। সেখানে সব পুরুষ-ডাক্তার।

বললুম—সেখানে মেয়ে-ডাক্তারও আছে।

তিনি বললেন—হ্যাঁ, তারা দেখেছে, কিন্তু শেষকালে পুরুষ-ডাক্তারে দেখবে। তারা ব'লে দিয়েছে অস্ত্র করাতে হবে। আর পুরুষ-ডাক্তার দিয়ে দেখানোর চেয়েও এই যন্ত্রণা ভোগ করতে করতে ম'রে যাওয়াই শ্রেয়।

কর্তা যে-ঘরে থাকতেন, সে-ঘরে রাস্তার দিকে একটা জানলা ছিল। মাঝে মাঝে তুপুরবেলা আমি সেই জানলার ধারে গিয়ে বসতুম। নিচে বিপুল জনস্রোত ব'য়ে চলেছে—বোম্বাই শহরে কোনো জায়গায় ভিড়ের কমতি নেই। অত উঁচু থেকে লোকগুলোকে দেখে মনে হ'ত কত ছোট। তারই ভেতর দিয়ে বিরাট সরীসৃপের মতো মন্থরগতিতে ট্রাম যাচ্ছে। এইসব রাস্তায় ট্রামের গতি একেবারে বাঁধা।

দেখতে দেখতে বাইরের চিন্তা চ'লে যেত। নিজের মনে ভাবতে থাকতুম—

এই বাড়িতে প্রায় পঞ্চাশটা ফ্ল্যাট আছে; প্রত্যেক ফ্ল্যাটেই একটা ক'রে পরিবার। বিচিত্র তাদের সুখদুঃখের ইতিহাস। প্রত্যেক লোকেরই মনস্তত্ত্ব ভিন্ন। আমরা আজ যে পরিবারে আশ্রয় পেয়েছি তাদের কথা ভাবতুম।

কর্তাগিন্নীর এই সংসারে কেউ নেই। কর্তার ইচ্ছা কাজকর্ম থেকে অবসর গ্রহণ ক'রে স্বামী-স্ত্রীতে কাশীতে গিয়ে বাস করবেন। গিন্নীর ইচ্ছা—অন্তত তিনি যা প্রকাশ করতেন—মৃত্যু এসে এখুনি তাঁকে গ্রাস করুক এবং কর্তা আর-একটি বিবাহ ক'রে সুখী হোন।

সংসারের চেহারা আমার চোখে দিনদিনই অন্য রূপ ধারণ করছিল। যে নেশার ঘোরে আমি সংসারকে দেখতুম, ক্রমেই সেই নেশা কেটে যাচ্ছিল। আগে আমি এই দুনিয়াকে নিজের মনের মতন ক'রে দেখতুম—সেটা ছিল আমার মনে পৃথিবীর ভাবমূর্তি। নেশা কেটে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর নগ্ন চেহারা আমার চোখে ফুটে উঠত। বেশ বুঝতে পারছিলুম, অর্ধেক রাজত্ব এবং রাজকন্যা রূপকথাতেই থাকে, সংসারের কোথাও তার অস্তিত্ব নেই। কোনো বড ব্যবসা-দারের চোখে প'ড়ে গিয়ে তার প্রিয়পাত্র হয়ে উঠে ভবিষ্যতে সেই ব্যবসার মালিক হয়ে ওঠা—ওই আত্মজীবনীতেই পাওয়া যায়। বাস্তবে দেখতে লাগলুম—দেবার প্রবৃত্তি তাদের মধ্যেই প্রবল যাদের মধ্যে দেবার কিছু নেই! আর যাদের দেবার যথেষ্ট আছে নেবার প্রবৃত্তিই তাদের মধ্যে প্রবল। সংসারে রাজকন্যা ও রাজত্ব তো দূরের কথা, একমুঠি ভিক্ষান্নও পাওয়া মুশকিল। চিন্তা হ'ত, যে-বয়সে মানুষের ভবিষ্যৎ-জীবনের ভিত্তি তৈরি হয় সে-বয়েস তো হেলায় ফুঁকে দিলুম। এখন কী করব! চিরকালই কি রান্না ক'রে ও ঘর ঝাঁট দিয়েই জীবন কাটবে! তখন বুঝতে পারিনি আমার ভবিষ্যৎ-জীবনের ভিত্তি সেই অবস্থাতেই গ'ড়ে উঠছিল।

বাড়ির আত্মীয়স্বজন ও গুরুজনদের কথামত এবং ইচ্ছামত নিজেকে তৈরি করবার শপথ কতবার মনে-মনে করেছি। কিন্তু কিছুতেই তা পারি নি। কী এক অদ্ভুত শক্তি আমাকে ঘরছাড়া ক'রে বাইরের জনসমুদ্রে এনে ফেলত; এই শক্তিই আমার জীবনকে গ'ড়ে তুলেছে তার মনের মতন ক'রে। এই শক্তিকে আমি নিজের মনে যত স্পষ্টভাবে বুঝতে পেরেছি, অন্য কেউ তা পেরেছে কিনা তা জানি না।

মাঝে মাঝে নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দারুণ দুর্ভাবনা এই শক্তিকে চাপা দিত। একদিন পরিতোষের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে তাই আগ্রার সত্যদাকে আমাদের

বর্তমান জীবনের কথা লিখে পাঠালুম এবং তিনি আমাদের এই পঙ্ক থেকে উদ্ধার করবেন এই আশাও জানালুম।

ওদিকে আমাদের গ্যাঁড়াব্যাঙ্ক বেশ স্ফীত হয়ে উঠছিল। তিন মাস সময়ের মধ্যে প্রায় শতখানেক টাকা আমরা জমিয়ে ফেলেছিলুম।

কিছুদিন থেকে কর্তা ও গিন্নী দু'জনের মুখেই শুনেছিলুম যে, কর্তা তিন-চারটে বড় বড় মক্কেল ধরেছেন এবং তাদের দিয়ে অনেক টাকা জীবনবীমা করাবার চেষ্টা করছেন ; যদি খেলিয়ে তুলতে পারেন, তবে কয়েক হাজার টাকা এখখুনি পাওয়া যাবে এবং পঁচিশ বছর ধ'রে মাসে মাসে বেশ মোটা রকমের আমদানি হবে। এইসব কাজে কর্তামশাই ইদানীং খুবই ব্যস্ত থাকতেন।

ইতিমধ্যে একদিন তিনি ঘোষণা করলেন, হরিদ্বার থেকে তাঁর গুরুদেব শীগ্‌গিরই আসছেন। লছমন-ঝোলার পারে হিমালয় পাহাড়ে তাঁর আস্তানা—স্বর্গদ্বারে। হরিদ্বারেও তাঁর আস্তানা আছে। গুরুদেবের নাকি অনেক বয়স হয়েছে। সে প্রায় দু'শোর কাছাকাছি। শীগ্‌গিরই তিনি দেহরক্ষা করবেন। তার আগে একবার নানান দেশ পরিভ্রমণ করছেন।

গুরুদেব সম্বন্ধে আমরা অনেক আজগুবী খবর শুনতে লাগলুম। ইতিমধ্যে তিনি একদিন স্বয়ং এসে উপস্থিত হলেন। কর্তা নিজে গিয়ে তাঁকে স্টেশন থেকে নিয়ে এলেন।

ছোট্টখাট্ট মানুষটি, মাথায় সামান্য জটা চুড়ো ক'রে বাঁধা। গায়ে নতুন মার্কিনের ছোট্ট একটা চাদর, কোমর থেকে হাঁটু অবধি নতুন কাপড়ে ঢাকা। শুনলুম গুরুদেব সাধারণত নেংটিই প'রে থাকেন, জনসমাজে এলে ওইরকম বেশ ধারণ করেন।

গুরুদেবের সঙ্গেই তাঁর একজন চেলা ছিল। চেলার বয়স অল্প। এই একুশ-বাইশ বছর হবে। মাথায় লাল-লাল লম্বা-লম্বা চুল। মনে হয় যেন মেহেদী মাখানো হয়েছে। অল্প দাড়ি, দেহ রোগা।

কর্তা যে ঘরটায় থাকতেন, তার পাশে একটা ঘর ছিল। সেই ঘরে আগে থাকতে গুরুদেবের থাকবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কম্বল-পাতা, বালিশ-আনা ইত্যাদি সব তৈরি। গুরুদেব এসে অঙ্গ ও কটি থেকে নতুন বস্ত্র খুলে ফেলে কম্বলে ব'সে পড়লেন। একটু বারান্দা-মত জায়গায় আমরা থাকতুম। তারই একপাশে চেলার থাকবার ব্যবস্থা হল এবং তারই এক কোণে ইঁট দিয়ে উনুন তৈরি করিয়ে গুরুদেবের রান্নার ব্যবস্থা করা হল।

ভারতবর্ষে তখনো সন্ন্যাসীর ছিল একটা বিপুল আকর্ষণ। সন্ন্যাসীর আগমন-সংবাদ পেয়ে দলে দলে লোক আসতে আরম্ভ করল। তাদের সব পরে আসতে ব'লে তখনকার মতো তাড়িয়ে দেওয়া হল, কিন্তু বিকেল থেকে মেয়েদের আগমন আর বন্ধ করা গেল না।

অধিকাংশ গুজরাটী মহিলা। এসেই লম্বা হয়ে প্রণাম ক'রেই ব'সে পড়ে। সন্ন্যাসী গুজরাটী ভাষা জানেন না, তারাও হিন্দী ভাষা একবর্ণও বুঝতে পারে না। সন্ন্যাসী মাতৃমণ্ডলীকে সম্বোধন ক'রে উপদেশ দেন। তারাও ঘাড় নেড়ে এমন ভাব দেখায় যেন সবই বুঝতে পেরেছে। এইসব মহিলাদের অধিকাংশই এই বাড়ির অন্যান্য ফ্ল্যাটের বাসিন্দা। সন্ন্যাসী দেখার পর্ব শেষ ক'রে পুরুষেরা যেমন বাইরে বেরিয়ে যেতেন নারীরা কখনো তেমন করতেন না। তাঁদের কৌতূহল প্রবল। এই ঘরে কে শোয়, সন্ন্যাসী কি খান, কর্তা একলা শোয় কেন, বাড়ির গিন্নী কোথায় ইত্যাদি বলতে বলতে গিন্নীর ঘরে ঢুকে গেলেন। দুই পক্ষেই কথা চলতে লাগল—এ গুজরাটীতে, ও বাংলায় ঃ কেউই কারুর ভাষা জানে না—উত্তর-প্রত্যুত্তর চলতে লাগল। ওই ফাঁকেই একঝলক উঁকি মেরে রান্নাঘরের বৃত্তান্ত সব জেনে নিয়ে বাথরুমটাও দেখা হয়ে গেল। এইরকম প্রায় রাত্রি দশটা অবধি চলতে লাগল।

সন্ন্যাসী আহার অতি স্বল্পই করতেন। সকালবেলায় এক পেয়ালা দুধ প্রায় আধঘণ্টা ধ'রে ধীরে ধীরে পান করতেন। তাঁর জন্যে একটা নতুন বাটলোই এসেছিল, তাইতে বিকেলবেলায় আশি তোলায় এক সের মোষের দুধ জ্বাল দেওয়া হ'ত। রাত্রি প্রায় দশটার সময় একখানি রুটি দিয়ে তিনি সেই দুধটুকু পান করতেন। চেলা-মহারাজকে রোজ সিধে দেওয়া হ'ত। ডাল আটা ঘি তরকারি।

সন্ন্যাসী রোজ বিকেলবেলা একটা বড় মার্বেলের আকারে হালুয়া খেতেন। একটা টিনের মধ্যে হালুয়া জমা করা থাকত, চেলা এসে খাইয়ে যেত। একদিন আমরা দু'জনে সেখানে উপস্থিত ছিলুম। বোধহয় তাঁর পদসেবা করছিলুম। তিনি টিন থেকে দু'টো কাবলী মটরের আকারের হালুয়া নিয়ে আমাদের দু'জনকে দিয়ে বললেন—খা-খা।

চমৎকার খেতে লাগল ; আটঘণ্টার মধ্যে বেশ নেশা বোধ হ'তে লাগল। পৃথিবী রঙিন হয়ে উঠল। ওদিকে ক্ষিদেও বেশ চনচনে হয়ে উঠল। চেলার কাছে শুনলুম সেটা গাঁজার হালুয়া। চেলাকেও দেখতুম রোজ বেশ একটি বড় গুলি নিয়ে গালে ফেলতেন।

আমরা দু'জনে সন্ন্যাসীর দুই পদ সেবা করতুম। সন্ন্যাসী বলতেন—এরা বড় প্রেমিক বালক। অবিশ্যি মিনিট পাঁচ-ছয় পা টিপিয়ে পরেই তিনি আদর ক'রে আমাদের বলতেন, এবার যা, খেলতে যা।

গুরুদেব আসার পর থেকে গিন্নী বিছানা ছেড়ে মাঝে মাঝে তাঁর কাছে এসে বসতেন। গুরুদেব তখন বলেছিলেন—তোর ব্যায়রাম সেরে যাবে। কর্তাগিন্নীর মুখে হাসি ফুটে উঠল। এই ক'মাসে তাঁদের মুখে হাসি ফুটে উঠতে কখনো দেখিনি। গুরুদেব গিন্নীকে প্রতি সপ্তাহে সোমবারে বারো ঘণ্টা মৌনী থাকতে ব'লে দিলেন। কিছুদিন হইহই হবার পর গুরুদেব চ'লে গেলেন পুনার দিকে। সেখানে উদাসীবাবার মঠে দিনকতক কাটিয়ে ফিরে যাবেন আবার তাঁর আশ্রমে। দিন-দশেক খুব হইহই হবার পর আবার সব ঠাণ্ডা হয়ে গেল। গিন্নী নিলেন আবার তাঁর বিছানা—কর্তা তাঁর সেই কোণটি।

গুরুদেব বোধ হয় বুধবারে চ'লে গেলেন। গিন্নীমার মৌনী থাকার কথা আমরা একেবারে ভুলেই গিয়েছিলুম। পরের সোমবার সকালে আমি রান্না-ঘরে চা তৈরি করছি এমন সময় গিন্নীর চ্যাঁ-চ্যাঁ চিৎকার কানে এসে পৌঁছল। ছুটে তাঁর কাছে যেতেই দেখি খাটের সামনে পরিতোষ উজবুকের মতো দাঁড়িয়ে আছে আর গিন্নী চ্যাঁ-চ্যাঁ ক'রে চেঁচিয়ে ইশারায় তাকে কি বলবার চেষ্টা করছেন। অন্য অন্য দিন গিন্নী সকালবেলায় কথার মাথায় একটা ক'রে চন্দ্রবিন্দু দিয়ে কথা কইতেন, কিন্তু সেদিন সবটাই চন্দ্রবিন্দু শুনে চট ক'রে মনে প'ড়ে গেল—আজ তাঁর মৌনী থাকার দিন। তখুনি ছুটে গিয়ে চা এনে দিলুম। চা দেখে তখনকার মতো চ্যাঁ-চ্যাঁ-করা থামালেন বটে, কিন্তু সেদিন সারাদিন তিনি ঐরকম চ্যাঁ-চ্যাঁ ক'রে কাটালেন। মনে হল এরকম নীরবতার চেয়েও সানুনাসিক সরবতা যে ছিল ভালো। যাই হোক, বেলা পাঁচটার সময় তিনি মৌনতা ত্যাগ করলেন; তিনিও বাঁচলেন, আমরাও বাঁচলুম।

এইরকম দু'তিন সপ্তাহ কাটাবার পর একদিন কর্তা জানালেন—যে-ক'টি মালদার লোককে বীমা করাবার চেষ্টা তিনি করছিলেন, সে-ক'টির বিষয়ে তিনি কৃতকার্য হয়েছেন। একদিন আপিস থেকে দু'টি-তিনটি বন্ধু নিয়েই তিনি বাড়ি ফিরলেন। তাদের মধ্যে সেই গাইয়ে ভদ্রলোকও ছিলেন। ঘণ্টা-দুয়েক খুব হুল্লোড় হল—ইরানীর দোকান থেকে চাঁদামাছ ও পাঁটার মাংস এলো। তারপর তাঁদের সামনেই আমাদের ডেকে কর্তা বললেন—একদিন বন্ধুবান্ধবদের ডেকে খাওয়াবো। তোরা মাংস রাঁধতে পারবি?

আমরা তো উৎসাহিত হয়ে উঠলুম। বললুম—আজ্ঞে হ্যাঁ, খুব পারবো।

পাঁচ-ছয়জন লোক খাবে। ঠিক হল ইরানীর দোকান থেকে ভাজা মাছ কিনে আনা হবে আর মাংসটা ঘরেই রান্না হবে। পাঁউরুটি দিয়ে খাওয়া হবে; আর জারকরস বলো, সোমরস বলো, সে-তো আছেই। পাঁচ-ছ'জন নিমন্ত্রিত ও আমরা বাড়ির ক'জন। কত মাংস লাগবে হিসেব ক'রে দেখা গেল অন্তত বোম্বাই দশ-সের মাংস আনতেই হবে। রাঁধবার পাত্র কোথায় পাওয়া যাবে? গুরুদেব যখন ছিলেন, তখন আমাদের ওপরতলার বাসিন্দে এক কর্তাগিন্নীর সঙ্গে কিছু ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। বললুম—আলুর দম বানাব ব'লে একটা বড় পাত্র ওদের কাছ থেকে চেয়ে আনলেই হবে। তারপর ভালো ক'রে মেজে দিলে কোনো গন্ধই থাকবে না। যাই হোক, নির্দিষ্ট দিনে আগে গিয়ে ওদের বাড়ির গিন্নীর কাছ থেকে একটা বড় পাত্র চেয়ে আনা হল। আজকাল অ্যালুমিনিয়ামের যেমন গোল লম্বা চোঙার মতো ডেক্‌চি হয়েছে, সেইরকম একটা পেতলের ডেক্‌চি। ভেতর-দিকটা কলাই-করা। ওদের গিন্নী ব'লে দিলেন—দেখো কলাইটা যেন উঠে না যায়।

সকালবেলা দুই বন্ধুতে গিয়ে মাংস কিনে আনলাম। কাপড়ে ও তার পরে কাগজে মুড়ে নিয়ে এলুম। সকালবেলা রান্নাবান্না শেষ ক'রে মসলা বেটে দই নিয়ে এসে মাংসতে মসলার সঙ্গে মাখিয়ে চড়িয়ে দেওয়া গেল। এর আগে কিমা রাঁধার অভিজ্ঞতা ছিল—সে-সময়ে বিশেষ কিছু গন্ধ বেরোয়নি। কিন্তু মাংস চড়াবার কিছুক্ষণ পরে গন্ধে চারদিক ভরপুর হয়ে গেল।

ঘণ্টাখানেক বাদে দেখি মাংসের ঝোল সাদা দুধের মতো হয়ে উঠেছে। একটুখানি চেখে দেখলুম দারুণ টক। তক্ষুনি তাতে কতকটা চিনি ঢাললুম—ঢেলে আবার চাখলুম; দেখলুম কিছু সাম্যভাব এসেছে বটে, কিন্তু মাংস সেদ্ধ হয়নি।

পরিতোষ বললে—সুপুরি দিলে মাংস সেদ্ধ হয়।

সুপুরি কোথায় পাওয়া যায়! পানের পাট তো বাড়িতে নেই। সংসার-খরচের টাকা আমাদের কাছেই থাকত। পরিতোষকে চার আনা দিয়ে বললুম—সুপুরি নিয়ে আয়।

পরিতোষ পানওয়ালার দোকান থেকে একরাশ চিকিসুপুরি নিয়ে এলো। লাল-টক্‌টকে তাদের চেহারা। সুপুরিগুলো ন্যাকড়ায় বেঁধে সেই পুঁটুলিটাও একটা ফালিতে বেঁধে মাংসের ঝোলে নামিয়ে দেওয়া গেল। দেখতে দেখতে

সেই সুপুরির লাল রঙ বেরিয়ে মাংসের ঝোলের রঙ একেবারে খুনী লাল হয়ে উঠল। তাড়াতাড়ি সুপুরির পুঁটুলি তুলে ফেললুম। মাংস ফুটতে লাগল কিন্তু সেদ্ধ আর হয় না! ওদিকে যত জল শুকোতে লাগল, ততই ঠাণ্ডা জল ঢালতে লাগলুম। পাঁচ-ছ' ঘণ্টা বাদে সেই অপূর্ব রান্না নামিয়ে আমরা হাঁপাতে লাগলুম। একটুখানি মাংস তারই মধ্যে চেখে ফেলা গেল—দেখলুম সেরকম মাংস জীবনে খাইনি! ইতিমধ্যে কর্তা একেবারে অভ্যাগতদের নিয়ে বাড়িতে ফিরলেন। সোডা আমরা আগেই এনে রেখেছিলুম, যজ্ঞ শুরু হতে বিশেষ দেরি হল না। মিনিট-দশেকের মধ্যেই চেঁচামেচি হাঁকডাক শুরু হয়ে গেল।

অভ্যাগতদের মধ্যে জন-তিনেক বাঙালী আর দু'জন বোধ হয় মারাঠী ছিলেন। কাগজ ছিঁড়ে প্লেট তৈরি ক'রে এক এক জনকে এক একটা মাছ দেওয়া হল। তাঁরা পরমানন্দে মাছের চাঁট দিয়ে আসব পান করতে লাগলেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই মাংসের তলব পড়ল। অতগুলো বাটি বাড়িতে ছিল না। পাত্র-অপাত্র ঘটি-বাটি গামলা চায়ের-পেয়ালা ইত্যাদি নিয়ে কোনোটিতে ঝোল কোনোটিতে মাংস নিয়ে দুই খানসামা ইন্দ্রসভায় গিয়ে উপস্থিত হলুম। পাত্রগুলি নামিয়ে রাখতে-না-রাখতে সপাসপ শুরু হয়ে গেল। আঃ উঃ—ইত্যাদি আরামব্যঞ্জক বিবিধ ধ্বনিতে গৃহ মুখরিত হয়ে উঠল। সকলেই বলতে লাগলেন —মাংস রান্না খুব চমৎকার হয়েছে।

কর্তার বুক ফুলে দশখানা। তিনি বললেন—দু'বেটা খায় বেশি বটে, কিন্তু রাঁধে যা ভাই—একেবারে অমৃত।

আমাদের নিজেদের সম্বন্ধে ধারণা ছিল তার উল্টো। আমরা খেতুম কম কিন্তু রাঁধতুম অতি বিশ্রী। কিছুক্ষণের মধ্যেই কর্তার ডাক পড়ল। তিনি নিজেই জিজ্ঞাসা করলেন—কি রে? আর আছে?

নিজেদের জন্যে ও গিন্নীর জন্যে খানিকটা মাংস আলাদা ক'রে রেখেছিলুম। বললুম—সামান্য কিছু আছে।

একজন অতিথি বললেন—তা হ'লে নিয়ে এসো সেটুকু। কার জন্যে রেখেছ?

গিন্নীমাকে গিয়ে বললুম—আপনি এইবেলা খেয়ে নিন, না হ'লে কিছুই থাকবে না।

তাঁর জন্যে একটু রেখে বাকি সমস্তটি তাঁদের দিয়ে দিলুম।

রাত্রি দশটা নাগাদ অভ্যাগতেরা চ'লে গেলে মাছের কাঁটা, মাংসের হাড় যেখানে যত ছিল কাগজে পুঁটুলি ক'রে রাস্তায় ফেলে দিয়ে আসা হল। মাছ

কিংবা মাংস যেদিনে আসত সেদিনেই এই কার্যটি করতে হ'ত। কয়েক টুকরো পাঁউরুটি প'ড়ে ছিল, তাই চিনি দিয়ে খেয়ে সে-রাত্রে শুয়ে পড়লুম। পরের দিন ভোরবেলা উঠেই ডেকচি-মাজা শুরু হয়ে গেল। গন্ধ আর কিছুতেই ছোটে না। শেষকালে পাত্রটা উপুড় ক'রে জ্বলন্ত উনুনের ওপর ধরতে মনে হল গন্ধটা চ'লে গেছে। ডেকচিটা যথাস্থানে পৌঁছে দিয়ে এসেই ভাত চড়িয়ে দিলুম। মনে পড়ে সেদিনটা ছিল শনিবার।

শনিবার দিন কর্তা একটু তাড়াতাড়ি আপিসে বেরুতেন। সেদিনও আমাদের তাড়া দিয়েছিলেন। ভাত আর একটু নিরিমিষ তরকারি নামিয়ে ডাল চড়িয়েছি এমন সময় আমাদের ফ্ল্যাটের বাইরে সিঁড়ি দিয়ে উঠে যে খানিকটা জায়গা ছিল সেখানে বহুজনের গোলমাল ও বচসা শুনতে পাওয়া গেল। কিছুক্ষণ পরেই শুনলুম আমাদের মনিব উচ্চকণ্ঠে আমাদের ডাকছেন।

ডালটা তখনকার মতো নামিয়ে দু'জনে বাইরে গিয়ে দেখলুম বাড়িওয়ালা শেঠ ও ভাড়াটেদের অনেক স্ত্রীপুরুষ সেখানে এসে জমেছে। আমরা বাইরে যেতেই একজন সেই ভিড়ের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে বললে—এই দু'টোই কালকে মাংস কিনছিল।

বাড়িওয়ালা শেঠ আমাদের মনিবকে বলতে লাগলেন—তুমি কথা দিয়েছিলে মাছ-মাংস তোমার এখানে হবে না ; তাই তোমাকে বাড়িভাড়া দিয়েছিলুম। তুমি আজই ফ্ল্যাট ছেড়ে দিয়ে চ'লে যাও। না হ'লে বিপদে পড়বে।

কর্তা কাঁচুমাচু হয়ে বলতে লাগলেন—আমি তো সকালে আপিসে চ'লে যাই, ভিশিতে (হিন্দু হোটেলে) খাই। রাত্তিরে সেখান থেকেই আমার ও স্ত্রীর খাবার নিয়ে আসি। আমার স্ত্রী রুগ্না। কোনোদিন খায়, কোনোদিন বা খায় না। এরা সারাদিন কি করে বলতে পারিনে তো!

আমরা বললুম—মাছ-মাংস আমরা খাইও না—রাঁধিও না।

আর একজন লোক বললে—এরা রোজ ইরানীর দোকানে ঢোকে। আমরা দেখেছি।

আমাদের মাথার ওপরে যে ভাড়াটেদের পাত্র আমরা নিয়ে এসেছিলুম তাদের বাড়ির কর্তার হাতে দেখলুম ডেকচিটা রয়েছে। ইনি বললেন—এই পাত্রে মাংস রেঁধেছে, এখনও গন্ধ ছাড়েনি।

বাড়িওয়ালা শেঠ আমাদের কর্তাকে বললেন—এখুনি এদের তাড়িয়ে দাও। নচেৎ তুমিও বিদেয় হও।

আমাদের কর্তা বললেন—ওরা এখনও অভুক্ত আছে; আজই খেয়ে-দেয়ে চ'লে যাবে। আপনাদের সামনেই বলছি—

কর্তা আমাদের দিকে ফিরে বললেন—তোমরা আজই চ'লে যাও।

এক মুহূর্তেই ভাগ্যের কাঁটা ঘুরে গেল। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল—কিছুদিন পূর্বে মাংস খাওয়ার অপরাধে এক জায়গায় চাকরি গিয়েছিল। আজ মাংস রান্না করবার অপরাধে চাকরি চ'লে গেল।

ফিরে এসে আধসেদ্ধ ডাল উনুনে চড়িয়ে দিলুম। কর্তা গোঁজ হয়ে চান সেরে গিন্নীর ঘরে ঢুকে তাঁকে কি-সব ব'লে না-খেয়েই আপিসে চ'লে গেলেন। আমরা স্থির করেছিলুম বেলা তিনটে সাড়ে-তিনটের সময় চ'লে যাব। গিন্নীমাকে চান ক'রে নিতে বললুম। তিনি বিনা-বাক্যব্যয়ে চান ক'রে খেয়ে নিলেন। ইদানীং সংসার-খরচের কিছু ক'রে টাকা আমাদের কাছেই থাকত। তখনও গোটা পনেরো টাকা খরচ হয়নি। আমরা গিন্নীমাকে সেই টাকা ক'টা ফেরত দিতে গেলুম।

তিনি বললেন—ও-টাকা তোদের কাছেই থাক্। যদি কিছু দরকার লাগে খরচ করিস।

স্নান সেরে খেতে বসেছি এমন সময় পিয়ন এসে প্রফুল্ল ঘোষের নামে একখানা খাম দিয়ে গেল। তাড়াতাড়ি খুলে দেখলুম আগ্রা থেকে সত্যদা লিখেছেন—তোমরা কোথায় আছ? তোমাদের জন্যে কাজ ঠিক ক'রে রেখেছি, শীগ্‌গির এসে যোগ দেবে।

আনন্দের চোটে ভালো খেতেই পারলুম না।

আমাদের গ্যাঁড়াব্যাঙ্ক খুলে দেখা গেল সেখানে এই ক'মাসে প্রায় একশ' তিরিশ টাকা জমেছে। তা ছাড়া গিন্নীমায়ের দেওয়া এই পনেরো টাকা যোগ হল। টাকাটা আধাআধি ক'রে দু'জনের কাছায় বেঁধে নিলুম। কি জানি যদি চুরি যায় কিংবা কোনোরকমে খোয়া যায় তা হ'লে অন্তত অর্ধেক তো থাকবে! এই ক'মাসে আমাদের নিজেদেরও কিছু সম্পত্তি হয়েছিল। দু'খানা ছোট শতরঞ্চি, দু'টো বিছানার চাদর, দু'টো বালিশ, একজোড়া ক'রে ধুতি আর দু'টো জামা। আমরা ঠিক করেছিলুম রাত্তির ন'টায় জি.আই.পি.-র দিল্লীযাত্রীর গাড়িতে আগ্রায় যাব। বেলা তিনটের সময় আমাদের সম্পত্তি বাঁধা-ছাঁদা করছি এমন সময় ধপ ধপ ক'রে কর্তা আপিস থেকে ফিরে এলেন। তিনি সিধে নিজের ঘরে না গিয়ে একেবারে আমাদের কাছে এসে বললেন—কি রে? তোরা যাবার যোগাড় কচ্ছিস?

বললুম—হ্যাঁ।

কর্তা জিজ্ঞাসা করলেন—কোথায় যাবি ?

কর্তার মুখ দিয়ে তখন ভুরভুর ক'রে মধুর গন্ধ বেরুচ্ছে। বললুম—দেখি কোথায় যাই।

কর্তা একটুখানি চুপ ক'রে থেকে ধরা-ধরা গলায় বললেন—তোদের বিনে দোষে তাড়িয়ে দিচ্ছি। কিন্তু কি করব বাবা—উপায় নেই।

দেখলুম তাঁর দুই চোখে অশ্রু টলটল করছে। তিনি পকেট থেকে ব্যাগটা বার ক'রে দু'খানা দশটাকার নোট আমাদের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন—রেখে দে। যদি বোম্বাইয়ে থাকিস তা হ'লে মাঝে মাঝে দেখা করিস।

এই ব'লে তিনি নিজের ঘরে চ'লে গেলেন। আমরা জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে গিন্নীমার ঘরে গেলুম। দেখলুম তিনি মুখে হাত দিয়ে চোখ বুজে শুয়ে আছেন। বললুম—মা, আমরা যাচ্ছি।

তিনি কোনো কথা বললেন না। আমরা কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলুম; কিন্তু তখনও তিনি নীরব রইলেন দেখে ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লুম।

সারাজীবন তো চাকরি ক'রেই খেতে হয়েছে। অন্যায়ভাবে তাড়িত হলেও এমন মনিব ও মনিব-পত্নী আর পাইনি।

সেইদিনই রাত্রি ন'টার ট্রেনে দু'খানা রাজা-কি-মণ্ডির টিকিট কেটে আমরা আগ্রা রওনা হলুম।

আগ্রায় পৌঁছে সত্যদাকে গিয়ে যখন প্রণাম করলুম তখন তিনি আমাদের দেখে কিছুই বিস্ময় প্রকাশ করলেন না। দু'বছর আগে একদিন সেইভাবে অদৃশ্য হওয়ার কথা তো তুললেনই না, বরঞ্চ এমনভাবে কথা বলতে লাগলেন যেন কাল সন্ধ্যেবেলাতেই আমাদের সঙ্গে কথাবার্তা হয়ে গেছে।

সত্যদা বলতে লাগলেন—কোথায় থাকো ? তোমাদের জন্য কাজকর্ম সব ঠিক ক'রে রেখেছি আর তোমাদেরই দেখা নেই ! এখন স্নান ক'রে খেয়ে-দেয়ে একটু বিশ্রাম কর—বিকেলবেলা তোমাদের কর্মস্থানে নিয়ে যাব।

সত্যদার ওখানে একপেট ভাত ও মাছের ঝোল খেয়ে দ্বিপ্রহরে টেনে একটি ঘুম লাগানো গেল।

সন্ধ্যেবেলা সত্যদার সঙ্গেই গেলুম আমাদের ভবিষ্যৎ কর্মস্থলে।

চশমার কারখানা।

বলা বাহুল্য, সত্যদা যখন এর সঙ্গে জড়িত আছেন তখন বুঝতে হবে স্বদেশী চশমার কারখানা।

যে-সময়ের কথা বলছি সে-সময় আমাদের দেশে কোনো কিছুই তৈরি হ'ত না। দু'-একটা সাবানের কারখানা এখানে-সেখানে গজিয়ে উঠে কয়েক মাসের মধ্যেই ফেল্ পড়ছে। তখন দেশের এইরকমই অবস্থা। অতি সুন্দর প্রসারিত কল্পনাতেও দেশে ইঞ্জিন-তৈরির কথা কেউ ভাবতেও পারেননি।

স্বদেশী চশমার কথা শুনে সামান্য বিস্ময় প্রকাশ করা-মাত্রই সত্যদা এক লম্বা লেক্‌চার ঝাড়লেন। তারপর কতকগুলো ছোট ছোট টিপির মতো পাথর দেখিয়ে বললেন—এইগুলোর ওপর ঘষে ঘষে পাওয়ার দেওয়া হয়।

আমাদের চোখে-মুখে অবিশ্বাসের ছায়া ঘনিয়ে উঠতে দেখে সত্যদা হাঁক দিলেন—ফারজন্দ আলি!

—আয়া হুজুর! ব'লেই ভেতরের ঘর থেকে একটি লোক বেরিয়ে এল। লম্বা-মতন, পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বছর বয়স, চেহারা বেশ দৃঢ়, মুখ হাস্যময়। লোকটি এসে সেলাম ক'রে দাঁড়াতেই সত্যদা বললেন—এই আমাদের ওস্তাদ।

পরিচয় করিয়ে সত্যদা তাকে বললেন—বাবুরা এসেছে কলকাতা থেকে। এখানে যে পাথরে পাওয়ার দেওয়া হয় সে-কথা বিশ্বাসই করতে চাইছে না।

ফারজন্দ আলি আমাদের উদ্দেশ ক'রে বললেন—আর একটু বাদেই আমরা কাজ আরম্ভ করব। একটু অপেক্ষা করলেই আপনারা চক্ষুকর্ণের বিবাদভঞ্জন করতে পারবেন।

সেকালে 'ব্রেজিলের পাথরের চশমা' নামে একটি বড়-গোছের ধোঁকা কলকাতায় চালু ছিল। পাথরের চশমা নইলে সেটা যে নিকৃষ্ট দরের চশমা হবে, এই আমরা জানতুম। কিন্তু পরে জানা গেল ওটা একটা মস্ত ধোঁকা।

পাথর কোত্থেকে আসে সে-কথা জিজ্ঞাসা করা-মাত্রই সত্যদা আবার আরেকটা লেক্‌চার দিলেন—ভারতবর্ষের নানান পাহাড়ে লক্ষ লক্ষ টন স্বচ্ছ পাথর রয়েছে। আমরা সেইসব জায়গা থেকে পাথর সংগ্রহ করি।

কারখানা থেকে এবার আপিসে গিয়ে বসা গেল। আমাদের যিনি আসল মনিব, ধরা যাক তাঁর নাম হীরালাল—তাঁর আর কোনো কথা বলবারই দরকার হয় না। প্রতি কথাতেই সত্যদা একটা ক'রে লেক্‌চার দেন।

অবশ্য সেই যুগই ছিল লেক্‌চারের যুগ। স্বদেশী আমলে ছোট-বড় সকলেই

লেক্‌চার দিতেন। এঁদের অনেকের চাইতেই সত্যদা ভালো লেক্‌চার দিতে পারতেন এবং মিথ্যেকথাকে গুছিয়ে সত্যের রূপ দেবার ক্ষমতা ছিল তাঁর অদ্ভুত। সেইখানে ব'সেই আমাদের চাকরি ঠিক হয়ে গেল। উভয়পক্ষে চিঠি বিনিময় হল এবং উপরি-পাওনার মধ্যে মনিবের বাড়িতে সান্ধ্য আহারের নিমন্ত্রণ পাওয়া গেল।

সেদিন সন্ধ্যায় মনিবের বাড়িতে এক প্রায়ান্ধকার জায়গায় আমাদের জন্য আসন পাতা হল। সেখানে ব'সে গরম-গরম মোটা-মোটা পুরী, করলা, ওল ও উচ্ছের আচার দিয়ে ভোজন সমাধা হল। বোধহয় কিছু মিষ্টিও খেতে দিয়েছিল।

একটা মেসে আমাদের থাকবার ও খাবার ব্যবস্থা হল। পরদিন থেকে আমাদের রীতিমত তালিম দেওয়া হ'তে লাগল। সকালবেলা যাই—সত্যদা দশটা-এগারোটা অবধি তালিম দেন। তালিমের পর কারখানায় গিয়ে বসি। অন্যান্য কাজ তো চলতই, সেইসঙ্গে আমাদের শিক্ষাও দেওয়া হ'ত। একদিন লক্ষ্য পড়ল যে, কারখানার এক কোণে ছোট-বড় ক'টা টিনের ওপর একটি ভদ্রলোক ছবি এঁকে যাচ্ছেন—একই ছবি। ধুতি-পরা, কোঁচা উল্টে কোমরে গোঁজা, গায়ে শার্ট, এক কাঁধে চাদর ঝুলছে, এক হাতে একটা ছাতি, দাড়িওলা মূর্তি। এই এক ছবিই ভদ্রলোক এঁকে চলেছেন। তাঁর কাছে এগিয়ে গিয়ে কথাবার্তা ব'লে বুঝতে পারলুম তিনিও বাঙালী। জিজ্ঞাসা করলুম—এ কার ছবি আঁকছেন মশাই ?

ভদ্রলোক বললেন—এই তো বাবা, তোমাদের নেতাকে চিনতে পারলে না! এ হচ্ছে সুরেন বাঁড়ুজ্জের চেহারা।

সুরেন বাঁড়ুজ্জের মূর্তির স্বদেশী চশমার ফ্যাক্টরিতে কি অদ্ভুত পরিবর্তন হয়েছে তা চোখে না দেখে বিশ্বাস করা যায় না। শুনলুম এবং দেখলুমও। কতক-গুলোতে লেখা রয়েছে—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন: "এই চশমা স্বদেশে তৈরি হচ্ছে—এবং ইহা অতি বিশুদ্ধ ও পবিত্র।" শুনলুম প্রতিদিন ডজন-ডজন এই প্ল্যাকার্ড চারিদিকে পাঠানো হচ্ছে এবং সেখানকার রাস্তায় রাস্তায় দেয়ালে দেয়ালে এঁটে দেওয়া হচ্ছে।

ইতিমধ্যে আমাদের চোখ-দেখা সম্বন্ধে তালিম দেওয়া হ'তে লাগল। বর্তমান সরকারী ভাষায় যাকে 'প্রকৃষ্টরূপে প্রশিক্ষণ' বলে তাই হ'তে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে লেক্‌চারে প্রশিক্ষণও চলতে লাগল। একরকম শ্রেণীর লোককে কিরকম ধাঁচের

লেক্‌চার দিলে কার্যকরী হবে, সত্যদা নিজে তার তালিম দিতে লাগলেন। আমার জন্য কোট-পেণ্টুল্যান তৈরি হল—কালো কাপড়ের উপরে সাদা-সুতোর ডোরা। যে কাপড়ের পেণ্টুল্যান সেই কাপড়েরই কোট। শার্টের বদলে পাঞ্জাবি তৈরি হল যা ধুতিতেও চলবে, পেণ্টুল্যানেও চলবে। একজোড়া জুতোও কেনা হল। যতদূর মনে পড়ছে ক্যানভাসের জুতো—একটাকা জোড়া।

নানারকম পাথর-পূর্ণ বাক্স একটা দেওয়া হল। কোনোটা স্বচ্ছ, কোনোটা-বা ঘষা কাঁচের মতো। প্রত্যেক পাথরের স্বতন্ত্র ইতিহাস আছে। আর একটা বাক্স দেওয়া হল—তা লেন্স ও ফ্রেমে ভরা। এইসব সাজসরঞ্জাম নিয়ে একদিন সকালবেলা দুর্গা ব'লে যাত্রা করা গেল।

বিকেল নাগাদ দিল্লী শহরে গিয়ে পৌছলুম।

গ্রীষ্মকাল। শহর ঝিমিয়ে পড়েছে।

ষাট বছর আগেকার দিল্লীর সঙ্গে আজকের দিল্লীর কোনো তুলনাই হয় না।

তখনও দিল্লীবাসীর মন থেকে বাদশাহী নেশা একেবারে ছুটে যায়নি। তাদের আচারে ব্যবহারে তখনও বাদশাহী ঢঙের প্রাচুর্য আমার চোখে একটু অদ্ভুত ঠেকেছিল।

স্টেশন থেকে বেরিয়ে ডানদিকে কিছুদূর অগ্রসর হয়ে বাঁ-দিকে যে চওড়া রাস্তা একেবারে ফতেপুরী মসজিদের কাছে গিয়ে পড়েছে, তার মোড়েই পাশা-পাশি যে-দু'টো বড় সরাইখানা আছে তারই একটাতে গিয়ে আস্তানা গাড়লাম।

এই সঙ্গে ব'লে রাখি, এরপরে সেদিন পর্যন্ত কতবার যে দিল্লীতে গিয়েছি তার ঠিকানা নেই। কিন্তু প্রতিবারই দেখেছি, সেই সরাইখানা তখনও রয়েছে।

এখানে চার আনা দৈনিক হিসাবে একটি ঘর ভাড়া নিয়ে জিনিসপত্তর তো রাখা গেল, কিন্তু ঘরের মধ্যে গরমে টেঁকা দুঃসাধ্য। সরাই-এর প্রাঙ্গণে অনেক দড়ির খাটিয়া প'ড়ে ছিল, সেখানে যার ইচ্ছা সেই গিয়ে বসত। আমি দরজায় তালা লাগিয়ে একটা খাটিয়ায় গিয়ে ব'সে পড়লুম।

আজ ভারতবর্ষে যে-কোনো প্রদেশেই হোক না কেন, বাঙালীকে দেখলেই 'মার জুতো—মার জুতো' করে। সেদিন কিন্তু বাঙালীর এ-অবস্থা ছিল না।

তার ওপরে সদ্য ক্ষুদিরামের বোমা ফাটার জন্য বাঙালীর খাতির চারদিকে খুবই বেড়ে গিয়েছিল। আমি গিয়ে বসতেই আমার চারপাশে লোক এসে বসতে লাগল।

—বাবুজীর বাড়ি কোথায় ?

—বাংলার অবস্থা কিরকম ?

—কিরকম স্বদেশী চলছে ?—ইত্যাদি নানা প্রশ্নের সম্মুখীন হ'তে হয়েছে। এ ছাড়া বোমার কথা, আমাদের সামাজিক চালচলনের কথা—অনেক কিছুই আলোচনা হ'তে লাগল। আমার সামনের খাটিয়ায় সরাইয়ের মালিক এসে বসলেন। তিনি আমায় জানালেন যে আমি তাঁদের সরাইয়ে আসায় তাঁরা বেশ খুশিই হয়েছেন।

কথাবার্তায় বেলা প'ড়ে এল। গ্রীষ্মকালের বিকেলবেলায় পশ্চিমে গরম অসহ্য হয়ে ওঠে। সবাইয়ের হাতেই হাতপাখা ঘুরতে থাকে।

সেইদিনই সন্ধ্যেবেলায় কথাবার্তা যখন বেশ জমে উঠেছে এমন সময় একজন পাঠান এসে হাজির। মাথায় কুল্লা পাগড়ি ও পরিধানে শালোয়ার, ছ'ফুট তিন ইঞ্চি লম্বা। আমায় সেলাম করলে। আমি সেলাম ক'রে অন্যদের সঙ্গে কথা বলছি এমন সময় সে বললে—বাবুসাহেব, আমাকে মনে আছে তো ?

আমি বললুম—কই, চিনতে পাচ্ছিনে তো।

লোকটি মৃদু হেসে বললে—আজ চিনতে পারবেন কি ক'রে ? নেশা কেটে গিয়েছে যে !

আমি বিরক্ত হয়ে বললুম—কে তুমি, বলো ?

লোকটি হেসে বললে—কাল রাত্রে আপনি আমার কাছে শরাব কিনে-ছিলেন—ভুলে গেছেন ?

কথাটা শুনে ভয়ে আমার বুক ধড়ফড় ক'রে উঠল। আমি হোটেলের মালিককে ডেকে বললুম—এই দেখুন, আমি তো এইমাত্র আপনার সরাইয়ে এসেছি, এ লোকটা কি বলছে শুনুন।

আমার কথা শোনামাত্র আমার চারপাশের লোকেরা হো হো ক'রে হেসে বললে—বহুরূপী হ্যায়—বহুরূপী। লোকটা আপনার কাছে কিছু চাইছে।

আমার তখন রাগ চ'ড়ে গিয়েছে। বললুম—একটি পয়সাও দেব না।

সে-লোকটাও ছাড়বে না। শেষকালে সকলের কথামত তাকে একপয়সা অর্থাৎ এক ডবল দিয়ে নিশ্চিন্ত।

কিন্তু নিশ্চিন্ত হবার জো কি? দিল্লী শহর। নতুন আগন্তুকের—বিশেষ ক'রে সে যদি কোনো সরাই কিংবা হোটেলে আশ্রয় নিয়ে থাকে তবে নানা উৎপাতে তার জীবনটি দুর্বিবহ হয়ে উঠবে। অন্তত তখনকার রীতি এইরকম ছিল।

বহুরূপী চ'লে গেল। সকলের কাছে কলকাতার ও বোমা ইত্যাদির গল্প করছি এমন সময় পেশোয়াজ-পরিহিতা এক তরুণী ঘুঙুর পায়ে ঝমঝম ক'রে এসে আমার সামনে নাচতে ও সেইসঙ্গে গান গাইতে শুরু করল। সারেঙ্গীওলা পেছনেই ছিল। সেও কঁ্যাও-অঁ্যাও ক'রে সঙ্গত শুরু ক'রে দিলে।

আমি অন্যমনস্ক হবার ভান ক'রে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগলুম কিন্তু পরিত্রাণ কোথায়? চারপাশের লোকেরা বলতে লাগল—আপনার কাছেই এসেছে।

তর্ক ক'রে কোনো লাভ নেই বুঝেও আমি বললুম—একটি পয়সাও আমি দেব না।

শেষকালে চারটি পয়সা দিয়ে তবে রফা হল। চারটি পয়সা অর্থাৎ চার ডবল।

আর এখানে বসা উচিত নয় ভেবে হাত-মুখ ধুয়ে দিল্লী শহর দেখতে বেড়িয়ে পড়া গেল।

সে-সময়ে দিল্লীতে সৈয়দ হায়দার রেজার খুব নামডাক ছিল। তাঁর 'আফতাব' নামক কাগজে গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে খুব কড়া সমালোচনা বের হ'ত এবং বাংলাদেশের স্বদেশী আন্দোলনের অনুকূলে অনেক কিছুই তিনি লিখতেন। কাজেই সৈয়দ-সাহেব পুলিসের চিহ্নিত ব্যক্তি। এই সম্পর্কে দু'-একবার হয়তো তাঁকে জেলেও যেতে হয়েছে। আমি আগ্রায় তাঁর নাম শুনেছিলুম এবং 'আফ্‌তাব' নামক পত্রিকায় তাঁর ঠিকানা জেনে নিয়েছিলুম।

পরের দিন ঘুম থেকে উঠে 'আফ্‌তাব' আপিসের দিকে রওনা হলুম। প্রায় ঘণ্টা-দু'য়েক ঘুরে ঘুরে একটা সরু গলির মধ্যে আফ্‌তাব-আপিসে গিয়ে চড়াও হওয়া গেল। সৈয়দ-সাহেবের সঙ্গে সেইখানেই দেখা হল। বেঁটেসেঁটে রোগা-মতন লোকটি। বয়স তাঁর তিরিশের মধ্যেই হবে। আমি বাংলাদেশের লোক শুনেই যেন একটু বিশেষ রকমের খাতির করলেন। জিজ্ঞাসা করলেন—কোথায় আছেন?

সরাইয়ে থাকি শুনে তিনি আঁতকে উঠে বললেন—ছি ছি, ওসব জায়গায় কোনো ভদ্রলোক থাকে ?

আমি বললুম—দিল্লীতে আমি কাউকে চিনি না, তাই বাধ্য হয়ে সরাইয়ে উঠতে হয়েছে।

সৈয়দ-সাহেব বললেন—আপনার জিনিসপত্র সব এইখানেই নিয়ে আসুন। যদি আপত্তি না থাকে তা হ'লে এইখানেই থাকুন, আমার এখানে জায়গার অভাব নেই।

সৈয়দ-সাহেবের পরিজনবর্গ থাকতেন অন্য মহল্লায় তাঁদের নিজেদের বাড়িতে। আর এই বাড়িটা হচ্ছে আপিস-বাড়ি। এখানকার একটা ঘরে একটা লিথো-প্রেস আছে—তাতে সাপ্তাহিক আফ্‌তাব ছাপা হয়। বাকি ঘরগুলো প'ড়েই থাকে। তিনি এই ঘরগুলোর মধ্যে একটা ভালো ঘর দেখিয়ে দিয়ে বললেন—আপনার জিনিসপত্র এখুনি নিয়ে আসুন, আমি এখানে বেলা বারোটা অবধি আছি। আমি থাকতে থাকতে মালপত্র নিয়ে আসুন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি বাক্স ও বিছানা নিয়ে ফিরে এলুম। আমার জন্য একটা ঘর খুলে দেওয়া হল। ঘরের সামনে একটু বারান্দা। ঘরের ভেতরে যে নেয়ারের খাটটা ছিল সেটিকে বার ক'রে দিয়ে বারান্দাতেই থাকবার ব্যবস্থা ক'রে নেওয়া গেল।

সৈয়দ-সাহেব প্রেসের কয়েকজন লোককে ডেকে ব'লে দিলেন—ইনি এখানেই থাকবেন। বিধিমত যেন এঁর খিদমত করা হয়।

যাবার সময় সৈয়দ-সাহেব হঠাৎ ফিরে আমায় জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি খাওয়া-দাওয়া কোথায় করছেন ?

আমি বললুম—ঐ ফতেপুরী মসজিদের দোকান থেকে মাংস-পরোটা কিনে নিয়ে গিয়ে তাই খেয়েছিলুম।

সৈয়দ-সাহেব আঁতকে উঠে বললেন—ছি ছি, এ-কাজ আর করবেন না। ওখানকার খাবার খেলে দু'দিনে অসুস্থ হয়ে পড়বেন। আপনি ওখান থেকে খাবার কিনে খান—তা হ'লে আমার বাড়ির খাবার খেতেও বোধহয় আপনার কোনো আপত্তি হবে না।

বললুম—কিছুমাত্র না।

সৈয়দ-সাহেব বললেন—ঠিক আছে। ঠিক সময়ে আপনার জন্য খাবার আসবে। এই ব'লে তিনি বেরিয়ে চ'লে গেলেন। বেলা তখন প্রায় ন'টা।

শুধু এক্ষেত্রে নয়। আমি আমার জীবনে বহুবার দেখেছি বিপদ যখন ঘনিয়ে আসে, সঙ্কটপূর্ণ আবহাওয়ায় চারিদিক অন্ধকার হয়ে ওঠে, ঠিক সেই সময় মেঘদুয়ার মুক্ত হয়ে নেমে আসে আমার মিত্র, মা কিংবা ভাই। তার প্রশ্রয় হস্ত বিস্তারিত ক'রে আমাকে রক্ষা করে। আজ মনে হচ্ছে দেশে দেশে কে ছড়িয়ে রেখেছে আমার বন্ধুর দল। নেয়ারের খাটে ব'সে এইসব নানা কথা চিন্তা করছি!

বেলা তখন বেশি হয়নি। কিন্তু তা হ'লেও দিল্লীর গ্রীষ্মকালে প্রভাতেই মনে হয় দ্বিপ্রহর। একবার উঠে বাইরে যাবার চেষ্টা করলুম কিন্তু গরমের চোটে ফিরে আসতে হল। ব'সে আছি। সৈয়দ-সাহেব চ'লে গেছেন অনেকক্ষণ। কিন্তু তখনও খাবারের কোনো চিহ্ন নেই। হঠাৎ চমক দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে একটি লোক বারান্দায় এসে উপস্থিত হল।

লোকটা বেশ লম্বা। খোঁচা-খোঁচা দাড়ি-গোঁফে মুখখানা ভরা, মাথায় বাবরি চুল, গায়ে একটি সুতীর শেরওয়ানি। তাতে লাল-নীল-সাদা-কালো নানা রঙের কাপড়ের তালি মারা, জামার একটা হাত ছিঁড়ে গিয়ে নিচের দিকে ঝুলছে। লোকটি গটগট ক'রে এসে কোণে একটা মোড়া শতরঞ্চি ছিল ওটাকে পেতে ব'সে পড়ল।

শতরঞ্চির মধ্যে একটা পোঁটলা-গোছের ছিল। সেটাকে খুলে খানকতক বই বার ক'রে নিয়ে সে তার মধ্য থেকে একটা বই বেছে নিয়ে পড়তে শুরু ক'রে দিলে।

আমি কিছুক্ষণ তাকে দেখে আবার আমার নিজের চিন্তায় মগ্ন হলুম। দু'দিন হল এখানে এসেছি—এখনও কাজকর্ম কিছুই আরম্ভ করতে পারিনি।

এইসব ভাবছি এমন সময় হঠাৎ সেই লোক চিৎকার ক'রে উঠে উর্দুতে কি-সমস্ত বয়েৎ পড়তে আরম্ভ করলে। সেই অতি উচ্চ শ্রেণীর ভাষার একটি বর্ণও আমার বোধগম্য হল না। তবে এটুকু বুঝতে পারলুম—অভিবাদন করছে। অর্থাৎ এতক্ষণ সে আমায় দেখতেই পায়নি, এইবার তার চোখে পড়ায় সে আমায় অভিবাদন করলে।

খানিক বাদে সে বললে—বাবুসাহেবের বাড়ি বাংলাদেশে তো?

আমি বললুম—হ্যাঁ।

সে বললে—কলকাতায় এখন খুব গোলমাল হচ্ছে শুনেছি।

তখন কলকাতায় খুব স্বদেশীর হাঙ্গামা চলছিল। আমি বললুম—হ্যাঁ।

সে বললে—বাবুসাহেব, পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে আমাদের এই দিল্লীতে এইরকম স্বদেশীর হাঙ্গামা হয়েছিল।

জিজ্ঞাসা করলুম—আপনি কি সে হাঙ্গামা দেখেছিলেন?

সে বললে—না, আমি আমার ঠাকুরদা-ঠাকুরমার কাছে শুনেছি। তখন আমি জন্মেছিলুম বটে, কিন্তু সেসব কথা আমার স্মরণে নেই।

কথাগুলো ব'লেই সে আবার পড়তে শুরু ক'রে দিলে।

সৈয়দ-সাহেব খাবার পাঠাবেন ব'লে গিয়েছিলেন। কিন্তু খাবার পাঠাতে দেরি হচ্ছে দেখে আমি খাটের ওপর শুয়ে পড়লুম।

একটুখানি ঘুমের আমেজ এসেছিল, তারই মধ্যে ভয়ঙ্কর একটা চিৎকার শুনে চটকা ভেঙে গেল। দেখলুম, সেই ভদ্রলোক আগের মতোই হাঁটু গেড়ে দুই হাত আমার দিকে প্রসারিত ক'রে আবার সেইরকম ভাষায় কি-সব বলতে আরম্ভ করেছে।

আচ্ছা পাগলের পাল্লায় পড়েছি ভেবে শুনতে লাগলুম তার সেই দুর্বোধ্য প্রশস্তি। ওরই মধ্যে একবার 'খানা', আরেকবার 'ফরমাইয়ে' শুনে উঠে বসলুম।

দেখি মাথার কাছে একটি প্রিয়দর্শন বালক টিফিন-কেরিয়ারে ক'রে আমার খাবার এনেছে।

ছেলেটি দেখলুম খুবই চটপটে।

আমি বসামাত্রই সে চারপায়ার ওপরেই দস্তরখান বিছিয়ে আমাকে খাবার পরিবেশন করলে। হাতে-গড়া রুটি, একটুখানি ডাল ও দু'রকম নিরামিষ তরকারি। অনেকদিন পরে বাড়ির তৈরী খাবার খেয়ে ভারি তৃপ্তিবোধ হল।

খাওয়া-দাওয়ার পর নিশ্চিন্ত হয়ে হাত-পা ছড়িয়ে ঘুমের কাছে আত্মসমর্পণ করলুম।

সেদিনটা তো এমনি কেটে গেল। সৈয়দ-সাহেব সেই যে সকালবেলায় চ'লে গিয়েছিলেন আর ফেরেননি।

রাত্রিবেলা যথারীতি খাবার এল।

এবারে রুটি-মাংস।

পরমানন্দে সেই খাদ্য শেষ ক'রে বারান্দাতেই শুয়ে পড়া গেল। ছাপাখানার দু'-একজন লোক দেখলুম এসে বারান্দার মেঝেতে শুলো। একবার মনে হল—একটা দিন কোনো কাজ হল না। কাল একবার কাজে বেরুতেই হবে।

পরদিন সকালবেলা আবার সৈয়দ-সাহেবের সঙ্গে দেখা হল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—খাওয়া-দাওয়া-থাকার কোনো অসুবিধে হচ্ছে না তো?

বললুম—মোটেই না, বরঞ্চ বেশ সুখেই আছি।

একবার ভাবলুম—কাজকর্মের বিষয়ে কোনো সাহায্য করতে পারবেন কিনা একবার জিজ্ঞাসা করি। কিন্তু লজ্জা হল। বিশেষ ক'রে তাঁর অযাচিত সৌজন্যের কথা স্মরণ ক'রে।

সৈয়দ-সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন—মীর-সাহেবের সঙ্গে আলাপ হয়েছে?

বললুম—দুপুরবেলা যিনি এসেছিলেন, তাঁর নাম কি মীর-সাহেব?

সৈয়দ-সাহেব বললেন—হ্যাঁ, তিনি। রোজ দুপুরবেলাটা এইখানেই কাটান। হালচাল একটু পাগলাটে ধরনের হ'লেও তিনি পণ্ডিত লোক। দিল্লী শহরের ইতিহাস তাঁর ভালো ক'রে জানা আছে। আপনার সঙ্গে মিলবে ভালো।

সৈয়দ-সাহেবকে বললুম—আজ এখন একটু কাজে বেরুব ব'লে মনে করছি।

তিনি বললেন—হ্যাঁ, আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে কাজে বেরিয়ে যান। ঠিক সময় আপনার খাবার আসবে। কিছু অসুবিধে হ'লে আমাকে জানাতে তকল্লুফ করবেন না যেন।

কাজে তো বেরিয়ে পড়া গেল।

একহাতে ব্যাগ, আর একহাতে কাঠের একটি সরু বাক্স। তার মধ্যে নানান নমুনার ফ্রেম আছে। শহরের রাস্তায় ঘুরতে লাগলুম। কোথায় যাই, কার কাছে যাই! সারে সারে সব দোকান। একটা দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে দেখছিলুম, এমন সময় দোকানদার সামনে এসে বললে, 'আসুন, ভেতরে আসুন।'

ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়েছিলুম। দোকানদার ডাকামাত্র ঘরে গিয়ে ফরাসে ব'সে পড়লুম। সে জিজ্ঞেস করলে—কি চাই আপনার?

আমি বললুম—আমার কিছু চাইনে। আমি চশমা ফেরি করি। আপনার চশমার দরকার আছে?

সে বললে—না, না, আমার চোখ খুব ভালো আছে। আমি দিনের বেলাতেও তারা দেখতে পাই।

বললুম—তা হ'লে তো চোখের অবস্থা খুবই খারাপ দেখতে পাচ্ছি। আপনার চোখটা—চশমা নেন না-নেন—একবার চোখ-দু'টো পরীক্ষা করব?

সে বললে—হ্যাঁ, হ্যাঁ—তাতে ক্ষতি কি?

আমার কাছে চক্ষু পরীক্ষা করবার কার্ড ছিল। তাতে খুব ছোট অক্ষর

থেকে বড় অক্ষর পর্যন্ত ছাপা। লোকটি কার্ডখানা হাতে নিয়ে দু'-তিনবার ঘাড় বেঁকিয়ে চতুর্থ স্তবক থেকে পড়তে আরম্ভ করলে। বললে—আগের তিনটি স্তবক কিছুই বুঝতে পারছি না।

—এক্ষুনি বুঝতে পারবেন। ব'লে আমি জিজ্ঞাসা করলুম—আপনার কত বয়স হয়েছে ?

সে বললে—পঁচাশ হুয়া।

আন্দাজ ক'রে তাকে পড়বার লেন্স দিলুম। খুশিতে মুখটা উদ্ভাসিত ক'রে লোকটি ব'লে উঠল—হাঁ, অব সব সাফ দিখাতা।

যাই হোক, একটু নাড়াচাড়া ক'রে তাকে লেন্স দিলুম। সে বললে—এবার বেশ পরিষ্কার দেখছি।

তাকে বললুম—এবার অর্ডার দাও।

দরদস্তুর ঠিক ক'রে সে অর্ডার দিলে—আট আনা অগ্রিমও দিলে। তাকে রসিদ দিয়ে উৎসাহভরে আমি অন্য শিকারের সন্ধানে চললুম।

ঘণ্টাখানেক চেষ্টা ক'রেও আর কারুকে বধ করতে পারলুম না। ওদিকে দিল্লীর রোদ চড়বড় ক'রে আকাশের মাঝখানে আসতে আরম্ভ করল, আমিও রণে ভঙ্গ দিয়ে চললুম বাসার দিকে।

দিল্লীতে এসে একদিন মাত্র স্টেশনে ওয়েটিংরুমে ঢুকে স্নান করেছিলুম, এখানে আসবার পর দু'দিন অস্নাত অবস্থায় কেটেছে। তাই মনে করলুম আজ বেশ ভালো ক'রে স্নান করা যাবে। বাসায় ফিরে দেখলুম সৈয়দ-সাহেব তখনও রয়েছেন। দু'-একদিনের মধ্যেই তাঁর কাগজ বেরুবে কাজেই সেই সময়টা তাঁকে একটু ব্যস্ত থাকতে হয়। ওদিকে মীর-সাহেব এসে গেছেন। তিনি তাঁর নির্দিষ্ট আসনে ব'সে একমনে পড়ছেন।

আমি জিনিসপত্র রেখে, জামা খুলে, তোয়ালে বার ক'রে কলের দিকে আসছি এমন সময় সৈয়দ-সাহেব বললেন—কোথায় চললেন ?

আমি বললুম—দিন-দুয়েক স্নান হয়নি, আজ স্নান করব।

সৈয়দ-সাহেব যেন আঁতকে উঠে বললেন—অ্যাঁ—বলেন কি! এখন স্নান করবেন ? জলের অবস্থা দেখেছেন ? কলটা খুলে একবার হাত দিন তো দেখি!

কল খুলে হাতে জল নিয়ে দেখি—জলের বদলে তরল অনল বেরুচ্ছে! সৈয়দ-সাহেব বললেন—আমরা সকালের দিকে জল তুলে রাখি, আর স্নান করি সেই রাত্রি দশটায়।

এই অবধি ব'লেই তিনি চাকরদের হাঁক-ডাক শুরু করলেন। দু'জন চাকর আসতেই তিনি হুকুম দিলেন—এক্ষুনি দু'-ড্রাম জল তুলে স্নানের ঘরে রেখে দাও। বাবুসাহেব রাত্রিবেলা স্নান করবেন। রোজ এঁর জন্য তোমরা সকালবেলাতেই জল তুলে রাখবে। ইনি আমার সম্মানিত মেহ্‌মান। সর্বদা এঁর খিদমতে হাজির থাকবে, আর যেন বলতে না হয়।

তারপর মীর-সাহেবকে ডেকে বললেন—আমার এই মেহ্‌মানটির সঙ্গে আপনার পরিচয় হয়েছে?

মীর-সাহেব বললেন—হাঁ, হাঁ, খুব।

আমার দিকে ফিরে সৈয়দ-সাহেব বললেন—দিল্লীর ইতিবৃত্ত এঁর চেয়ে ভালো আর কেউই জানে না।

তারপর মীর-সাহেবের দিকে ফিরে বললেন—আপনি আমার বন্ধুকে দিল্লী শহরের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিন।

মীর-সাহেব উৎসাহে একরকম লাফিয়ে উঠে বললেন—খুব—খুব। কালই আমার গাড়ি নিয়ে আসব, রোজই আপনাকে নিয়ে ঘুরে ঘুরে দিল্লী শহর বেড়িয়ে আনব।

সেদিন আরও কিছুক্ষণ গল্প ক'রে সৈয়দ-সাহেব উঠে গেলেন। মীর-সাহেবের বক্তৃতার কিন্তু আর শেষ নেই। তিনি দিল্লী শহরের প্রশস্তি গাইতে লাগলেন—আপনি এমন শৌখীন লোক, অথচ কাল আমায় যদি বলতেন তা হ'লে কাল থেকেই কাজে লেগে যেতাম। কিন্তু যাক, কাল দুপুর থেকে আমরা কাজে বেরোব।

সেদিনটা তো একরকম কাটল। পরের দিন খাওয়া-দাওয়া সেরে একটু গড়াবার ব্যবস্থা করছি এমন সময় মীর-সাহেব হন্তদন্ত হয়ে এ'সে বললেন—দয়া ক'রে তশরীফ্‌ তুলুন, আপনার গাড়ি হাজির।

তশরীফ্‌ তুলে বাইরে দেখি এক অদ্ভুত জিনিস আমার জন্য অপেক্ষা করছে। সেটাকে গাড়ি বলব, না কী বলব—হাসব না কাঁদব, দস্তুরমত বিড়ম্বনায় পড়া গেল। জমি থেকে হাত-দেড়েক উঁচু একটা তক্তা, তার নিচে চাকা বসানো। কোন্ পুরাকালে একদা সেটি বোধহয় একটা এক্কা ছিল—এখন সেটি ফক্কায় দাঁড়িয়েছে। একটি ছাগলের আকৃতি ঘোড়া, দু'টো বাঁশ দিয়ে তৈরী কম্পাস, জীর্ণ দড়ি ও জীর্ণ চামড়ায় গেরো বেঁধে বেঁধে তৈরী রাশ—এই হচ্ছে গাড়ির মাল-মসলা। ঘোড়ার কানের কাছে দু'দিকে দু'টো ছেঁড়া ধুলধুকড়ি ন্যাকড়া ঝুলছে।

সেইরকম ন্যাকড়া কম্পাসে ও আরো অনেক জায়গায় এখানে ওখানে সেখানে ঝুলতে দেখলুম। কাছে গিয়ে ভালো ক'রে পরীক্ষা করতে বুঝতে পারলুম, সেগুলো একসময় রঙিন কাপড়ের টুকরো ছিল এবং গাড়ি ও ঘোড়ার বাহার-স্বরূপে বাঁধা হয়েছিল।

গাড়ির ছত্রী নেই। যে চারটে ডাণ্ডায় ছত্রী লাগানো থাকে তাও নেই। অতএব কী ধ'রে যে গাড়িতে ব'সে থাকব আমার কাছে তা একটা সমস্যা হয়ে থাকল।

গাড়ি ও ঘোড়ার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে গাড়োয়ানটির চেহারা। এদিকে মীর-সাহেব তো 'তশরীফ্ রাখিয়ে' 'তশরীফ্ রাখিয়ে' ব'লে তাড়া দিতে লাগলেন—তারপর নিজেই কিরকম ক'রে রাস্তা থেকে লাফিয়ে উঠে ধপ ক'রে গাড়িতে ব'সে পড়লেন। কিন্তু আমি চাকার 'গুলো'তে পা দিয়ে এক হাতে গাড়োয়ানকে, অন্য হাতে মীর-সাহেবকে ধ'রে উঠে তো বসলুম। কিন্তু জায়গা এত সঙ্কীর্ণ যে তাতে তিনজনের সঙ্কুলান হয় না। তবুও যেখানে বসেছি সেই তক্তাটাকেই দু'হাতে ধ'রে রইলুম। ভাবলুম—রাস্তার লোকে হাসবে তো হাসুক এখন প্রাণটা বাঁচলে হয়। ওদিকে গাড়ি চলতে আরম্ভ করেছে।

ধীরে সন্তর্পণে মারালগতিতে গাড়ির চাকা একবার এদিকে, একবার ওদিকে হ্যাঁকোচ-প্যাঁকোচ করতে করতে চলতে লাগল। চাকা তো চলতে লাগল, সঙ্গে সঙ্গে আমার অবস্থাও শোচনীয় হয়ে উঠল। সেই অল্প-পরিসর জায়গায় আসন-পিঁড়ি হয়ে ব'সে থাকবার উপায় নেই। মীর-সাহেবের মতন যে পা ঝুলিয়ে বসব তাও ভয়ে পারছিনে। ওদিকে মীর-সাহেব ক্রমেই ঠেলে ঠেলে আমাকে একেবারে ধারে এনে ফেলেছেন। শেষকালে উবু হয়ে ব'সে তাঁকে জড়িয়ে ধরলুম। কিন্তু তিনি মস্তলোক—তাঁর সেদিকে ভ্রূক্ষেপই নেই। আমাদের গাড়ি চলতে লাগল চকের ভিতর দিয়ে।

মনে করেছিলুম যে গাড়ি-ঘোড়া ও সওয়ারিদের অবস্থা দেখে রাস্তার লোক হাসাহাসি করবে, কিন্তু দেখলুম তারা কেউ ভ্রূক্ষেপই করছে না। দিল্লীর এইসব রাস্তায় শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ'রে যে-সব হাসিকান্নার স্রোত ব'য়ে গিয়েছে, যার নিশ্বাস এখানকার আকাশে-বাতাসে মিশিয়ে আছে, এখানকার পথের ধুলোর রেণুতে যা ছড়িয়ে আছে—দিল্লীবাসী সেদিনের জীর্ণতার মধ্যে প'ড়ে-প'ড়েও গত দিনের ঐশ্বর্য-সমারোহের স্বপ্নে বিভোর হয়ে আছে। কোথা দিয়ে একটা ভাঙা গাড়ি গেল কি না-গেল তা তারা গ্রাহ্যই করে না। আমাদের অশ্বিনীতনয়

তাদের ঔদাসীন্যকে উপেক্ষা ক'রে টুকটুক এগিয়ে চলেছে এমন সময় হঠাৎ মীর-সাহেব প্রকাণ্ড এক চিৎকার দিলেন—রাক্‌-ও-ও-ও ও—

ফট্ ক'রে গাড়ি থেমে গেল। মীর-সাহেব লাফ দিয়ে পথে নেমে চিৎকার করতে লাগলেন—এই বাড়ি—এই বাড়ি—

সেই দিবা-দ্বিপ্রহরে পথের লোক খুব কমই চলছিল। যা দু'-একজন চলছিল তারা মীর-সাহেবের অভিনয় দেখে থমকে দাঁড়িয়ে গেল। গাড়ি থেকে নেমে পড়লুম।

সামনেই একটা বাড়ি। যতদূর মনে পড়ছে মোটা-মোটা থামও আছে সে-বাড়িতে। রাস্তা থেকে সিঁড়ি উঠে গেছে। মীর-সাহেব বলতে লাগলেন—এই সিঁড়িতেই দিল্লীর বাদশাহী শেষ হয়েছে।

চুপ ক'রে রইলুম। সিঁড়িতে বাদশাহী শেষ হয় কি ক'রে তাই ভাবতে লাগলুম, এমন সময় মীর-সাহেব ব'লে উঠলেন—ভারতবর্ষের শেষ তিনজন রাজপুত্রকে হত্যা ক'রে এই সিঁড়ির উপর ফেলে রাখা হয়েছিল দর্শনীয় বস্তুরূপে।

বলতে বলতে মীর-সাহেব ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে ফুলে উঠতে লাগলেন। তিনি বলতে লাগলেন—হারামজাদা মিছিমিছি বিনা-দোষে এই রাজপুত্রদের হত্যা ক'রে এইখানে এনে ফেলে রেখেছিল।

তিনি ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট সম্বন্ধে আরো অনেক সাংঘাতিক সাংঘাতিক কথা বলতে আরম্ভ করলেন। দিল্লী শহরে দিবা-দ্বিপ্রহরে সেই প্রচণ্ড রোদে তপ্ত পাথরের ওপর দিয়ে লোক-চলাচল তখন প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। মীর-সাহেবের হালচাল দেখে দু'টি-একটি ক'রে লোক দাঁড়াতে আরম্ভ করলে। তিনি হয়তো মনে করেছিলেন—ব্রিটিশ সাম্রাজ্য উবে গেছে, আবার মোগল যুগ ফিরে এসেছে। কিন্তু আমি তো কলকাতার লোক—আমি সে-কথা ভুলি কি ক'রে! এবং এখানে দাঁড়িয়ে এইসব সাংঘাতিক বিশেষণাবলী শোনায় বিপদ আমারই সর্বাপেক্ষা বেশি। এই ভেবে মীর-সাহেবকে একরকম টেনে নিয়ে গাড়িতে চড়িয়ে দিলুম।

গাড়ি মীর-সাহেবের নির্দেশক্রমে ঘুরে ঘুরে যে-পথ দিয়ে এসেছিল, আবার সেই পথ দিয়েই ফিরে চলল। কিছুদূর গিয়ে বাগানের সামনেই গাড়ি দাঁড় করিয়ে একটা ছোট্টমত মসজিদ দেখিয়ে তিনি বলতে লাগলেন—এই সোনা-মসজিদে দাঁড়িয়ে নাদির শা এই মহল্লার হত্যাকাণ্ড দেখেছিলেন। প্রায় লক্ষ নর-নারী ও শিশু হত্যা হবার পর দিল্লীর বাদশা মহম্মদ শা মুখে কুটো নিয়ে

হাত জোড় ক'রে এসে নাদির শা-কে সেই হত্যাকাণ্ড বন্ধ করতে অনুরোধ করায় নাদির শা-র হুকুমে সেই হত্যা বন্ধ হল।

কিন্তু নাদির শা দিল্লী শহরের ছোট-বড় সমস্ত 'রইস'-এর ওপর হুকুম জারি করলেন—তাদের ঘরে যত ধনরত্ন আছে সব নিয়ে আসতে হবে। দিল্লীর বাদশাদের সাত-পুরুষ ধ'রে জমা-করা যে-সব ধনরত্ন দিল্লী ও আগ্রার দুর্গে জমা করা ছিল, সেইসব নিয়ে দিল্লীর বাদশার একটি মেয়েকে নিজের ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে নাদির শা দেশে ফিরলেন।

কিন্তু সে-সব ধনরাশি তিনি তাঁর দেশে নিয়ে যেতে পারেননি। পথে শিখ ও জাঠেরা সে-সব লুঠতরাজ ক'রে নিলে।

একে সেই প্রচণ্ড রোদ, তার ওপর কেঁপে-কেঁপে উঠে বলতে-থাকা মীর-সাহেবের মুখে এইসব বৃত্তান্ত শুনতে শুনতে আমার চাঁদি গরম হয়ে উঠতে লাগল। আমি আর বেশিক্ষণ সহ্য করতে না পেরে বললুম—এবার চলুন যাওয়া যাক, আমার শরীরটা ভালো লাগছে না।

আমার কথা শুনে তাঁর সম্বিৎ ফিরে এল। তিনি গাড়োয়ানকে হুকুম দিলেন—ফিরে চল।

বাসায় ফিরে অত্যন্ত অসুস্থ বোধ করতে লাগলুম। মীর-সাহেব কি-সব ব'কে যাচ্ছিলেন—সেদিকে কান দেবার মতো সামর্থ্য আর খুঁজে পাচ্ছিলুম না। আমি সোজা লেটিয়ে পড়লুম।

আমাকে শুয়ে পড়তে দেখে তিনি বললেন—আচ্ছা, আপনি আরাম করুন, আমি কাল বারোটায় গাড়ি নিয়ে আসব।

মীর-সাহেব তো আমাকে আরাম করতে ব'লে চ'লে গেলেন—কিন্তু আমার মনে হ'তে লাগল, বুঝি সর্দিগর্মি হয়েছে। মাথার মধ্যে কিরকম যেন করতে লাগল। মনে হ'তে লাগল যে, দিল্লী শহরের অতীত ইতিহাসের সমস্ত ভূত আমার ঘাড়ে এসে চেপেছে। দেহের তো এই অবস্থা, আবার মনেও শান্তি পাচ্ছিলুম না, কারণ মীর-সাহেব ব'লে গেছেন—কাল বারোটার সময় আবার গাড়ি নিয়ে আসবেন। সময় বুঝে এক্ষুনি পালাতে পারলে সবচেয়ে ভালো হ'ত, কিন্তু শরীরের এমন অবস্থা দাঁড়াল যে, ওঠবার মতন অবস্থা আর রইল না। বোধ হয় আমি অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলুম।

* * *

সন্ধ্যেবেলা জেগে উঠে ঠাণ্ডা জলে স্নান ক'রে কথঞ্চিৎ সুস্থ বোধ হ'তে লাগল।

প্রেসের দু'জন লোক এসে আমার কাছে শুয়েছিল, তাদের দেখে—যদিও তারা ঘুমিয়ে ছিল—আমার একটু ভরসা হল। অনেকক্ষণ বাদে আমার খাবারটুকু খেয়ে—আবার লম্বা হওয়া গেল।

পরের দিন বেলা দ্বিপ্রহরে মীর-সাহেব ঠিক এসে হাজির। গোলাপী নেশার মতো একটু ঘুম এসেছিল, কিন্তু মীর-সাহেবের তাড়ার চোটে 'তশরীফ্' ওঠাতেই হল। বাইরে গিয়ে দেখি—মীর-সাহেবের গাড়ির খোল-নলচে দুই-ই বদলানো হয়েছে।

সেই ছোট্ট পাটাতনটুকুর চারপাশে চারটি রঙিন দণ্ড লাগানো হয়েছে, তার ওপরে সাদা ধপধপে ছত্রী। মেয়ে-সওয়ারির জন্য তিন দিকে তিনটি পর্দাও ঝুলছে।

সব থেকে মজা লাগল, সেই বাহাদুর ঘোড়ার দুই চোখের মধ্যিখান থেকে প্রায় নাসারন্ধ্র অবধি লম্বিত একটি শোলার কদমফুল দেখে। বেশ বোঝা গেল, অনেকদিন পর নতুন অলংকার পেয়ে ঘোড়াটিও গর্বিত বোধ করছে। গতকাল আমার এখান থেকে বিদায় নিয়ে বোধহয় আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ ক'রে মীর-সাহেব আমার আরামের জন্য তাঁর সেই গাড়ির এই সংস্কারসাধন করেছেন।

মীর-সাহেব সৈয়দ-সাহেবের মতন অবস্থাপন্ন লোক নন, সে-কথা বেশ বুঝতে পারা যেত; কিন্তু সেই অবস্থার মধ্যে পয়সা খরচ ক'রে তিনি আমার জন্য যে গাড়ির এই সংস্কারসাধন করলেন—এতে তাঁর জন্য আমার দুঃখ হতে লাগল। কিন্তু দুঃখ হ'লেও, কি জানি তাঁকে আমার পরম বন্ধু ব'লে মনে হ'ল। আমি সারাজীবন ধ'রে এইভাবে স্বল্পপরিচিত নর-নারীর কাছ থেকে কত যে সাহায্য পেয়েছি তার আর অন্ত নেই। মীর-সাহেবকে ভালো ক'রে না চিনলেও, তাঁর ভাষা ভালো বুঝতে না পারলেও আমার অন্তর তাঁকে বন্ধু ব'লেই স্বীকার ক'রে নিল।

যাই হোক, গাড়িতে চেপে ব'সে বেশ একটা ডাণ্ডা বাগিয়ে ধরলুম আর মীর-সাহেবের নির্দেশে কোচোয়ান গাড়ি চালাতে লাগল।

এ-গলি, সে-গলি, এ-পথ, ও-পথ দিয়ে আমরা প্রায় সারাদিনই কখনো হেঁটে কখনো গাড়িতে চ'ড়ে ঘুরে বেড়ালুম। মীর-সাহেব দেখাতে লাগলেন—এই পথ দিয়ে বন্দী দারাকে নিয়ে আসা হয়েছিল, এইসব রাস্তা দিয়ে তাঁর মুণ্ডহীন দেহ হাতিতে ক'রে ঘুরিয়ে বেড়ানো হয়েছিল—এইরকম কত কথা। এইখানে অমুক

'রইস'-এর বাড়ি ছিল, এটায় ওমুক ওমরাহের তমুক অনুগৃহীতা থাকতেন—ইত্যাদি কত লোকের সম্বন্ধে কত অদ্ভুত কাহিনী তিনি গড়গড় ক'রে ব'লে যেতে লাগলেন। সে-সব শুনতে শুনতে এমন সব ছবি প্রত্যক্ষবৎ আমার সামনে ভেসে উঠতে লাগল যে, তার সত্যাসত্য নির্ধারণ করবার ইচ্ছাও আমার মনে উদয় হল না। তিনি যা বলতে লাগলেন তাই সত্য ব'লে বিশ্বাস করলুম। এমনি ক'রে ঘুরতে ঘুরতে প্রায় সন্ধ্যেবেলা বাসায় ফিরে এলুম।

পরের দিন থেকে প্রতিদিনই আমরা বেরুতে লাগলুম। এইরকম-ভাবে ঐতিহাসিক নগরীতে ঘুরতে ঘুরতে আমারও কেমন একটা নেশা চ'ড়ে গেল। সমস্ত দিনটা যেন একটা স্বপ্নের ঘোরে কেটে যেতে লাগল।

একদিন আমরা একটা নির্জন স্থানে এসে পৌঁছলুম। সেখানে বাড়ি-ঘর-দোর সব ভাঙা-ভাঙা প'ড়ে রয়েছে। লোকজন আর সেখানে বাস করে না। স্থানটা বোধ হয় কেল্লার পেছনদিকে। মীর-সাহেব বললেন—এই জায়গায় গালিবের বাড়ি ছিল। গালিব-সাহেবের নাম শুনেছেন তো?

বললাম—তাঁর নাম হিন্দুস্থানের কে না জানে? তিনি সুবিখ্যাত উর্দু-কবি। ফরাসী কবিতা তিনি অনেক লিখেছেন।

গালিব-সাহেব মহম্মদ শা-র দরবার থেকে মাসোহারা পেতেন, কিন্তু তাতেও তাঁর খরচে কুলোত না। তাঁকে ঘিরে কত যে গল্প তৈরি হয়েছে তার ঠিক-ঠিকানা নেই এবং সে-সব কাহিনী দিল্লীবাসীর মুখে মুখে এখনও ফিরছে। তাঁর লেখার মধ্য থেকেই জানা যায় যে, তিনি ছিলেন অত্যন্ত গরীব। তাঁর সম্বন্ধে গল্প শুনতে শুনতে যে-লোকটির ছবি চোখের সামনে ফুটে ওঠে তাঁকে ভালো না বেসে আর থাকা যায় না। এমন একটি লোক দিল্লীতে সারাজীবন বাস করলেন এবং এইখানেই মারা গেলেন, অথচ দিল্লীবাসীরা তাঁর বাড়ির ঠিকানা রাখলে না—এটা অত্যন্ত দুঃখের কথা সন্দেহ নেই।

দিন-কয়েক রাস্তায় ঘোরাঘুরির পর মীর-সাহেব একদিন বললেন—কাল আমরা ইন্দ্রপ্রস্থে যাব। সেই কুতুবমিনার থেকে আরম্ভ করব। তার পরে একটু একটু ক'রে এগোনো যাবে।

জিজ্ঞাসা করলুম—ঘোড়া অতদূর এগোতে পারবে?

তিনি বললেন—দরকার হ'লে এ-ঘোড়া আপনাকে আগ্রায় পৌঁছে দিয়ে আসতে পারে। আজকাল রোজ ওকে এক সের ক'রে চানা দেওয়া হয়।

সে-সময় দিল্লী শহরে একপয়সা কি দেড়পয়সা দিলে এক সের ছোলা পাওয়া যেত। আমি বললুম—আরো কিছু বেশী দানা ওর জন্যে বরাদ্দ করুন।

মীর-সাহের তাচ্ছিল্যের সহিত বললেন—ওর চেয়ে বেশি ও হজম করতে পারবে না।

বাস্তবিকপক্ষে মীর-সাহেব, তাঁর গাড়ি-ঘোড়া ও তার চালক—এই তিনের দুর্লভ সমাবেশকে আমার অদ্ভুত ব'লে মনে হ'ত। ঘোড়া ইঙ্গিতে চলে, চালকের মুখ থেকে এতদিনেও 'হাঁ' কিংবা 'না' কিংবা অন্য কোনো কথা একটাও শুনতে পাইনি। আর মীর-সাহেবের অনর্গল বক্তৃতার তো শেষই নেই।

যাই হোক—পরের দিন থেকে আমাদের পুরাতন দিল্লীর ধ্বংসস্তূপ পরিক্রমা আরম্ভ হল। সেই পুরাতন ইতিবৃত্ত মীর-সাহেবের কথায় নতুন রূপ ধরতে লাগল। কয়েকদিন ঘুরে ঘুরে মীর-সাহেব হুমায়ুনের সমাধিতে করলেন ভর। বেলা দু'টো-আড়াইটার সময় আমরা হুমায়ুনের সমাধিতে এসে বসতুম।

বেশ উঁচু প্রশস্ত চাতাল, তার উপরে সমাধি-মন্দির। মন্দিরও বেশ প্রশস্ত। সেইখানে ঠাণ্ডায় ব'সে মীর-সাহেবের কথা শুনতুম। শুনতে শুনতে দিল্লীর ঐ নিদারুণ দ্বিপ্রহরের রৌদ্রেও সান্ধ্য নেশা জমে উঠত।

একদিন মীর-সাহেব সমাধি-মন্দিরের কোণে একটা ঘর দেখিয়ে বললেন—এটা কি জানেন?

—আজ্ঞে, না।

মীর-সাহেব বলতে শুরু করলেন—দিল্লীর সেই দুর্দিনে দিল্লীর সম্রাট বাহাদুর শা আত্মরক্ষার জন্য সপরিবারে পালিয়ে এসে এই ঘরে লুকিয়ে বসেছিলেন। গুপ্তচরেরা গিয়ে ইংরেজদের খবর দিলে, আর তক্ষুনি তারা সদলবলে এসে তাঁদের গ্রেফতার ক'রে হিঁচড়োতে হিঁচড়োতে টেনে নিয়ে গেল।

বলতে বলতে মীর-সাহেব ক্ষিপ্তপ্রায় হয়ে উঠলেন। চিৎকার ক'রে বলতে লাগলেন—একবার কল্পনা করুন সেই দৃশ্য। হুমায়ুন বাদশার আগে যিনিই ভারতের সিংহাসনে বসুন না কেন, সত্যি ক'রে বলতে গেলে হুমায়ুন বাদশাই মোগল সাম্রাজ্য দেশে কায়েম ক'রে গিয়েছিলেন। ঐ কোণে তাঁর বেগম হামিদাবানুর সমাধি রয়েছে—ঐ দেখুন! এঁদের সামনে দিয়ে এঁদেরই শেষ বংশধরদের ইংরেজ হিঁচড়ে টেনে নিয়ে চ'লে গেল। দিল্লী তখন আগুনে ফুটছে! একদিকে ইংরেজ সৈন্যদের অত্যাচার, অন্যদিকে সিপাহীদের গোলমাল। তার ওপরে দস্যু-তস্করেরা প্রকাশ্য দিবালোকে লোকের বাড়িতে ঢুকে লুঠ-তরাজ

করছে। হডসন ব'লে একজন সেনানী এঁদের ধ'রে নিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ একটা জনতার চিৎকার শুনে সেইখানেই তৎক্ষণাৎ হাতির পিঠ থেকে তিন রাজপুত্রকে টেনে রাস্তায় নামিয়ে দমাদ্দম গুলী ক'রে মেরে ফেললে। রাজপুত্রেরা এই রাস্তার ওপরেই হাঁটু গেড়ে ব'সে প'ড়ে হাত জোড় ক'রে অনুনয় করেছিল—আগে দয়া ক'রে অনুসন্ধান করুন—আমরা নির্দোষ কিনা! কিন্তু সে-কথা কে শোনে!

বলতে বলতে মীর-সাহেব দৌড়ে গিয়ে হুমায়ুনের সমাধির সামনে হাঁটু গেড়ে ব'সে বিড়বিড় ক'রে কি-সব বলতে লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রবলবেগে সমাধিতে মাথাও ঠুকতে লাগলেন।

মীর-সাহেবকে যতই দেখতে লাগলুম, ততই অভিনব ব'লে মনে হ'তে লাগল।

নিত্য নতুন রূপ!

তাঁর সঙ্গ আমার শেষপর্যন্ত নেশায় দাঁড়িয়ে গেল।

একদিন হুমায়ুনের সমাধিতে আমরা ব'সে আছি, এমন সময় বৃষ্টি নামল।

বেশ লাগছিল।

চারদিকের সেই তপ্ত পাথরের মধ্যে ঝমঝম বৃষ্টি আমার মনের মধ্যে কাব্য-সৃজন করছিল। মীর-সাহেবের বগলে একটা ক'রে দপ্তর থাকতই। সেদিন এই দপ্তর থেকে একটি চটি লম্বা-মতন বই বার ক'রে তিনি চেঁচিয়ে পড়তে আরম্ভ করলেন। পড়তে পড়তে তাঁর কণ্ঠস্বরে অশ্রুর আমেজ এসে লাগল। তারপরে এল একটু সুর। তারপর তিনি দস্তুরমত গান ধরলেন।

করুণ সে কবিতা। তার ধ্বনি-মাধুর্যেই ধরা যায় যে, সে-কবিতায় করুণার প্রস্রবণ ছুটেছে। মীর-সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলুম—কার লেখা?

তিনি বললেন—এ-কেতাবের নাম দেওয়ান-এ-জাফর-শা। সে-কেতাব ভারতের শেষ বাদশা বাহাদুর শাহের লেখা।

এই ব'লে তিনি কবিতার খানিকটা আমাকে বুঝিয়ে দিয়ে গান ধরলেন।

গাইতে গাইতে কিছুক্ষণের মধ্যে তাঁর দুই চোখ বেয়ে অশ্রু ঝ'রে পড়তে লাগল।

অশ্রু জিনিসটা অত্যন্ত সংক্রামক। তাঁর চোখে অশ্রু দেখে আমার চোখেও অশ্রু উদ্‌গত হল।

বাইরে ঝমঝম ক'রে বৃষ্টি ঝরছে, আমরা দু'টিতে সেই সমাধি-মন্দিরের মধ্যে ব'সে আছি। মনের মধ্যে হাহাকার ক'রে বেড়াচ্ছে—'দেওয়ান-এ-জাফর-শা'-এর

বয়েৎ—'হায় জাফর, তামাম হিন্দুস্থানের সম্রাট ছিলে তুমি—কিন্তু আজ তোমার সমাধির জন্য সাড়ে-তিন-হাত জমিও জুটল না!'

আজ অতীতের সেই দিনগুলি টুকরো টুকরো হয়ে মানসসাগরের উপরে ভেসে উঠছে দুর্দিনের সুখস্বপ্নের মতো। মনে হচ্ছে, সেদিনের সেই অভিজ্ঞতাগুলো আমার জীবনে কোন্ কাজে লেগেছে!

* * *

মীর-সাহেবের সঙ্গে আমার ছাড়াছাড়ি কি ক'রে হল, সেই কথাটা ব'লে এই প্রসঙ্গ শেষ করি। আগেই বলেছি, মীর-সাহেবের সঙ্গ আমার একটা নেশার মতো দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। ঠিক দ্বিপ্রহর হবার সঙ্গে-সঙ্গেই আমি অনুভব করতুম সেই দূরের ধ্বংসস্তুপ যেন আমাকে আকর্ষণ করছে। মীর-সাহেবের আসতে একটু দেরি হ'লে তাই আমি অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করতুম।

একদিন দ্বিপ্রহরে আমি ও মীর-সাহেব শের-মণ্ডল পরিক্রমণ করছি। ছাতের ওপর উঠে চারদিক দেখে নামবার উপক্রম করছি, এমন সময়ে মীর-সাহেব চিৎকার ক'রে বললেন—এইখান দিয়ে নামতে গিয়ে হুমায়ুন বাদশা প'ড়ে গিয়েছিলেন। তিনি আর সংজ্ঞা ফিরে পাননি। সেই অবস্থাতেই তাঁর মৃত্যু হয়েছিল।

সত্যি বলতে কি, সেই জায়গাটি এমন সঙ্গীন যে, সাধারণ লোকেরও ওঠা-নামা করতে ভয় হয়। বাদশা তো কোন্ ছার! যাই হোক, আমরা তো নামছি,—মীর-সাহেব আগে আর আমি পেছনে। এমন সময় হঠাৎ মীর-সাহেব একটা পা শূন্যে তুলে টাল খেয়ে নিচে প'ড়ে যাবার উপক্রম করলেন। আমি সঙ্গে সঙ্গে পেছন থেকে মুণ্ডুটা টেনে ধ'রে উপরে ছাতে তুলে আনলুম। তারপর তাড়াতাড়ি নিচে নেমে, একরকম দৌড়ে রাস্তায় এসে গাড়িতে পড়লুম।

বেশ খানিকক্ষণ পরে মীর-সাহেব হাঁপাতে হাঁপাতে এসে উপস্থিত হ'লেন। আমাকে একরকম ধমকের সুরে বললেন—বেশ তো আপনি! আমি প'ড়ে গিয়ে দেখছিলুম, বাদশার মতো অজ্ঞান হয়ে পড়ি কিনা, আর আপনি কিনা আমায় ধ'রে সব নষ্ট ক'রে দিলেন!

আমি আর এ-কথার কি জবাব দেব! আমার বুকের মধ্যে তখনও ধড়ফড় করছিল। গাড়ি ঘুরে অভ্যাসমত হুমায়ুন বাদশার কবরের দিকে চলতে লাগল, কিন্তু আমি মীর-সাহেবকে বললুম—আমার শরীর ভালো লাগছে না—বাড়ি ফিরে চলুন।

শরীর ভালো লাগছে না শুনে তিনি অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। বলতে লাগলেন—নিশ্চয়ই আপনার সর্দিগর্মি হয়েছে।

মীর-সাহেব গাড়োয়ানকে হুকুম দিলেন—বাড়ির দিকে চল।

এদিকে সর্দিগর্মি হয়েছে শুনে আমার তো বুকের মধ্যে ধড়ফড়ানি আরো বেড়ে গেল।

বাড়িতে পৌঁছিয়েই বিছানায় লেটিয়ে পড়লুম। মীর-সাহেব কানের কাছে কি-সব বকর-বকর করতে লাগলেন—সেদিকে মন দিলুম না।

—কাল আবার যথাসময়ে আসব—এই ব'লে মীর-সাহেব বাসায় চ'লে গেলেন।

শুয়ে শুয়ে কেবল মনে হ'তে লাগল—আজ হাতে দড়ি পড়েছিল আর কি! মনের মধ্যে কে যেন বলতে লাগল—'দিব্যি আছ যাদু, পরের বাড়িতে থাকছ, দু'বেলা পলান্ন পরম পরিতোষের সঙ্গে আহার করছ আর দ্বিপ্রহরে একটা পাগলার সঙ্গে নেচে নেচে দিন কাটাচ্ছ। বেশ চুটিয়ে চাকরি হচ্ছে!'

এতদিন বৃথাই কাটিয়েছি ব'লে সত্যিই আফসোস হ'তে লাগল। সংকল্প করলুম, কালই এখান থেকে লম্বা দিতে হবে।

পরের দিন সৈয়দ-সাহেব আসামাত্র জানালুম—আজ এক্ষুনি আমি দিল্লী ত্যাগ করছি। আপনি যা উপকার করেছেন, তা আমার চিরদিন মনে থাকবে।

আমি চ'লে যাচ্ছি শুনে সৈয়দ-সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন—আমাদের দিক থেকে 'মেহ্মান-নেওয়াজী'র কোনো 'খিলাফ' হয়েছে কি?

আমি বললুম—কিছুমাত্র না। কিন্তু আরো দশটা শহরে আমাকে যেতে হবে তো।

সৈয়দ-সাহেব বললেন—আবার দিল্লীতে এলে আমার এখানে এসেই উঠবেন। এই ঘর সর্বদা আপনার জন্য খোলা থাকবে।

এখানে ব'লে রাখি, বছর দু'-তিনেকের মধ্যেই একবার দিল্লীতে গিয়েছিলুম। কিন্তু 'আফ্‌তাব' তখন অস্তমিত এবং সৈয়দ-সাহেব যে কোথায় ডুব মেরেছেন তার সন্ধান পাওয়া গেল না।

যাই হোক, সৈয়দ-সাহেবকে ব'লে তো তখুনি ইস্টিশনে চ'লে এলুম। আগে থাকতেই ঠিক হয়েছিল আমি পাঞ্জাবের দিকে খানিকটা অগ্রসর হয়ে আগে চ'লে আসব, কিন্তু কেন জানি না আমার আর ওপরের দিকে উঠতে ইচ্ছে হল না।

বেলা চারটের সময় জি.আই.পি.-র গাড়িতে চ'ড়ে আমি বোম্বাই-এর দিকে যাত্রা করলুম।

ভোরবেলা গাড়ি এসে থামল ঝাঁসী স্টেশনে। এর আগেও বার-দুয়েক এই রাস্তায় আসা-যাওয়া করেছি। ঝাঁসী স্টেশন থেকে পাহাড়ের ওপরের ছোট দুর্গটি আমাকে বরাবরই আকর্ষণ করেছে। এবারে স্টেশনে গাড়ি থামা-মাত্র বাক্স-বিছানা নিয়ে আমি নেমে পড়লুম। টাঙ্গাওয়ালা একটা সরাইখানায় নিয়ে গিয়ে পৌঁছল।

সেই মামুলি সরাই। একটি ঘরে একটি দরজা!

যাই হোক, জিনিসপত্র রেখে, আমি আমার ব্যাগে ব্যবসার পক্ষে জরুরী জিনিস নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম। কয়েকদিন দিল্লীতে বৃথা কাটিয়ে মনের মধ্যে অনুশোচনা হচ্ছিল, তাই সকাল থেকেই কাজে লেগে গেলুম।

তখনও লোকজন ওঠেনি। আমি খুঁজে খুঁজে একটা চায়ের দোকান বার ক'রে সেখানে চা-খাওয়ার নামে ঘন্টাখানেক কাটিয়ে গ্রাহক পাকড়াবার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লুম।

রাস্তায় ঘুরে ঘুরে এ-বাড়ি সে-বাড়ি দরজা ঠেলে সেদিন বেলা বারোটার মধ্যে জন-পাঁচেক লোককে গেঁথে ফেলা গেল। একদিনের পক্ষে অনেক কাজ হয়েছে মনে ক'রে এক ময়রার দোকান থেকে বেশ ক'রে কচুরি-আলুরদম ঠেসে, সরাইয়ে ফিরে, টেনে একটি ঘুম দেওয়া গেল।

ঝাঁসীতে আশাতীতভাবে আমার কাজ হ'তে লাগল। দিল্লীতে যে-ক'দিন বৃথাই কাটিয়েছিলুম, ঝাঁসীতে মাত্র কয়েকদিনের মধ্যে তার চেয়ে বেশি কাজ পেয়ে গেলুম।

আগেই বলেছি বিকেলে কাজেই বেরুতাম না, কিন্তু একদিন কি খেয়াল হল বিকেলবেলাতেই আমার জিনিসপত্র নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম। কিন্তু কাজ করতে মন লাগছিল না। তাই কেল্লার পাহাড়েই উঠে পড়া গেল।

পাহাড় মানে পাথরের খানিকটা উঁচু ঢিপি। আমার জিনিসপত্র একটা কালো পাতলা কাঠের বাক্সের মধ্যে থাকত। সেইটে বয়ে নিয়ে বেড়ানো ছিল সুবিধাজনক। পাহাড়ে উঠে আমি কেল্লার এদিক-ওদিক দেখছি এমন সময় একটা নোটিশের দিকে নজর পড়ল। তাতে লেখা রয়েছে—এই কেল্লার

কোনো জায়গার ফোটো যদি কেউ নেয় তা হ'লে সে আইন-অনুসারে দণ্ডনীয় হবে।'

ছোট্ট কেল্লা।

বাইরে থেকে দেখবার বিশেষ কিছু নেই।

আমি সেদিক থেকে সরে এসে সূর্যাস্ত চেয়ে দেখছি এমন সময় আমার পাশ থেকে একটি ভদ্রলোক ইংরেজিতে বললেন—এখানে ফোটো-নেওয়া বারণ।

আমি বললুম—এটা ক্যামেরা নয়, এতে অন্য জিনিস আছে।

লোকটির বয়স বেশি নয়, ছাব্বিশ-সাতাশ বছর হবে, সুন্দর চেহারা। আমায় হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করলেন—আপনার বাড়ি কোথায়?

আমি বললাম—কলকাতায়।

তিনি সবিস্ময়ে পরিষ্কার বাংলায় বললেন—আমরা বহুকাল কলকাতায় বাস করেছি। বাঁশতলা গলিতে আমরা থাকতুম। আমি এনট্রান্স পাস করবার পর আমার বাবা রিটায়ার ক'রে আমার লেখাপড়ার জন্য আগ্রায় বাস করছিলেন। আগ্রা থেকেই আমি বি.এল্. পাস করি।

আমি বললাম—তাহ'লে তো আপনি বাংলা বলতে পারেন।

তিনি ইংরেজিতেই বললেন—আমি ভালো বলতে পারি না, কিন্তু আমার বোন, সে বাংলা ইস্কুলে পড়ত, সে আপনাদের মতোই বাংলা বলতে পারে।

কথাবার্তা এগোতে লাগল। কথাবার্তা শুনে মনে হল তিনি বেশ অমায়িক লোক। একবার কথা বলতে বলতে আমার কাঁধের কাছে তাঁর মুখটা এনে গলা খাটো ক'রে জিজ্ঞাসা করলেন—এখানে খাওয়া-দাওয়ার কি ব্যবস্থা হচ্ছে? আপনাদের খাদ্য তো এখানে সহজে মেলে না।

আমি হেসে বললুম—তাই আপনাদের খাদ্য খেতে হচ্ছে!

ভদ্রলোক বললেন—এখানকার কাজ শেষ ক'রে আপনি আমাদের ওখানে চ'লে আসুন, আমি কথা দিচ্ছি—সেখানেও আপনার অনেক কাজ হবে। তা ছাড়া আমার বোন খুব ভালো মাংস রাঁধতে পারে। আপনাদের 'লোচি'-ও সে ভালো ক'রে তৈরি করতে পারে। তা আপনি মেহ্‌মান—আপনার জন্য এসব তৈরি হ'লে রোজ সন্ধ্যাবেলা আমারও কিছু জুটবে। কতদিন যে 'মাংস' খাইনি!

বলতে বলতে ভদ্রলোক জিহ্বা ও তালুতে চটাং ক'রে একটা আওয়াজ করলেন।

তাঁর বাড়ির সংবাদ নিলুম। এই শহর থেকে দূরে অন্য মহকুমার একটা

শহরে তিনি বাস করেন। তিনি সেখানকার উকিল এবং কথাবার্তায় বুঝলুম পসারও ভালো আছে। ভদ্রলোক আমার নাম জেনে নিলেন এবং বললেন—আমার নাম দেওকীনন্দন ভার্গব।

কথা বলতে বলতে আমরা পাহাড়ের নিচে নেমে এলুম। তাঁকে টেনে একটা চায়ের দোকানে নিয়ে গেলুম। চা খেতে খেতে আলাপ রীতিমত জ'মে গেল। তিনি বললেন—এই রবিবারেই আসুন। সেখানে কিছুদিন থেকে আবার না-হয় আসবেন।

ভদ্রলোককে কথা দিলুম—নিশ্চয়ই যাব।

তিনি বললেন—চলুন, আপনার বাসা দেখে আসি।

সরাইখানায় আমার বাসা দেখে তিনি অনুতাপ ক'রে বললেন—ছি ছি, এরকম বাসায় থাকলে আপনি অসুখে প'ড়ে যাবেন।

মনে মনে হাসলুম।

সরাইয়ের বাইরে বেরিয়ে এসে তিনি তাঁর গন্তব্য স্থানে চ'লে গেলেন—আমিও সান্ধ্যকালীন আহার্যের ব্যবস্থায় মন দিলুম।

কচুরি আর রাবড়ি। তবে তখনকার দিনে খাঁটী ঘি আর খাঁটী দুধের অভাব ছিল না। এখনকার মতো সাপের চর্বি আর পচা গুঁড়ো-দুধের কারবার যদি তখন থাকত তাহ'লে যেখানে-সেখানে ঐসব খাবার খেয়ে এই জাতক লিখতে বসবার সুযোগ ঘটত না।

কয়েকদিন যেতে-না-যেতে একদিন সকালবেলায় দেখি দেওকীনন্দন এসে হাজির। উনি আমাকে একেবারে তুমি সম্বোধন ক'রে বললেন—চল বন্ধু, তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছি। কাল একটা কাজে এখানে এসেছিলুম—মনে করলুম রাতটা কাটিয়ে কাল সকালে তোমায় নিয়ে যাব।

এই ব'লে সে আমার বিছানাপত্তর বাঁধতে আরম্ভ ক'রে দিলে। তার এই আগ্রহ-ভরা আহ্বান উপেক্ষা করা সম্ভব হল না। বাইরেই টাঙ্গা দাঁড়িয়ে ছিল—সরাইওলাকে তার প্রাপ্য চুকিয়ে দিয়ে সওয়ার হওয়া গেল।

ঝাঁসী থেকে ঘণ্টাদেড়েক ট্রেনযোগে গিয়ে সেখানে পৌঁছলুম। স্টেশন থেকে বেশ খানিকটা দূরে তাদের বাড়ি। সেখানে গিয়ে যখন পৌঁছলুম, তখন বেলা এগারোটা বেজে গেছে। বাড়ির মধ্যে ঢুকে একটু গিয়েই দেওকীনন্দনের বাবার ঘর। সে আমায় নিয়ে সেই ঘরে ঢুকে বললে—এইটি আমার অফিস।

ঘরখানি সাজানো-গোছানো। চকচকে আলমারিতে আইনের বইগুলি ঝকঝক করছে। মফস্বলের উকিলের ঘরে সাধারণত এ-দৃশ্য দেখা যায় না। ঘরের খানিকটা জায়গা আলমারি সাজিয়ে পার্টিশন করা হয়েছে। ঘরের মধ্যে ঘর হ'লেও এ-জায়গাটিতেও বেশ আলো-বাতাস, সেখানে একখানি তক্তাপোশ পাতা রয়েছে।

দেওকীনন্দন আমায় বললে—এইখানে থাকতে তোমার কোনো অসুবিধে হবে কি? না হ'লে ওপরেও ঘর আছে—সেখানেও থাকবার ব্যবস্থা হতে পারে।

আমি বললুম—না, না—এ তো চমৎকার জায়গা। আমি কিরকম ঘরে থাকতুম, দেখেছ তো।

সে নিজেই তক্তাপোশের ওপর আমার বিছানা পেতে পরিষ্কার-ঝরিষ্কার ক'রে দিলে। ভাঙা টিনের বাক্সটা খাটের তলায় ঢুকিয়ে দিয়ে বাড়ির ভেতরদিকে তাকিয়ে ডাক দিলে—গোরি!

ভেতর থেকে ক্ষীণ নারীকণ্ঠের জবাব এল—আয়ি।

একটু পরেই হাত মুছতে মুছতে যিনি ঢুকলেন—কি ব'লে তাঁর বর্ণনা করব ঠিক বুঝতে পারছি না। 'গোরী' তো তিনি বটেনই, একেবারে যাকে বলে 'গোরোচনা গোরী'। সোনা-রঙের মধ্যে লালের আভা, তার ওপরে দীর্ঘাঙ্গী। পরিপূর্ণ নিটোল যৌবন। কিন্তু পরিপূর্ণ নিটোল যৌবন বললেও তার সবখানি বলা হয় না। এমন সৌষ্ঠব ও সুষমাময়ী নারী এত কাছে এর আগে কখনো দেখিনি।

অঙ্গে তাঁর একখানি মোটা আধময়লা থান, বাড়িতে কেচে কেচে সেখানা প্রায় লাল হয়ে এসেছে। গায়ে সেইরকমই সাদা একটি জামা।

দেওকীনন্দন আমাকে সম্বোধন ক'রে বললে—এই আমার বোন—নাম সুভগা। আমরা গোরি ব'লে ডাকি।

বোনকে সম্বোধন ক'রে সে বললে—বাবুজীকে ধ'রে এনেছি, ইনি এখন এখানে কয়েকদিন থাকবেন। এঁকে রোজ মাংস রেঁধে খাওয়াতে হবে।

মুখখানা আমার দিকে ফিরিয়ে স্মিতহাস্যে দু'খানি নিরাভরণ হাত তুলে আমাকে নমস্কার ক'রে পরিষ্কার বাংলায় বললেন—নমস্কার! আমার ভাই আপনার কথা আমায় বলেছেন। আপনার দেশে আমি জন্মেছি। বাঙালীদের ইস্কুলে অনেকদিন পড়েওছিলুম।

আমি বললুম—আপনি তো বেশ পরিষ্কার বাংলা বলেন।

গোরি বললে—পরিষ্কার বাংলা বলতুম, কিন্তু এখন আদৎ ছুটে গেছে।

দেওকীনন্দন বললে—বাবুজীকে যত্ন-আত্তি করবার ভার তোমার ওপরে রইল। আমি তো সারাদিন কাজের চাপেই থাকি।

সুভগা আমায় জিজ্ঞাসা করলে—এবেলা ভাত খাবেন না রুটি খাবেন? আমি তো একবেলা ভাত আর একবেলা রুটি খেতুম।

বললুম—ভাতই খাব। অনেকদিন ভাত খাইনি।

সুভগা আবার জিজ্ঞাসা করলে—চা-টা খাবেন?

চায়ের কথা শুনে দেওকীনন্দন লাফিয়ে উঠলো—হ্যাঁ, হ্যাঁ—দু'কাপ চা-ই পাঠিয়ে দাও।

সুভগার চেহারার মধ্যে পুরুষকে আকর্ষণ করবার শক্তি ছিল প্রবল। এই শক্তি শুধু চেহারার 'খুব-সুরতি'র উপর সব সময় নির্ভর করে না। এ এক অন্য বস্তু। অন্তত আমাকে তার সে-চেহারা এমনভাবে আকর্ষণ করলে যা ইতিপূর্বে কোনো নারী করেনি।

তারপর চা এল; চা খেতে খেতে দেওকীনন্দন তার সংসারের কথা কিছু কিছু আমায় শোনালে। সুভগার বিয়ে হয়েছিল—তার স্বামী বিলেতে পড়তে গিয়েছিল এবং সেইখানেই সে মারা যায়।

চা খাওয়া হল।

কিছুক্ষণের বিশ্রামের পর স্নান সেরে আহারাদি সারা হল, কিন্তু আমার মনের মধ্যে সারাক্ষণই সুভগার চিন্তা ও তার চেহারা ঘুরতে লাগল।

আহারাদির পর দেওকীনন্দন বললে—এখন কিছুক্ষণ বিশ্রাম কর।

বিছানা পেতে শুয়ে পড়লুম। ঘুমোবার চেষ্টা করতে লাগলুম কিন্তু ঘুম কোথায়! মন ঘুরতে লাগল সেই সুভগার আশেপাশে। মাঝে মাঝে তার চিন্তা মন থেকে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করতে লাগলুম কিন্তু সে মুহূর্তের জন্য। বিকেলবেলা দেওকীনন্দনের কাছে তার দু'-একজন বন্ধু এল। আমি দেশটাকে দেখবার জন্য বাড়ি থেকে বেড়িয়ে পড়লুম। বেরোবার সময় সে ব'লে দিলে—সন্ধ্যাবেলায় চা খাওয়ার আগে ফিরে এসো।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে লাগলুম। থেকে-থেকেই সুভগার চেহারা আমার মনের মধ্যে ঘুন্‌ঘুন্ করতে লাগল। যতই তার চিন্তা থেকে মনকে ছাড়িয়ে নিতে চাই—একটু পরেই দ্বিগুণ বেগে ততই আমার মন তারই চিন্তার দিকে ছুটে যায়। সে যেন আরব্য-উপন্যাস-বর্ণিত সেই বিরাট

চুম্বকের পাহাড় আর আমি সিন্ধবাদ নাবিকের জাহাজের পেরেকের মতো ছুটে গিয়ে তারই অঙ্গে লেগেছি।

যাই হোক, রাত্রিবেলা মাংস-রুটি খেয়ে শুয়ে পড়া গেল। মনে হল, সকালবেলা মন শান্ত হয়ে যাবে।

কিন্তু পরদিন ঘুম থেকে উঠেই প্রথমে তার চিন্তা শুরু হল। আমি আমার জিনিসপত্তর নিয়ে কাজে বেরিয়ে পড়লুম—ভাবলুম কাজে ব্যাপৃত থাকলে মন হয়তো অন্যত্র স'রে যাবে। কিন্তু কোথায় কি! দু'-একটা খদ্দেরের সঙ্গে কথাবার্তাও হল। কিন্তু মনের আর-একদিকে তার চিন্তা পাক খেতে লাগল। মনে-মনে ভাবলুম—এই কি ভালবাসা—এই কি প্রেম?

প্রেম একদিন এসেছিল আমার জীবনে কৈশোরের প্রারম্ভে অত্যন্ত আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত ভাবে। প্রকৃতির সমস্ত বাধাবিঘ্ন উপচে সে তার সমারোহ এনে ঢেলে দিয়েছিল আমার জীবনে। অস্বাভাবিক হ'লেও সে তার মর্ম-নিঙড়ানো মধুপাত্র এনে ধরেছিল আমার মুখের কাছে। কিন্তু প্রাকৃতিক কারণেই তাকে আবার ফিরে যেতে হয়েছিল আমার জীবনযজ্ঞকে পণ্ড ক'রে দিয়ে। এই কারণেই নারী এবং নারীর সঙ্গকে আমি সর্বদাই এড়িয়ে চলতুম। কিন্তু সমস্ত বাধাবিঘ্ন উপেক্ষা ক'রেই মন আমার অনিবার্যরূপে সুভগার দিকে ঝুঁকে পড়ল।

ক্রমেই গোরিকে কাছে পাবার, তার সঙ্গে কথা কইবার—মোট কথা, তার সঙ্গলাভ করবার প্রবল ইচ্ছা মনের মধ্যে তাড়া দিতে লাগল। সকালবেলা কাজকর্ম সেরে যখন বাড়ি ফিরতুম, তখন দেওকীনন্দন বাড়ি থাকত না। আমি বাড়ির ভেতর ঢুকে গুর্‌গুর্‌ ক'রে এটা ওটা সেটা—নানান কথা গোরিকে জিজ্ঞাসা করতুম। সে নিশ্চয়ই আমার মতলব বুঝতে পেরেছিল এবং মেয়েদের চারিদিকে যে রক্ষাকবচের আবরণী তাদের সমস্ত বিপদ থেকে আড়াল ক'রে রাখে, তা ক্রমেই শিথিল হয়ে পড়ছিল, অর্থাৎ আমাকে সে প্রশ্রয়ই দিচ্ছিল।

একদিন নিচে তাকে দেখতে না পেয়ে ঝিকে জিজ্ঞাসা করলুম—সে কোথায় আছে?

ঝি খানিকক্ষণ বাদে আমায় এসে বললে—আপনাকে ওপরে ডাকছেন।

আর বেশি কথা বলতে হল না, তড়াক ক'রে তিন লাফে দোতলায় উঠে গেলুম।

উঠে দেখি গোরি একটা তক্তাপোশে পা ছড়িয়ে ব'সে কি-যেন সেলাই করছে।

চেয়ার-টেবিল দিয়ে সুন্দর ক'রে সাজানো ঘর।

সে বললে—এটি আমার ঘর আর ঐ পাশে আমার বড়-ভাইয়ের ঘর।

সেদিন বিশেষ কিছু কথা হল না। কিন্তু দিনের পর দিন ক্রমেই আমরা পরস্পর পরস্পরের নিকটবর্তী হতে লাগলুম।

ঝাঁসী থেকে হঠাৎ চ'লে আসার দরুন কতকগুলো জরুরী কাজ ফেলে আসতে হয়েছিল। সেখান থেকে তাগাদা আসায় ইতিমধ্যে আমাকে একবার ঝাঁসীতে ফিরে যেতে হল।

দেওকীনন্দন তো কিছুতেই ছাড়বে না, কারণ এখানেও অর্ডার বেশ ভালোই পাওয়া যাচ্ছিল। শেষকালে—পাঁচ-ছ'দিনের মধ্যে ফিরে আসব—এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে আমাকে ঝাঁসীতে ফিরে যেতে হল। কিন্তু গোরির প্রবল আকর্ষণে সেখানে টেঁকাও আমার পক্ষে দুষ্কর হয়ে দাঁড়াল।

দিন-দুয়েক কোনোরকমে কাটিয়ে আবার ফিরে এলুম।

একদিন দুপুরবেলা গোরিকে ইঙ্গিতে জানিয়ে দিলুম যে, আমি কিছু কিছু হাত দেখতে পারি। কথাটা শোনামাত্র সে তার কনকচম্পকবর্ণ দক্ষিণ-হস্তটি আমার সামনে প্রসারিত ক'রে বললে—এটা দেখো তো!

আমি দু'হাতে তার হাতখানা একরকম জড়িয়েই ধরলুম।

সেই স্পর্শের অনুভূতি বর্ণনা করা আজ আমার পক্ষে দুঃসাধ্য।

গোরির জীবন-বৃত্তান্ত প্রায় সমস্তই আমি দেওকীনন্দনের কাছে শুনেছিলুম। তারই এক-একটি টিপে টিপে ছাড়তে লাগলুম। আর সে-ও অবাক হবার ভান করতে লাগল।

কিন্তু এসব 'এহ বাহ্য' কথার পর আসল কথাটি ছাড়লুম সবার শেষে। বললুম—কোনো লোক তোমাকে ভালবাসে এবং সে তোমার জন্য প্রাণ পর্যন্ত দিতে পারে।

কথাটা শুনে সে মৃদুভাবে একবার হাতটা নিজের দিকে টেনেই আত্মসমর্পণ করলে। তারপরে তার বাঁ-হাতখানাও নিজের হাতে নিয়ে দেখতে লাগলুম এবং কে যে তাকে ভালবাসে—কিছুক্ষণ বাদেই তা প্রকাশ ক'রে ফেললুম।

গোরি মোটেই আশ্চর্য হল না, কারণ সে আমার হাল-চাল দেখে আগে থাকতেই সব অনুমান ক'রে নিয়েছিল। কিন্তু আশ্চর্য হলুম আমি যখন শুনলুম—সে-ও আমার প্রতি বিরূপ নয়। গোরি বলতে লাগল—আমি অতি হতভাগিনী, বিয়ের পরই বিধবা হয়েছি। বাপ-মা নিরন্তর মনে করতেন, বাড়িতে কালসাপ

পোষা হয়েছে। আজ তাঁরা চ'লে গিয়েছেন কিন্তু নতুন ক'রে আবার আজ তোমার দুঃখের কারণ হলুম।

আমি বললুম—দুঃখের কারণ কেন? তুমি আমার জীবনে অতি সুখের কারণ।

সে সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করল—কি ক'রে? আমাদের মিলন কি ক'রে সম্ভব হতে পারে?

আমি বললুম—তুমি আমার সঙ্গে কলকাতায় যাবে, সেখানে আমি তোমায় বিয়ে করব। তারপর আমাদের সংসার একরকম চলেই যাবে।

—আবার বিয়ে! ছিঃ! ছিঃ! ছিঃ!—এই ব'লে সে আমার কাছ থেকে এমনভাবে একটু দূরে সরে গেল যে, আমি একেবারে দমে গেলুম। তার দুই চোখ দু'ফলা ছুরির মতো ঝকঝকিয়ে উঠল।

কয়েকদিন গোরি আর আমার সামনে এলো না। খাবার-দাবার সে দিত বটে, কিন্তু মুখের দিকে চাইত না। আমি মনে-মনে তাতে শেলাঘাত অনুভব করলেও মুখে কিছু প্রকাশ করলুম না।

এদিকে দেওকীনন্দন আমার সঙ্গে যেন আরো হৃদ্য ব্যবহার করতে লাগল। আমার বিমর্ষ মুখ দেখে সে বার বার জিজ্ঞাসা করতে লাগল যে, এ-বাড়িতে আমার কোনো অসুবিধে হচ্ছে কিনা। তার সরল মনের আন্তরিকতা ও ব্যগ্রতা দেখে আমার মনে লজ্জা এলো— এ আমি করছি কি! যে বন্ধু তার পরিবারের মধ্যে অবাধে মেলামেশার সুযোগ দিলে, প্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করলে, আমি তার কি প্রতিদান দিতে উদ্যত হয়েছি! মনে করলুম—আর এখানে থাকা নয়।

পরদিন দেওকীনন্দনকে বললুম—এবার ভাবছি পুনায় যাব। সেখানেও কিছু অর্ডার হয়তো পেতে পারি। এখানে তো অনেকটা কাজই হল। কিন্তু আমাকে দশটা শহর ঘুরতে হবে তো?

দেওকীনন্দন জিজ্ঞাসা করলে যে, আমি আবার ফিরে আসছি কিনা। কিন্তু আমি বললুম—অনেকদিন দেশ-ছাড়া আছি, ইচ্ছে আছে একবার কলকাতা ঘুরে আসব।

দেওকীনন্দন আর কিছু বললে না। আমি জিনিসপত্তর গোছগাছ করছি, দেওকীনন্দন তার কাজে বেরিয়ে গেছে—এমন সময় ছায়ামূর্তির মতো ধীর পদ-সঞ্চারে গোরি আমার কাছে এসে দাঁড়াল। দেখলুম তার চোখ-দু'টি ছলছলে। ধীরে ধীরে সে বললে—আমায় নিয়ে যেতে চেয়েছিলে—নিয়ে যাবে?

আমার সামনে সারা দুনিয়া তার কথা শুনে চক্কর খেতে শুরু করলে। জীবনে যত সুন্দর মুখ স্মৃতিপটে আঁকা ছিল, সব যেন গোরির রূপ ধ'রে বলতে শুরু করলে—আমায় নিয়ে যাবে? আমায় নিয়ে যাবে?

আমার সারা অন্তরাত্মা চিৎকার ক'রে উঠল—না—না। মুখে কিছু বললুম না—মাথা নামিয়ে বিছানা বাঁধতে লাগলুম।

একটু পরে গোরি ঘর থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল।

তার সঙ্গে আর আমার দেখা হয়নি।

এর কিছুদিন পরের কথা।

বোধ হয় উনিশ-শ'-আট সাল কি ঐরকম কোনো একটা সময়। ক্ষুদিরামের ফাঁসির পর্ব শেষ হয়ে গেছে, বাংলার তখন তুঙ্গী অবস্থা। বাঙালীর ছেলে বাংলার বাইরে যেখানে যায় সেখানকার জনসাধারণ তাকে সম্ভ্রমের চোখে দেখে, খাতির করে। আর তেমনি অত্যাচার করে পুলিসের লোকে।

আমি তখন ঘুরতে ঘুরতে গিয়ে পড়েছি পুনা শহরে। মাথা গোঁজবার স্থান নেই; মুখে খাতির করলেও কেউ ভয়ে স্থান দেয় না। দিনকয়েক পুলিসের থানায় থানায় কাটিয়ে শেষকালে তাদের হাত থেকে ছাড়া পেলুম। পথে পথে ঘুরি। পেশা চশমা-ফিরি-করা। ঝাঁসী সফরের ফলে ট্যাঁকে যে অর্থ ছিল তা খরচ হয়ে গিয়েছে। ট্যাঁক-খালির সঙ্গে পেটও খালি যাচ্ছে।

পকেটে যখন কিছু পয়সা ছিল তখন এক পাঞ্জাবী দোকান থেকে চা খেতুম। তারাই এখনো দু'বেলা দু'কাপ চা দেয়; বলে—পয়সা হলে দাম দিয়ে দিও। মধ্যে মধ্যে যেদিন তারা লুকিয়ে মাংস রাঁধে সেদিন সন্ধ্যেবেলা আমার ভূরি-ভোজন হয়। একসঙ্গে তিন-চারদিনের খাদ্য পেটে পুরে দিই। এই অবস্থায় পরমানন্দে দিন কাটছিল।

এই সময়ে একদিন সেই পাঞ্জাবী ভদ্রলোক আমায় বললেন—এখানে একজন বাঙালী থাকেন। তাঁকে তুমি চেনো?

আমি বললুম—না। কোথায় থাকেন তিনি?

সে বললে—কোথায় থকেন তা তো জানি না, তবে পুনার সব লোকই তাঁকে চেনে। মস্ত যাদুকর তিনি। আচ্ছা, আমি তাঁর বাড়িটা খোঁজ ক'রে তোমায় দেখিয়ে দেব।

কয়েকদিন বাদে আমার সেই পাঞ্জাবী বন্ধু পরতাব বললে—চল, বাড়ির খোঁজ পেয়েছি।

খানিকটা দূরে একটা ছোট্ট-দরজাওয়ালা বাড়ি। বাড়ির একতলা ইটের তৈরি, দোতলায় খড়ের চাল। তার দরজা দেখিয়ে পরতাব বললে, এই বাড়ি।

তখন দরজায় তালা ঝুলছিল দেখে চ'লে গেলুম। তারপরে সারাদিন রাত্রি ন'টা অবধি খোঁজ করেছি কিন্তু তালা তখনও খোলেনি। পরের দিন বেলা এগারোটা নাগাদ সেই বাড়িতে গিয়ে দেখলুম দরজা খোলা—হাট-খোলা।

আমি কড়া নাড়তেই উপর থেকে জানলা দিয়ে একখানি হাসিভরা মুখ বাড়িয়ে একটি ভদ্রলোক হিন্দীতে বললে—এই দরজা দিয়ে উপরে চ'লে আসুন।

সামনেই সিঁড়ি। উঠেই ঢুকলুম একখানি ছোট ঘরে। ঘরটি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। আমি ভদ্রলোককে নমস্কার ক'রে বললুম—আমি শুনলুম আপনি বাঙালী, তাই দেখা করতে এসেছি।

ঘরের মেঝেতে একখানি চাটাই-এর উপরে একখানি ঘোড়ার-কম্বল পাতা। আমাকে তিনি হিন্দীতে বললেন—এইখানে বসুন।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম—আপনার বাড়ি কোথায়?

তিনি বললেন—আমার বাড়ি চিতোরগড়ে।

এতক্ষণে ভদ্রলোককে বেশ ভালো ক'রে দেখলুম। শ্যামবর্ণ, সুন্দর মুখশ্রী, চওড়া বুক, সরু কোমর; আর চোখ-দু'টি তাঁর অপূর্ব এক জ্যোতিতে যেন জ্বলজ্বল করছে। জিজ্ঞাসা করলুম—আপনার চিতোরগড়ে বাড়ি তো এখানকার লোকেরা আপনাকে বাঙালী বলে কেন?

ভদ্রলোক হাত জোড় ক'রে বললেন—না, না, আমি বাঙালী নই; আমি যা কিছু করি সবই যৌগিক ক্রিয়ায়। আমি বাংলাদেশে যাইনি পর্যন্ত।

এই কথা শুনে আমার মনে পড়ল যে, যাদুকরকে বাংলাদেশের বাইরে অনেকে বাঙালী ব'লে অভিহিত করে। হঠাৎ চোখে পড়ল, ঘরের একটা কোণে তিনটে ইঁটের উপরে একটা মাটির হাঁড়ি, নিচে কাঠের আগুন ধিকিধিকি ক'রে জ্বলছে। কম্বলের একদিকে একটা কেরোসিন-কাঠের বাক্স, তার উপরে খান-কয়েক কাগজ ও দোয়াত-কলম। ঘরের আলের দিকে দেয়ালের মধ্যে দু'টো-তিনটে তাকে কতকগুলো খবরের কাগজ ও আর কি কি সব রয়েছে।

ভদ্রলোক আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি কোথায় থাক?

আমি বললুম—থাকবার কোথাও জায়গা নেই। একটা দোকানে আমার একটা বাক্স, একটা শতরঞ্চ ও একটা বালিশ আছে।

তিনি বললেন—আমার এখানে যদি অসুবিধা না হয়, এসে থাকতে পার।

বললুম—তা হ'লে তো বেঁচে যাই।

তিনি বললেন—সেগুলো কতদূরে আছে?

পরতাবের দোকান কাছেই ছিল। বললুম—কাছেই আছে। নিয়ে আসব?

ভদ্রলোক বললেন—যাও, নিয়ে এস।

তখনই পরতাবের দোকানের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লুম।

জিনিসপত্র নিয়ে এসে দেখি, তিনি ভাতের ফ্যান গড়াচ্ছেন। আমায় জিজ্ঞাসা করলেন—তোমার নাম কি?

নামামৃত উচ্চারণ ক'রে আমি জিজ্ঞাসা করলুম—আপনার নাম কি?

তিনি বললেন—আমার নাম ব্রিজশরণ। সঙ্গে সঙ্গে বললেন—আমাকে ভাইয়া ব'লে ডেকো, আমিও তোমাকে ভাইয়া ব'লে ডাকব।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে, যাকে এর আগে কখনও দেখিনি, যার নাম কখনও শুনিনি—সে হয়ে গেল আমার ভাই। এইরকম পথে পথে আরো দু'-একটি ভাই পেয়ে হারিয়েছি। যাক সে-কথা।

তাক থেকে খানকয়েক কাগজ নামিয়ে নিয়ে এসে ব্রিজশরণ কম্বলের উপর পাতলে। তারপর হাঁড়ি উল্টে সেই কাগজের উপর সমস্ত ভাত ঢেলে ফেললে। পাশেই একটা ঠোঙায় চিনি ছিল, ভাতের উপর সেই চিনি সবটা ঢাললে। চিনিতে ভাতেতে বেশ ক'রে মাখা হয়ে যাবার পর আর-একটুকরো কাগজ নিয়ে আধাআধি ভাত তাতে রেখে আমায় বললে—খাও।

আমিও বিনা-বাক্যব্যয়ে খেতে আরম্ভ করলুম। সেও খেতে লাগল। খাওয়া হ'য়ে গেলে কাগজগুলো জানলা দিয়ে রাস্তায় ফেলে দেওয়া হল। তারপর দু'জনে নিচে গিয়ে কল খুলে, মুখ ধুয়ে, জল খেয়ে উপরে চ'লে এলুম।

সেদিন থেকে ব্রিজশরণের বাড়িতেই আশ্রয় নিলুম। সকালবেলা খাই। সন্ধ্যেবেলায় পরতাব যদি একবার চা দেয় তো কোনোদিন খাই, কোনোদিন তা-ও জোটে না। নিজের কাজকারবার একরকম বন্ধই রইল।

আমার এই নতুন আশ্রয়দাতাকে যতই দেখতে লাগলুম ততই অদ্ভুত ব'লে মনে হতে লাগল। উনুনে ফুঁ দিতে দিতে কখনও সে হাসতে-হাসতে গড়িয়ে পড়ে, কখনো-বা দাঁড়িয়ে উঠে চিৎকার ক'রে কাকে ধমক-ধামক দিতে থাকে।

মাঝে মাঝে মনে হতে লাগল—শেষকালে কি এক পাগলার পাল্লায় এসে পড়লুম !

একদিন জনকতক লোক এসে ব্রিজশরণকে সন্ধ্যেবেলা নেমন্তন্ন করলে। সেদিন সন্ধ্যেবেলা ব্রিজশরণ আমাকে বললে—চল ভেইয়া, নেমন্তন্ন খেয়ে আসি।

দ্বিতীয়বার আর বলতে হল না, আমি তার সঙ্গ নিলুম। সেখানে গিয়ে দেখি অনেক লোক জড়ো হয়েছে, তার মধ্যে নারীর সংখ্যাও কম নয়। ব্রিজশরণ এসে দাঁড়ানো মাত্র সকলে তাকে দড়াদ্দড় প্রণাম করতে লাগল। ব্রিজশরণ কিছুতেই পায়ে হাত দিতে দেবে না। অবশেষে উপায়ান্তর না দেখে সে পা-দু'টো পেছনে ক'রে ধরাসনে ব'সে পড়ল।

যা হোক, কিছুক্ষণ কথাবার্তা চালাবার পর একটি হাত-দেড়েক বেশ মোটা ইস্পাতের ডাণ্ডা কোথা থেকে বার ক'রে এনে তারা ব্রিজশরণের হাতে দিলে। সে ডাণ্ডাটা হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ এ-কথা সে-কথা ব'লে সেটার দিকে চেয়ে রইল। দর্শক-দর্শিকারা নীরবে অনিমেষ দৃষ্টিতে তার হাতের দিকে চেয়ে আছে। আমি তো ব্যাপার দেখে অবাক। নেমন্তন্ন খেতে এসে এ কী কাণ্ড! ব্রিজশরণের দৃষ্টি ক্রমেই সতেজ হয়ে উঠতে লাগল। প্রায় পনেরো-বিশ মিনিট সেই ডাণ্ডার দিকে সতেজে চেয়ে সে সেটাকে দুই হাতে ধ'রে তিন-চার-পাঁচটা পাক দিয়ে দিলে। অর্থাৎ দেড়-ইঞ্চি দু'-ইঞ্চি মোটা একটা ইস্পাতের লৌহদণ্ডকে প্রায় ইস্ক্রুপ বানিয়ে ছেড়ে দিলে।

এর পর খাওয়া-দাওয়ার পালা। কিন্তু মহারাষ্ট্রীয়দের আহার্যের তালিকা দেওয়া নিষ্প্রয়োজন।

আর-একদিনের কথা। ব্রিজশরণ প্রতিদিন একখানি ভজন গান গাইত। তারপরে পদ্মাসন হয়ে ব'সে আধঘণ্টা পৌনে-একঘণ্টা স্থির হয়ে থাকত। এই ভজনগানটি আমার বড় ভালো লাগত। সে-গানটির কথাও ছিল যেমন সুন্দর, সুরও ছিল তেমনি মধুর। ব্রিজশরণের ভাঙা গলাতেও মোটেই তা শ্রুতিকটু ব'লে মনে হ'ত না।

একদিন সন্ধ্যেবেলায় ভজনগান ও স্থির হয়ে বসার পরে আমি তাকে বললুম —ভাইয়া, গানটি আমায় লিখে দেবে ?

আমার কথা শুনে সে বললে—তাতে কি হয়েছে! আমি এক্ষুনি লিখে দিচ্ছি।

কথাটা ব'লেই সে তাকের কাছে উঠে গেল। তাকের দিকটা অন্ধকার। ব্রিজশরণ বললে—ভাইয়া, ডিবেটা নিয়ে এসো তো।

ডিবেটা পেড়ে তার হাতে দিলুম। সেটা হাতে নিয়ে সে একবার সেটার মধ্যে, তারপর তাকটার দিকে তাকিয়ে চেঁচাতে চেঁচাতে—এই দেখ, আমি এইখানে দোয়াত-কলম রেখেছিলুম—কে এইরকম ক'রে নিয়ে যায়? নিয়ে যায় তো ঠিকমত রেখে যায় না কেন?—ইত্যাদি ব'লে মহা তম্বি শুরু ক'রে দিল। আমি কেরোসিনের ডিবেটা যথাস্থানে রেখে এসে বসতে-না-বসতেই সে বললে—আচ্ছা, আর একবার নিয়ে এসো তো।

এইবার দেখা গেল তাকের ওপর দোয়াত-কলম ও কতকগুলো কাগজ রয়েছে। ব্রিজশরণ খান-দুই কাগজ ও দোয়াত-কলম নামিয়ে তাকের দিকে তাকিয়ে বললে—ঠিক সময়ে দিয়ে যেতে মনে থাকে না বুঝি!

তার ছাপার অক্ষরের মতো সুন্দর দেবনাগরী হরফে সেই প্রায় এক পাতা ধ'রে ভজনটা লিখেই আমাকে বললে—নাও।

কাগজখানা মুড়ে পকেটে রাখছি, সে বললে—চল, এইবার শুয়ে পড়া যাক।

আলোটা নিবিয়ে শুয়ে তো পড়লুম। কিন্তু ব্যাপারটা আমার মোটেই সুবিধের ব'লে মনে হল না। ভাবতে লাগলুম—এর চেয়েও যে বাবা রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলুম সেও ছিল ভালো।

এমন সময় বাইরের রাস্তায় একটি শব-বাহকের দল কি-সব কথা বলতে-বলতে চ'লে গেল। ব্রিজশরণ বললে—ভেইয়া, শহরে খুব পেলেগ লেগেছে, একটু সাবধানে থেকো।

ভাবতে লাগলুম—একে এই ভূতগত ব্যাপার, তার উপরে আবার পেলেগ!

আর-একদিন সন্ধ্যেবেলায় ভজন গেয়ে ব্রিজশরণ তার ধ্যানে বসেছে, আমি একটা দেয়ালে হেলান দিয়ে ব'সে আছি। অদূরে কেরোসিনের ট্যামটেমিটা টিমটিম করছে। হঠাৎ যেন আমার মনে হল—সমস্ত ঘরখানা একটা ক্ষীণ সবুজ আলোয় ভ'রে উঠেছে, যেন খুব কম-শক্তির নিওন-লাইটের আলো। তারপরে দেখলুম খুব অস্পষ্ট সবুজ আলোর শিখা ব্রিজশরণের মাথার কাছে দপদপ ক'রে কাঁপছে। আমি ভয় পেয়ে উঠে গিয়ে ব্রিজশরণকে ধাক্কা মেরে ডাকলুম—ভেইয়া, ভেইয়া—

ব্রিজশরণ কোনো কথা না ব'লে কম্বলের উপর ঢ'লে পড়ল এবং সেই মুহূর্তেই সেই ক্ষীণ আলো অন্তর্হিত হয়ে গেল। ব্রিজশরণ অনেকক্ষণ সেইরকম ভাবে

প'ড়ে থেকে একবার উঠে ব'সে আবার তখুনি শুয়ে আমায় বললে—শুয়ে পড়ো।

আমি বাতি নিবিয়ে শুয়ে পড়লুম।

* * *

পরদিন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে ব্রিজশরণ আমাকে বললে—ভেইয়া, আমি দিনকয়েকের জন্যে আমার একটু দরকারে বাইরে যাচ্ছি। চল—তোমার একটা ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি।

আমি বাক্স ইত্যাদি গুছিয়ে নিয়ে তার সঙ্গে চললুম। সে চ'লে যাবে শুনে মনের মধ্যে একটা ব্যথা অনুভব করছিলুম, কিন্তু উপায় কি?

প্রায় মাইল-খানেক পথ চ'লে আমরা একটা বাড়িতে এলুম। রাস্তা থেকে একেবারে সিঁড়ি উঠে গেছে দোতলা অবধি। উঠেই একটা বড় ঘর। আমি তার পিছু পিছু সেই ঘরে ঢুকে গেলুম। ঘরের একদিকে একটি বৃদ্ধ ভদ্রলোক ব'সে কি করছিলেন—ব্রিজশরণকে দেখে খুব খুশি হয়ে চিৎকার ক'রে তার সংবর্ধনা করতে লাগলেন। তারপর আমার দিকে চোখ পড়তেই তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—এ কে?

ব্রিজশরণ বললে—উনি একজন চশমার ট্র্যাভেলিং এজেন্ট। এ-দেশে এসে বিপদে প'ড়ে গেছেন। পয়সাকড়ি ফুরিয়ে গেছে, হেড-কোয়ার্টারে চিঠি লিখে-লিখে কোনো জবাব পাচ্ছেন না। আপনার এখানে একটু মাথা গোঁজবার স্থান ও আহারাদির ব্যবস্থা ক'রে দেন তো বেচারীর বড় উপকার হয়।

ভদ্রলোক ভাঙা-ভাঙা ইংরেজীতে আমাকে বললেন—তা আপনি এখানে থাকতে পারেন, যদ্দিন ইচ্ছা থাকতে পারেন। তবে ট্র্যাভেলিং এজেন্সিতে কিছু নেই। এ-দেশে চাকরি-বাকরি করুন, বিয়ে-থা ক'রে এ-দেশের লোক হয়ে যান।

ব্রিজশরণ লোকটির সঙ্গে আর কিছুক্ষণ কথাবার্তা ব'লে আমাকে রেখে চ'লে গেল। আমার বাক্স ও ব্যাগ ইত্যাদি রাখার জন্য একটা কোণ দেখিয়ে দিয়ে ভদ্রলোক বললেন—এখানে বোসো।

বাড়ির ভিতরের দিকে চেয়ে দেখলুম, অনেকগুলি মেয়ে সেখানে ঘোরাঘুরি করছে। আমার আশ্রয়দাতা তাদের মধ্যে একজনকে ডেকে মারাঠী ভাষায় কি-সব বুঝিয়ে দিলে। আমি ব'সে আছি, মাঝে মাঝে এক-আধটা কথা আমাদের মধ্যে হচ্ছে, এমন সময় সেই মেয়েটি এসে আমাকে মারাঠী ভাষায় কি-সব বললে,

তার একবর্ণও আমি বুঝতে পারলুম না। লোকটি তক্ষুনি আমাকে বললেন—তুমি যদি চান করতে চাও, এর সঙ্গে যাও।

কতদিন যে চান করিনি তার ঠিকানা নেই। তাড়াতাড়ি একটা গামছা ও ধুতি বার ক'রে মেয়েটির অনুগমন করলুম।

চান করবার পর খাওয়ার পালা। একপাল মেয়ে খাবার পরিবেশন ও খাওয়া পরিদর্শন করতে লাগল। বয়স তাদের পনেরো থেকে কুড়ির মধ্যে। অতগুলি স্বাস্থ্যবতী মেয়ে বাঙালীর ঘরে একসঙ্গে দেখা যায় না। আহার্য অতি মামুলী। হাতে-গড়া রুটি, তার সঙ্গে ঢ্যাঁড়স-ভাজা, তাও আবার বাদামের তেলে। তারপরেই একহাতা ভাত, একটুখানি ঘন ডাল, তারপরে এক চামচ জোলো দুধ। এর চেয়েও ব্রিজশরণের কাছে চিনি দিয়ে মাখা ভাত খেয়ে ঢের বেশী তৃপ্তি হ'ত।

এখানে থাকতে থাকতে জানতে পারলুম যে এটি একটি অনাথ-আশ্রম। একে মারাঠী খাদ্য, তায় অনাথ-আশ্রম। দু'বেলা এক খাবার কলের মতো খেয়ে যেতে লাগলুম। এইসব মেয়েরা সকলেই অনাথিনী, এদের সংগ্রহ করা হয়েছে প্লেগ-হাসপাতাল বা এমনি হাসপাতাল থেকে অথবা কেউ ব্যবস্থা ক'রে দিয়ে গিয়েছে। সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোক এই অনাথ-আশ্রম চালাবার জন্য সরকার থেকে টাকা পান। তা ছাড়া মিউনিসিপ্যালিটি ও অন্যান্য অনেক প্রতিষ্ঠান এদের সাহায্য ক'রে থাকে। বাড়িতে পুরুষমানুষ দেখতেই পেতুম না, কেবল আমার খাওয়ার সময় জনকয়েক লোক এসে আমারই সঙ্গে পিঁড়িতে ব'সে ওই খাদ্য খেত। বেশ গুণ্ডা চেহারা তাদের, মেয়েদেরও বেশ গোলগাল চেহারা। মনে হয়, ওই খাদ্য মুখরোচক না হলেও যে পুষ্টিকর সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই।

তেতলার ঘরখানা গোটা দোতলার উপরে। সেই ঘরে দিনের বেলা দলে দলে কম্পোজিটার এসে কি-সব কম্পোজ ক'রে আবার বিকেলবেলা চ'লে যায়। এই কম্পোজিটারদের দু'টো র‍্যাকের মাঝখানে একটুখানি জায়গায় আমার স্থান নির্দিষ্ট হয়েছিল। অন্ধকার রাত্রে দেশলাই জ্বালিয়ে সেইখানে আমার বিছানাটুকু ক'রে শুয়ে শুয়ে বিড়ি ফুঁকতাম। রাজ্যের চিন্তা এসে আমার মগজে ভিড় করতে থাকত। এইসব চিন্তাকে চমকে দিয়ে নিচে রাস্তায় শবযাত্রীর দল চিৎকার করতে করতে চ'লে যেত। রোজই শুনতুম, প্লেগ দিনে দিনে ছড়িয়ে পড়ছে। কখন কাকে চেপে ধরে, পালাবার পথ নেই। আমি উপায়বিহীন, নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকতুম।

একদিন আশ্রমের মালিক আমায় বললেন—তুমি নাকি পুলিসের গুপ্তচর?

আমি বললুম—পুলিস-কমিশনারের চাকরি পেলেও আমি করব না—গুপ্তচর-বৃত্তি তো দূরের কথা।

আশ্রমের কর্তা বললেন—গুপ্তচর হতে পার কিন্তু তাতে আমার কিছুই করতে পারবে না। আমিও পুলিসের লোক। তবে তুমি তো কাজকর্ম কিছুই কর না বাপু। তাই সন্দেহ হয়।

আমি চুপ ক'রে আছি দেখে তিনি বললেন—তুমি এখানে একটি চাকরি করো। বলো তো আমি চাকরি দেখে দিতে পারি। এইখানকার একটি মেয়ে, তা সে তোমার পছন্দমত যে-কোনো মেয়েই হোক, বিয়ে ক'রে এইখানেই ঘর-সংসার করো।

তাকে বললুম—আচ্ছা, ভেবে দেখব।

আশ্রমে একটি ভদ্রমহিলা সপ্তাহে দু'-তিনবার ক'রে আসতেন। তাঁর বয়স প্রায় পঞ্চাশ হবে। হাসি-হাসি মুখ, খুব কথা বলেন। আশ্রমবাসী সকলেই তাঁকে লছমীমায়ী না লছমীবাঈ কি বলত, আমি বুঝতে পারতুম না। তিনি মধ্যে মধ্যে মেয়েদের মিষ্টি খাওয়ার জন্যে পয়সা দিতেন। সকলকেই তিনি ভালবাসতেন; আর তারাও সকলে তাঁকে ভালবাসত। আমার খাবার সময়ে মাঝে মাঝে তিনি কাছে এসে বসতেন এবং এটা খাও, ওটা খাও ইত্যাদি ব'লে তদারক করতেন। ভদ্রমহিলা বেশ গড়গড় ক'রে হিন্দী বলতে পারতেন। আশ্রমের কর্তা যেদিন আমাকে চাকরি ও বিয়ের কথা বললেন তারই দিন-দুই পরে লছমীমায়ী এসেছিলেন। সেদিন বাড়ি যাবার সময় তিনি আমায় ইশারায় ডেকে রাস্তায় নামিয়ে নিয়ে এলেন।

নামিয়ে নিয়ে এসে বললেন—তোমাকে কিছুদিন থেকে এখানে দেখছি। তোমার বাড়ি কোথায়?

বললুম—আমার বাড়ি কলকাতায়। কার্যব্যপদেশে এখানে এসে বিপদে প'ড়ে গেছি।

তিনি বললেন—তুমি বিদেশী লোক। অল্প বয়স তোমার। এ-সময়ে এখানে থাকা তো ঠিক নয়। চারিদিকে প্লেগ হচ্ছে। কখন যে কাকে ধরে তার ঠিক নেই।

বললুম—কি করব! আমার হাত-পা বাঁধা। হয়তো এইখানেই মরতে হবে।

ভদ্রমহিলা বললেন—তুমি জান এই বাড়িতে প্রতিবছর একজন-না-একজন আক্রান্ত হয়। শুধু এ-বাড়িই কেন—কোন্ বাড়ি না? গেলবছর তোমারই মতন আমার একটি ছেলে ধড়ফড় ক'রে মারা গেল ওই রোগে।

কথাটা শুনে আমার বুকের ভিতর গুর্‌গুর্‌ ক'রে উঠল। ভদ্রমহিলা আমার মাথার চুলগুলোর মধ্যে আঙুল চালাতে চালাতে বললেন—তোমারই মতন তার চুল ছিল কোঁকড়া। তোমারই বয়সী হবে।

বলতে বলতে তাঁর চক্ষু সজল হয়ে উঠল। তাঁর সেই চোখ দেখে আমার মা'র অশ্রুসজল মুখখানির কথা মনে পড়ল। অমনি সঙ্গে সঙ্গে এ-কথাও মনে হল যে, দেশে-দেশান্তরে ছড়িয়ে আছে আমার মায়ের দল। ভরসায় বুক ভ'রে উঠল। বললুম—আমার কাছে একটি পয়সা নেই। এখান থেকে যে চ'লে যাব তারও কোনো উপায় নেই।

ভদ্রমহিলা একেবারে 'তুমি' ছেড়ে 'তুই' সম্বোধন করলেন। বললেন—আচ্ছা, আমি যদি তোকে ভাড়ার টাকা দিই তুই যাবি তো?

বললুম—নিশ্চয়ই।

ভদ্রমহিলা চলতে আরম্ভ করলেন। আমিও সঙ্গে সঙ্গে চললুম। তিনি বললেন—না, না, তোর হাতে আমি নগদ টাকা দেব না। তোর মুখ দেখে মনে হচ্ছে তুই বড় দুষ্টু ছেলে। তা কলকাতা যাবার ভাড়া কত? আমি তোকে টিকিট কিনে দেব।

আমি বললুম—আপাতত আমার আগ্রা যেতেই হবে। আপনি আমার আগ্রা পর্যন্ত টিকিট কেটে দিন, তা হ'লেই হবে।

কি ক'রে কোথা দিয়ে আগ্রা যেতে হবে, সেইসব কথা বলতে বলতে আমরা তাঁদের বাড়ির দরজার কাছে এসে পৌঁছলুম। পুরানো পাড়ায় বাড়ি হ'লেও বেশ বড় বাড়ি। একতলাটা পাথরের তৈরি। রাস্তা থেকে পাথরের সিঁড়ি বেয়ে আমরা বাড়ির মধ্যে ঢুকলুম। তারপরই আধা-অন্ধকার প্রকাণ্ড একটা ঘর, সেখানে মুখোমুখি দু'টো দোলনা দুলছে। তারই একটাতে আমাকে বসিয়ে তিনি নিজে সামনেরটায় বসলেন। আমি বললুম—কাল সকাল ন'টায় ট্রেন। সেটা গিয়ে পৌঁছবে বিকেলে কল্যাণে, সেখান থেকে ট্রেন ধ'রে আগ্রায় যাব।

—তা হ'লে বেলা আটটার মধ্যে আসবি।

বললুম—নিশ্চয়ই আসব।

ভদ্রমহিলা আমার গালে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। দেখলুম তাঁর চোখ আবার সজল হয়ে উঠেছে। বললুম—একটা কথা জিজ্ঞেস করতে বড় প্রলোভন হচ্ছে।

—কি বল্‌।

বললুম—আপনার নাম কি?

—লছমীবাঈ।

আমি বললুম—আমি আপনাকে লছমীমায়ী ব'লে মনে করব। আপনি লছমীমায়ী হয়ে আমার এই বুকে রইলেন চিরকালের জন্যে।

তিনি বললেন—তোর নাম কি?

আমি বললুম—আপনি আমায় দুষ্টু ছেলে ব'লেই মনে রাখবেন। আমি আপনার দুষ্টু ছেলে।

লছমীমায়ীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লুম। কিছুকাল ধ'রে যে অশান্তি, উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠায় দিন কাটাচ্ছিলুম তার কোনো বর্ণনা ভাষায় নেই। একেবারে অর্থহীন হয়ে পড়া আমার পক্ষে নতুন নয়। কিন্তু চারিদিক থেকে এই মৃত্যুর বিভীষিকা আমায় যেন ঘিরে ধরেছে। তখন আমার মাত্র আঠারো বছর বয়স।

আমার মনে হতে লাগল আমি যেন একটা অন্ধকার ঘরে বন্দী অবস্থায় কাটাচ্ছিলুম। ঘরের চালে ছোট্ট একটি ঘুলঘুলি, তারই ভিতর দিয়ে আলো-বাতাস প্রবেশ করা-মাত্র সেই ক্ষুদ্র রন্ধ্রপথেই আজ মুক্তির খোশখবর-ভরা একখানি খাম আমার হাতে এসে পৌঁছেছে।

ছুটলুম পরতাবের দোকানে। আমার মুখে সব কথা শুনে সে খুশি হয়ে এক কাপ চা খাওয়ালে। বললুম—ভাই, তুমি আমার দুর্দিনের বন্ধু। তোমাকে কখনও ভুলব না।

ব্রিজশরণের ওখানে গেলুম—দেখি, দরজায় তালা ঝুলছে। দিনকয়েক রোজই গেলুম। যাবার দিনেও ভোরে একবার গেলুম। সেদিনও দেখলুম, তালা ঝুলছে। তার সঙ্গে আর দেখা হল না।

সন্ধ্যেবেলায় অনাথ-আশ্রমে ফিরে এসে সকলকে জানালুম, কাল আমি চ'লে যাব। তারা খুশিও হল না, দুঃখিতও হল না, শুধুমাত্র চুপ ক'রে রইল।

পরদিন সকালে উঠে আমার জিনিসপত্র গুছিয়ে লছমীমায়ের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হলুম। তিনি তৈরিই ছিলেন। আমাকে কাঁসার কাপে চা দিলেন। চা খেয়ে টাঙ্গা ক'রে আমরা স্টেশনে গিয়ে হাজির হলুম। লছমীমায়ী নিজের হাতে টিকিট কেটে নিয়ে এলেন। স্টেশনে গাড়িখানা তৈরিই ছিল। আমি একটা খালি কামরায় উঠে জানলার ধারে বসলুম। তিনি প্ল্যাটফরমে দাঁড়িয়ে রইলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি টিকিটখানা আমার

হাতে দিয়ে বললেন—এবার মা'র কাছে চ'লে যা। আর এখানে-সেখানে ঘুরে বেড়াস্‌নে।

আমি বললুম—আর কয়েকটা মাস। তারপরেই ফিরে যাব।

ভাবছিলুম, টিকিট তো হল, কিন্তু পকেটে একটা পয়সা নেই। খাব কি? এদিকে সময় হয়ে আসছে। একটা ঘণ্টাও প'ড়ে গেল। শেষকালে মুখ ফুটে ব'লে ফেললুম—মায়ী, তোমার এই দুষ্টু ছেলে এ-দু'দিন খাবে কি? আমার কাছে একটি পয়সাও নেই।

—ও, ভুলে গিয়েছিলুম।—ব'লে তিনি আঁচল খুলে পাঁচটি টাকা আমার হাতে দিলেন। তারপর খানিকক্ষণ স্থিরভাবে আমার দিকে চেয়ে থেকে আমার গালে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। দেখতে দেখতে তাঁর চোখ-দু'টো অশ্রুতে ভ'রে উঠল।

আমার চোখও শুষ্ক ছিল না। ভোঁ দিয়ে ইঞ্জিন চলতে আরম্ভ করল।

বহুরূপিণী রমণীর বিচিত্র রূপ জীবনে আমি বার বার দেখেছি—কখনো প্রেমময়ী—কখনো ছলনাময়ী—কখনো মমতাময়ী। কখনো-বা অশ্রুময়ীর এমন রূপও দেখেছি যা জীবনে কোনোদিনই ভুলতে পারিনি, আমার মনের পটে আজও তা উজ্জ্বল হয়ে আঁকা আছে।

জীবনে দুঃখও পেয়েছি সুখও পেয়েছি। দারিদ্র্যের চাবুকে রক্তাক্ত হয়েছি, আবার প্রেমালিঙ্গনে রক্তিমও হয়েছি। কিন্তু জীবনের প্রথম প্রদোষলগ্নে মাতৃরূপা রমণীর দু'-একটি স্নেহস্মৃতি আজও আমার জীবনে পাথেয় হয়ে আছে। লছমীমায়ীর সেদিনের সেই অশ্রুসিক্ত চোখ-দু'টির কথা মনে পড়লে আমার আর-একজোড়া অশ্রুসজল চোখের কথা মনে প'ড়ে যায়। মনের আকাশে শ্রাবণের ছায়া নেমে আসে। জানিনা সেদিন কোনো অন্যায়ের প্রশ্রয় দিয়েছিলুম কিনা—বৃন্দাবন-পথযাত্রিণীকে পাগলা-গারদের লোহার রড-এর পিছনে ঢুকিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে কতটাই-বা সত্যকারের সহায়তার অপরাধ ছিল! কিন্তু আজ হলপ ক'রে বলতে পারি সেই অশ্রুময়ীর চোখ-দু'টোয় যে শ্রাবণ-ছায়া সেদিন নেমে এসেছিল, আমার জীবনের উজ্জ্বলতম রৌদ্রালোকিত দিনে আজও তা কখনো কখনো ঘনিয়ে ওঠে, রিমিঝিমি ধারায় মনে বেদনার সুর বেজে ওঠে—"আয়ি সাবন রে!"

এই লছমীমায়ীর মতো সেও ছিল আমার এক নতুন-মা।

তার কথাই এবার বলছি।

পাঞ্জাব থেকে তখন আমি ঘুরতে ঘুরতে রোহিলখণ্ডের এক শহরে এসে পড়েছিলুম। শহরটি বেশ বিস্তৃত—খোলামেলা। লোকজনের বসতি আছে অনেক—মনে হল আমার কাজের বেশ সুবিধে হবে এখানে। দেখলুম—সেখানে গম ও ডালের বড বড পাইকার দোকান ফেঁদে বসেছে। উঠলুম গিয়ে সরাইখানায়—সেই পুরোনো চালের সরাই—লম্বায় ও চওডায় প্রায় দু'শ' গজ জমি—উঁচু ইঁটের দেয়াল দিয়ে ঘেরা। দেয়ালের গায়ে পাশাপাশি অসংখ্য ঘর, তার একটি মাত্র দরজা; ঘরের ভাড়া লাগে না, একপয়সা খাটিয়ার ভাডা লাগে। রাত্রিবেলা এই খাটিয়া প্রাঙ্গণে টেনে নিয়ে এসে লোকে ঘুমোয়; শীতকালে বোধহয় ঘরের মধ্যেই শোয়।

রাতের এক অপূর্ব দৃশ্য—অসংখ্য লোক প্রাঙ্গণে খাটিয়ায় শুয়ে আছে, কেউ-বা ব'সে আছে। কেউই কারুকে চেনে না। কোনো কোনো পরিবার ওরই মধ্যে রান্নাবাডা করছে—চলেছে সংসার। আমার রান্নার হ্যাঙ্গামা নেই—চারখানা বড় কচুরি চারপয়সার ও আধপো রাবড়ি পাঁচপয়সার—দু'বেলা এই চলেছে।

যাঁরা উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল ঘুরেছেন তাঁরাই জানেন, সেখানে কিরকম বড বড আকাশচুম্বী বাত্তেল্লার প্রচলন আছে। এই রোহিলখণ্ডের রোহিলাদের সম্বন্ধেও নানান প্রবাদ শুনতে পাওয়া যেত। শুনেছিলুম, তারা খুব বীর আর তলোয়ার চালাতে খুবই মজবুত। নমুনাস্বরূপ একটি উদাহরণ দেবার প্রলোভন সামলাতে পারছি না।

এদের একজন সর্দার—বাহাদুর খাঁ তাঁর নাম ছিল। তিনি আকবর বাদশার সময় একটি অন্যতম রত্ন ছিলেন। বাহাদুর খাঁর সম্বন্ধে বীরত্বের নানা কথা প্রচলিত আছে; কিন্তু সে-সব ছেড়ে দিয়ে তাঁর সম্বন্ধে একটি প্রচলিত কাহিনী এইখানে বলি।

একবার আফগানিস্থানের সঙ্গে এক যুদ্ধে বাহাদুর খাঁ গিয়েছিলেন সেনানী-রূপে। কিছুদিন পরে তাঁর মা'র কাছে খবর পৌছলো যে, যুদ্ধে বাহাদুর খাঁর মৃত্যু হয়েছে। মা শোক করলেন না; বললেন, বীরপুত্রের তো এইরকম মৃত্যুই লোকে কামনা ক'রে থাকে। কিন্তু কিছুদিন বাদে খবর পাওয়া গেল, বাহাদুর খাঁ জীবিত আছেন এবং তাঁকে শুশ্রূষার উপর রাখা হয়েছে।

আরো খবর পাওয়া গেল, আহত সৈনিকদের ওপর দিয়ে যখন বিপক্ষ-পক্ষের লোকেরা তাদের কষ্ট লাঘবের জন্য হাতি চালাচ্ছিল—সেই সময় একটা হাতির পায়ের তলা থেকে একজন আহত ব্যক্তি হাত সরিয়ে নেওয়ায় দেখতে পাওয়া গেল যে, সে বাহাদুর খাঁ।

এই খবরটা যখন বাহাদুর খাঁর মা'র কাছে গিয়ে পৌঁছলো তখন তিনি ডুকরে কেঁদে উঠলেন। কি ব্যাপার!—আমার ছেলের এমন দুর্বলতা হল যে, হাতির পায়ের তলা থেকে হাত সরিয়ে নিলে! পঞ্চাশটা হাতি তার গায়ের ওপর দিয়ে গেলে সে গ্রাহ্য করে না—ইত্যাদি।

বাহাদুরের মায়ের মড়াকান্না শুনে পল্লীর অন্যান্য সর্দারদের বাড়ির মেয়েরা ছুটে এলো। তারা ব্যাপারটা শুনে আফসোস করতে লাগল—তাইতো বাহাদুরের মা, রোহিলার ছেলের এমন দুর্বলতা!

বাহাদুরের মা বললেন—আমি শুনে অবধি ভাবছি, কোথা থেকে কী কারণে তার এই দুর্বলতা এলো! ভাবতে ভাবতে মনে হল—ও, এবার কারণটা খুঁজে পেয়েছি।

অন্যান্য মহিলারা উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলেন—কি কারণ—কি কারণ?

বাহাদুরের মা বলতে লাগলেন—বাহাদুর যখন শিশু তখন একদিন বিকেল-বেলায় তাকে ঘুম পাড়িয়ে আমি নেমাজ প'ড়ছিলুম। কিছুক্ষণ বাদেই ছেলে কেঁদে উঠল, কিন্তু সেদিকে কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না ক'রে আমি নেমাজ প'ড়ে যেতে লাগলুম। কয়েক সেকেণ্ড পরেই ছেলের কান্না থেমে গেল। নেমাজ শেষ ক'রে আমি ফিরে দেখি—আমাদের ধোপানী এসেছে, তারই কোলে শুয়ে সে খেলা করছে। আমি ধোপানীকে জিজ্ঞাসা করলুম—ও কান্না থামাল কেন?

ধোপানী বললে—ওর মুখে দুধ দেওয়াতে একটুক্ষণ চুষেই থেমে গেল।

আমি তো শুনে আঁতকে উঠলুম। বললুম—কী সর্বনাশ! তুই ওকে দুধ দিতে গেলি কেন?

তারপর ছেলের পেটে মাথা দিয়ে তাকে খুব ঘুরোলুম—সে বমি করতে লাগল। বমি করতে করতে হাত-পা যখন প্রায় ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে তখন শুইয়ে দিলুম। সব দুধই উঠে গিয়েছিল—বোধহয় এক ফোঁটা পেটের কোথাও ছিল—তার ফলেই এই দুর্বলতা।

অন্যান্য সর্দারনীরা হাতির পায়ের তলা থেকে হাত সরিয়ে নেওয়ার একটা সদুত্তর পেয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে যে-যার বাড়ি ফিরে গেল।

বাহাদুর খাঁর বংশধরেরা বাহাদুরি দেখাতে দেখাতে আজ ধরাপৃষ্ঠ থেকে অবলুপ্ত। এখন সেখানে এসেছে যত ব্যবসাদার-আড়তদার, উকিল-মোক্তার-মুহুরীর দল। এদের মধ্যে কাজ ক'রে কোনোরকমে দৈনিক খরচটা আমার উঠে যাচ্ছিল ; কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি—কাজে আমার আর মন ছিল না। এই ভবঘুরের জীবন ইতি ক'রে দিয়ে আবার কলকাতায় ফেরবার জন্যে মন হু-হু করছিল—কিন্তু পাথেয়-অভাবে ফিরতে পারছিলুম না। এমন সময়ে এক অভাবিতভাবে সুযোগ এসে গেল।

সমস্ত দিন কাজ ক'রে বিকেল নাগাদ আমি স্টেশনে গিয়ে বসতুম। গাড়ি আসছে যাচ্ছে—কত লোক উঠছে নামছে—দেখতে বেশ ভালো লাগত। রোজ সেখানে যাওয়ার ফলে স্টেশনের কর্মচারীদের সঙ্গে আমার বেশ ভাব জ'মে উঠেছিল।

একদিন একটি লোক—একে এর আগেও স্টেশনে দেখেছি, তবে আলাপ-পরিচয় হয়নি—লোকটি একরকম গায়ে প'ড়েই আমার সঙ্গে আলাপ করলে। নাম বললে—দীপচাঁদ ভার্গব।

আরো বললে—সে স্টেশনেই কাজ করে।

দীপচাঁদ বললে—আমি তোমার বড় ভাই, আমাকে লাল্লা ব'লে ডাকবে।

দু'দিনেই দীপচাঁদের সঙ্গে বেশ আলাপ জ'মে উঠল।

একদিন সে আমাকে বললে—ভাইয়া, তোমার কাছে আট আনার পয়সা হবে ?

আমি তখুনি তাকে পকেট থেকে একটা আধুলি বার ক'রে দিলুম। সামনেই একটা রেউড়িওলা বসে ছিল—তাকে ডেকে সে আট আনার রেউড়ি কিনলে।

মনে করলুম—রেউড়ির কিছু অংশ আমি পাব। কিন্তু দেখলুম—ঠোঙাটি বেশ ক'রে মুড়ে-ঝুড়ে সে পকেটস্থ ক'রে বললে—পয়সাটা তোমায় কাল ফেরত দেব।

পরের দিন যথারীতি স্টেশনে দীপচাঁদের সঙ্গে দেখা হল। কিন্তু পয়সার কথাটা সে তুললেই না। আমিও চক্ষুলজ্জায় তার কাছ থেকে চাইতে পারলুম না।

দীপচাঁদ এ-কথা সে-কথার পর জিজ্ঞাসা করলে—ভাইয়া, তোমার খাওয়া-দাওয়া কোথায় হচ্ছে ?

দু'বেলা কচুরি আর রাবড়ি খাচ্ছি শুনে সে আঁতকে উঠে বললে—সব্বনাশ! ঐ খাবার আরো চালালে ব্যারামে প'ড়ে যাবে। সে-ব্যারাম সারানো মুশকিল হবে।

আমি ভয় পেয়ে জিজ্ঞাসা করলুম—ভালো খাবার কোথায় পাওয়া যাবে?

সে একটু ভেবে বললে—আচ্ছা, দাঁড়াও। আমিই ব্যবস্থা করছি।

সরাইখানায় বাস করছি শুনে সে এমন ভাব দেখালে যেন শ্মশানে বাস করাও তার চেয়ে নিরাপদ। তার কথা শুনে এমন ভয় পেয়ে গেলুম যে, আট-আনা ফিরে পাবার আশাও যে কোথায় উবে গেল তা বুঝতেই পারলুম না।

পরের দিন দেখা হতেই বললে—চলো ভাই, তোমার খাবার বন্দোবস্ত করেছি।

আমি বললুম—কোথায়?

সে জিজ্ঞাসা করলে—আমাদের বাড়িতে থাকতে, আমাদের খাবার খেতে তোমার তো কোনো আপত্তি হবে না?

বললুম—কিছুমাত্র না।

—তা হ'লে এখুনই চলো।

এই কথা ব'লে সে আমায় নিয়ে স্টেশন থেকে বেরিয়ে পড়ল।

পথে চলতে চলতে সে আমাকে বললে—আমাদের বাড়িতে থাকতে কিছু অসুবিধা আছে। আমাদের বাড়িরই আদ্ধেকটায় আমার মাউসী থাকেন, তাঁর ওখানে তোমার থাকবার সমস্ত ব্যবস্থা করেছি।

মাসীর বাড়ি গিয়ে পৌছলুম। তাঁকে নমস্কার করতেই তিনি বলতে লাগলেন—শুনেছি, শুনেছি—আমি সব শুনেছি। এই বয়সে বাপ-মা'কে কাঁদিয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়ানোর কী লাভ আছে?

আমি বললুম—মা'কে ছেড়ে না এলে কি মাসীকে পেতুম?

কথা শুনে মাসী খুবই খুশি। বললেন—বেটা, আমার দীপচাঁদও যেমন, তুমিও তেমন। যতদিন ইচ্ছা, এখানে থাকো।

এখানে মাসী সম্বন্ধে কিছু বলি। মাসীর দেহের রং অত্যুজ্জ্বল গৌর, দেহটি যেন 'অমিঞা ছানিয়া' তৈরি করা হয়েছে। বয়স পঁইত্রিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে। সামান্য স্থূলভাব—মুখখানি দেখলেই ভক্তি হয়। সমস্ত দিন তিনি পূজার্চনায় কাটান, সন্ধ্যেবেলা খাওয়া-দাওয়া সেরে ছাতে গিয়ে শুয়ে পড়েন। বহুদিন আগেই বিধবা হয়েছেন। ছেলেপুলে নেই, একলার সংসার।

মাসী আমাকে নিয়ে গিয়ে একটা ঘর দেখিয়ে দিয়ে বললেন—দিনের বেলা এইখানেই থাকবে, রাত্রিবেলা তো খাটিয়া ছাতে উঠছে।

একটা নেয়ারের খাট দেখিয়ে বললেন—তোমার বিছানা এইখানেই রাখো।

তারপর হাঁক দিলেন—পরমেশ্বর—এ পরমেশ্বর—

প্রথমটা বুঝতেই পারিনি, সমস্তদিন পূজার্চনা ক'রে এত চিৎকার ক'রে 'পরমেশ্বর' ব'লে ডাকবার প্রয়োজন কি!

খানিক বাদে পরমেশ্বর সশরীরে এসে উপস্থিত হল। কালো, বেঁটেসেঁটে গুলে-ভাঁটার মতন চেহারা। মনে হয় যেন কষ্টিপাথর কুঁদে তাকে তৈরি করা হয়েছে। তাকে মাউসী খাট আর বিছানা দেখিয়ে দিয়ে বললেন—এই বাবুজীর বিছানা আর খাট ছাতে নিয়ে যাও।

পরমেশ্বর বিজবিজ ক'রে কি বললে বুঝতে পারলুম না। কিন্তু মাউসী বললেন—মনে ক'রে নিয়ে যেও।

বাড়িতে এই একমাত্র চাকর পরমেশ্বর। সেই রাঁধে। বাড়ির অন্যান্য কাজ—সবই করে।

—একটু ঘুরে আসছি—ব'লে আমি তখনকার মতন বেরিয়ে পড়লুম। মাসী ব'লে দিলেন, সন্ধ্যার মধ্যেই ফিরবে। আমরা সন্ধ্যা লাগতেই খেয়ে-দেয়ে সংসারের কাজ মিটিয়ে ফেলি।

মাসীর গলাটি ছিল একেবারে খনখনে। বোধহয় সেইজন্যেই তিনি কথাবার্তা বলতেন অত্যন্ত কম আর আস্তে। তবে বিকেলবেলায় প্রতিদিন দেখতুম পরমেশ্বর ও তিনি এক এক তাল সিদ্ধির গোলা এক এক গেলাস ঘন দুধের সঙ্গে দু'জনেই সেবন করতেন। এর পরেই দেখতুম—মাসীর আওয়াজটা যেত একটু চ'ড়ে। এই সময় তিনি পরমেশ্বরের সঙ্গে সংসার সম্বন্ধে কোনো বিষয়ে আলোচনা করলে আড়াল থেকে মনে হ'ত তিনি বোধহয় আর্তনাদ করছেন।

পরমেশ্বরের চেহারাটি যাই হোক না কেন—সে রাঁধত অতি পরিপাটি, যদিও রান্না ছিল অতি সামান্য। মোটা হাতে-গড়া রুটি—মোটা হ'লেও অত্যন্ত নরম হ'ত সে-রুটি আর খেতে দস্তুরমত মিষ্টি লাগত। আমার মনে হ'ত বোধহয় সে গুড় মিশিয়ে দেয়। এই রুটির সঙ্গে থাকত একটি ডাল আর একটুখানি চাটনি। এই সামান্য খাবার আমার কাছে কচুরি-রাবড়ির চেয়েও ঢের ভালো লাগত।

পরমেশ্বর বিকেলবেলাই ছাতে খাটিয়া তুলে বিছানা পেতে রাখত। সন্ধ্যায় খাওয়া-দাওয়া সেরে ছাতে এসে বিছানায় শুয়ে পড়তুম।

পশ্চিমে এঁদের বাড়ি যাঁরা দেখেছেন তাঁরাই জানেন যে, এ-সব বাড়িতে ছাতের উপরে একটি ক'রে ছাতবিহীন ঘর থাকে। চারদিকে দেয়াল—দেয়ালে ঝরোখা, কুলুঙ্গি সবই আছে—খালি ঘরের ছাত নেই। এই ঘরে মেয়েরা শোয়। আমি ওপরে উঠবার কিছু পরই মাসী আসতেন। আমার সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প ক'রে প্রতিদিন নিয়মমত আশীর্বাদ ক'রে তিনি সেই ছাতবিহীন ঘরে ঢুকে পড়তেন। এর কিছু পরে পরমেশ্বর উঠত ছাতে—সে মাটিতেই নিজের বিছানা ক'রে সেই ছাতবিহীন ঘরেই থাকত। পশ্চিমে অনেক জায়গায় দেখেছি বাড়ির বয়স্থা মহিলারা পুরুষ-চাকরকে দিয়ে গা-হাত-পা টেপায়। পরমেশ্বর খানিকক্ষণ হাত-পা দাবিয়ে নিজের বিছানায় এসে শুয়ে পড়ত।

একদিন, সেদিন বোধহয় পূর্ণিমা, ধরণীতল জ্যোৎস্নায় প্লাবিত—বাতাস একটু জোরে বইছিল, ছোট ছোট সাদা মেঘ চাঁদের তলা দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল—এইসব দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম—হঠাৎ একটু ঠাণ্ডা বোধ হওয়ায় ঘুমটা ভেঙে গেল। পায়ের কাছ থেকে চাদরটা তুলে নিতে গিয়ে দেখি পরমেশ্বর তার বিছানায় নেই। কোথাও গিয়েছে মনে ক'রে ঘুমুতে চেষ্টা করতে লাগলুম কিন্তু ঘুম আসে না। বিছানা থেকে উঠে ছাতে পায়চারি করতে করতে একবার মাসীর ঘরে উঁকি দিয়ে দেখতে পেলুম—মাসীর সেই স্বল্প-পরিসর খাটখানিতে তাঁর অর্ধনগ্ন শুভ্র দেহলতাকে ময়াল-সাপের মতো পাকে পাকে জড়িয়ে নিয়ে পরমেশ্বর ঘুমুচ্ছে। দেবদুর্লভ সে দৃশ্য! সাদায়-কালোয়—আত্মায়-পরমাত্মায় এমন গ্রন্থনা ইতিপূর্বে আর চোখে পড়েনি। আমি তো দূরের কথা, মাথার ওপরে অতন্দ্র চাঁদা-ব্যাটাও বিস্ফারিত-লোচনে সে-দৃশ্য দেখছিল। দরজার কাছ থেকে সরে এসে বার বার উঁকি মেরে মেরে আমি সেই অপূর্ব ছবি দেখতে লাগলুম।

হঠাৎ একটুখানি কাশির আওয়াজে সম্বিৎ ফিরে পেয়ে ও-পাশের দোতলার ছাতের দিকে চেয়ে দেখলুম—দীপচাঁদ স'রে গেল।

পরের দিন সকালবেলা খেতে বসেছি, দীপচাঁদ এসে হাজির। দীপচাঁদকে দেখলেই আমার সেই আধুলির কথা মনে পড়ে এবং মনে হয় এইবার বুঝি সে সে ইটে ফেরত দেবে। সেদিন এ-কথা সে-কথার পর সে বললে—ভাইয়া, এখানে

দেখছি তোমার খাওয়া-দাওয়ার বড় অসুবিধে হচ্ছে। তোমাদের খাবারের মাছ-মাংস হবার উপায় নেই এখানে। যদিও আমিষ খেতে আমাদের কোনো বাধা নেই, তবুও আমার বাড়িতে ওসব ঢোকে না, কারণ আমার স্ত্রী ওসব খান না। আমার মেসোমশাই কাম্‌তাপ্রসাদ শ্রীবাস্তব এখানকার সবচেয়ে বড় উকিল। তাঁর বাড়িতে রোজ মাংস হয়। আমি সেইখানেই তোমার থাকবার ব্যবস্থা করছি। অবিশ্যি আমার ছোট-মাসী ওসব স্পর্শ করে না, তবে মেসোমশাইয়ের একবেলা মাংস না হ'লে চলে না; আর রবিবার দিন সকালবেলা মাছও হয়।

বুঝলুম দীপচাঁদ আমাকে এখান থেকে সরাতে চায়। যাই হোক, মেসোমশাই যখন বড়লোক—তাঁর কাছ থেকে কোনোক্রমে যদি কলকাতায় যাবার গাড়ি-ভাড়াটা যোগাড় করতে পারি, সেই মতলবে বললুম—আমার কোনো আপত্তি নেই, তুমি ব্যবস্থা করো।

দীপচাঁদ তার মাসীকেও জপালে। মাসী বললেন—বেশ তো, দিনকতক সেখানে থেকে আসুক না। সেও তো আর-এক মাসী বটেক।

পরের দিন সকালবেলা মোটঘাট নিয়ে দীপচাঁদের সঙ্গে কাম্‌তাপ্রসাদের বাড়িতে গিয়ে উঠলুম। তিনি তখন কাছারি বেরুবার জন্যে তৈরি হচ্ছিলেন। আমাকে দেখে ভারি খুশি হয়ে অভ্যর্থনা করলেন। বললেন—কলেজে আমাদের এক বাঙালী প্রফেসর ছিলেন।

আরো বললেন—তুমি যখন দীপচাঁদের বন্ধু, তখন তুমি আমার ছেলের মতো।

দীপচাঁদকে বললেন—এঁকে এঁর ঘরে নিয়ে যাও, সব ব্যবস্থা করো, কোনো-রকম তকলিফ যেন না হয়।

কথাবার্তায় মনে হল কাম্‌তাপ্রসাদ অতি সদাশয় ও অমায়িক ব্যক্তি। যেমন তাঁর দশাসই চেহারা—ব্যবহারটিও তেমনি উদার ও মিষ্টি।

তিনি বেরোবার মুখে দীপচাঁদকে আবার বললেন—ওকে ওর ঘরে নিয়ে যাও।

দীপচাঁদের সঙ্গে আমার জন্য নির্দিষ্ট ঘরে এলুম। দোতলায় বেশ খোলা-মেলা পরিষ্কার ঘরখানি। একদিকে ছোট্ট নেয়ারের খাট, ঘরের আর-একদিকে চেয়ার-টেবিল। সেখানে আমার ভাঙা প্যাঁটরা ও ছেঁড়া বিছানা নিতান্তই বেমানান হল। মনের মধ্যে চিন্তার চক্র ঘুরছিল। নিরামিষ থেকে মাংসের হাটে এলুম বটে, কিন্তু এরকম ক'রে আর কতদিন চলবে! দীপচাঁদকে বললুম—

আমাকে কলকাতায় ফিরে যাবার একটা ব্যবস্থা ক'রে দিতে পার? আমার কাছে কিন্তু পয়সাকড়ি কিছু নেই। আর এ-কাজেও আর পোষাচ্ছে না।

দীপচাঁদ মিনিটখানেক চুপ ক'রে থেকে বললে—দূর দূর—এ-কাজ কি ভদ্রলোক করে! তিরিশ টাকা মাইনে দেয়—তা থেকে ট্রেন-ভাড়া যায়। তবে আর থাকে কি! তার ওপর খাবার ঠিক নেই, থাকবার জায়গা নেই। তুমি এইখানেই থাকো। আমি জোর ক'রে বলছি মেসোমশাইকে ব'লে তোমার একটা চাকরি এইখানেই ঠিক ক'রে দেব। রেলে ও আদালতে প্রায়ই তো লোক নেয়। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো।

দীপচাঁদ একটা চাকরকে ডেকে বললে—তুমি বাবুজীর খিদমতে থাকবে। ইনি আমাদের মেহ্‌মান, দেখো যেন তাঁর কোনো অসুবিধা না হয়।

দীপচাঁদ তাকে আবার জিজ্ঞাসা করলে—বাবুজী কোথায়?

চাকরটা বললে—তিনি কাছারি চ'লে গেছেন।

দীপচাঁদ বললে—এবার ছোট-মাসীর সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দি'।

চললুম ছোট-মাসীর ঘরের উদ্দেশে। বাড়িখানি বেশ বড়। আমরা গোটাকয়েক উঁচু উঁচু ছাত ও ঘর পেরিয়ে ছোট-মাসীর ঘরের কাছাকাছি এসে পৌঁছলুম। দীপচাঁদ সেইখান থেকেই তাঁকে ডাকতে ডাকতে এগিয়ে চলল।

ঘরের দরজায় একটি মহিলা এসে দাঁড়ালেন। বয়স তাঁর খুব বেশি নয়—তেইশ-চব্বিশের বেশি হবে না। মাসীর বোন—দেখলেই বুঝতে পারা যায়। কিন্তু মুখখানা দেখলে মনে হয় বুঝি তাঁর ভয়ানক পেটকামড়ানি ধরেছে। আমাদের বললেন—এসো এসো।

বেশ বড় ঘর। তাকে হল্‌ঘরই বলা চলে। সাজানো-গুছানো, মনে হয় যেন স্টেজে এসে ঢুকলুম। মেঝেতে শতরঞ্জি পাতা। তিনি আমাদের বসতে ব'লে নিজে বসলেন। তারপরে দীপচাঁদের কাছ থেকে আমার কথা শুনতে লাগলেন। অবিশ্যি দীপচাঁদ আগেই তাঁকে আমার কথা ব'লে রেখেছিল। অনেকক্ষণ গল্প করার পর তিনি বললেন—এবার নাওয়া-খাওয়ার ব্যবস্থা করো।

ওঠবার সময় আমার দিকে ফিরে হঠাৎ বললেন—তুমি আমাকে মাসী ব'লো না। আমি তোমার মা।

আমি বললুম—আমার অনেকগুলি মা আছে, আপনাকে আমি নতুন-মা ব'লে ডাকব।

দেখলুম, নামকরণ শুনে তিনি প্রসন্নই হলেন। দীপচাঁদকে বললেন—একে চানের ঘরটরগুলো দেখিয়ে দাও। আমি এদিকে খাবার ব্যবস্থা করছি।

আমার ঘরেই খাবার এলো। খেয়েদেয়ে একটু শুয়েছি, চাকর এসে খবর দিলে—মায়িজী ডাকছেন।

মায়িজীর ঘরে গিয়ে দেখলুম, তাঁর খাওয়াদাওয়া হয়ে গেছে। নানারকম গল্প শুরু করেছেন। তাঁর হালচাল দেখে মনে হল মুখখানা অমন ক'রে থাকলেও তিনি একটি গল্পবাজ লোক। এ-কথা সে-কথার পর তিনি বললেন—দেখ্, এ-বাড়ির কোনো কথা তোর মাউসীকে বলবিনি।

গল্প করতে করতে বেলা প'ড়ে এলো। আমি বললুম—এবার আপনি একটু বিশ্রাম করুন, আমিও শুইগে।

ঘরে এসে ভাবতে লাগলুম—এখন কী করি! কী ক'রে কিছু অর্থের যোগাড় ক'রে কলকাতায় পালাই! সেবার পুনাতেও এইরকম বিপদে পড়েছিলুম, কিন্তু অভাবিতরূপে উদ্ধার পেয়ে গিয়েছিলুম। আমার সৃষ্টিকর্তা সারাজীবন ধ'রে আমাকে এইরকম অভাবিতভাবে উদ্ধার করতে করতে আর কিছু ক'রে উঠতে পারলেন না।

সমস্ত দিন বাড়ি নীরব নিস্তব্ধ ছিল। সন্ধ্যা নাগাদ কর্তা বাড়ি ফিরতেই দেখলুম চাকরবাকরেরা সব সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল—তারা ধোপদস্ত ধুতি আর তার ওপরে একটা ক'রে সাদা আচকান চড়িয়ে নিলে। তারপর সবাই মিলে নিচে কর্তার বৈঠকখানার দিকে চ'লে গেল।

একটু বাদেই বৈঠকখানায় অনেক লোকজনের আওয়াজ পাওয়া যেতে লাগল। তিনটে চাকর চারদিকে ছুটোছুটি ক'রে তাদের ফরমাশ খাটতে থাকল। আমি একবার বেরুবার অছিলা ক'রে বৈঠকখানার দরজার পাশ দিয়ে চ'লে গেলুম। দেখলুম গোটা-তিনেক লোক ব'সে খুব উচ্চৈঃস্বরে আলাপচারি করছে। তাদের সামনে একটা বোতল, আর হাতে একটা ক'রে গেলাস। কাম্‌তাপ্রসাদবাবু তাদের মধ্যে বসে আছেন—তাঁরও হাতে একটা গেলাস। ফিরে এসে আমি আমার ঘরে ব'সে রইলুম। হুল্লোড় ক্রমেই বাড়তে লাগল। তিনটে লোক মিলে দশজনের হল্লা করতে লাগল। চাকর তিনটের দম ফেলবার সময় নেই—তারা তাঁদের ফরমাশ খাটতে ইতস্তত ছুটোছুটি করছে।

সময় কাটতে লাগল। খানিকক্ষণ বাদে, যে-লোকটা রাঁধত সে আমার জন্যে খাবার নিয়ে এল—রুটি আর একটি বড় বাটির এক-বাটি মাংস। সকালবেলা

কিন্তু একজন চাকরই আমার খাবার এনেছিল। বুঝলুম এ-বেলা তার ফুরসত নেই। যে আমার খাবার এনেছিল তাকে জিজ্ঞাসা ক'রে জানলুম—নিচের বাবুরা সকলেই খেয়ে বাড়ি যাবে। তারা রোজ এখানে খায়।

গোলমাল উত্তরোত্তর বাড়তেই লাগল। রাত্রি দশটা নাগাদ খুব চেঁচামেচি হচ্ছে শুনে নিচে গিয়ে দেখলুম, বাবুদের খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেছে—এবার বাড়ি যাওয়ার পালা।

বাবুদের মধ্যে একটা রোগামতন লোক ছিল। দেখলুম সে কেবলই শুয়ে পড়ছে, আর একটা চাকর ক্রমাগত তাকে সিধে করবার চেষ্টা করছে। এমনি ক'রে কিছুক্ষণ কাটবার পর বাবুদের তিনজনকেই এক-একজন ক'রে চাকর বাড়ি পৌঁছে দিতে গেল। এটা তাদের নিত্যনৈমিত্তিক কাজ।

পরের দিন নতুন-মা আমাকে বললেন—আমাদের বাবুজী বেশ ভালো লোক। ঐ তিন ব্যাটাই অতি বদমাশ। এখানে এসে মদ খাবে, রুটি-মাংস খাবে আর বাবুজীকে চাকর-বাকরদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করবে।

আমি বললুম—ঐ রোগামতন লোকটা সব থেকে বেশি গোলমাল করছিল।

নতুন-মা বললেন—ঐ হচ্ছে রামলগন। ঐ ব্যাটাই শয়তানের ধাড়ি! ওর বুকে একটা ছ্যাঁদা আছে।

আমি বললুম—সেকি! কোথায়?

তিনি বললেন—শুনেছি ঐ যেখানে পাঁজর-দু'টো মিশেছে, সেইখানে ছ্যাঁদা আছে, ভেতরের সব দেখা যায়।

এরকম যে হতে পারে তা আমি আগে জানতুম না। নতুন-মা বললেন—হ্যাঁ। কিন্তু সমস্তক্ষণ ঐ জায়গাটা আঠা-দেওয়া ফিতে দিয়ে ঢেকে রাখে। তার ওপর কক্ষনো জামা খোলে না। আমার এসব মোটেই ভালো লাগে না।

যাই হোক, দিনকয়েক এইরকম কেটে গেল। গোলমাল রোজই হয়। একদিন এক রাত্রে খুব একটা গোলমাল শুনে ঘুম ভেঙে গেল। বাবুজীর গলা ও সেইসঙ্গে চাকরদের কান্না ও দৌড়ঝাঁপ শুনতে পেয়ে তাড়াতাড়ি নিচে নেমে এলুম। দেখি বাবুজী এক-একটা চাকরের পিছনে দৌড়চ্ছেন আর ধড়াধ্বড় লাঠি মারছেন। এইরকম একতলা থেকে দোতলায়, অন্দর থেকে বাইরে চলতে লাগল। আমি তে দেখে-শুনে অবাক!

এইরকম ছুটোছুটি করতে করতে হঠাৎ একবার বাবুজী উঠোনের নর্দমার কাছে পা পিছলে মুখ থুবড়ে পড়লেন, তারপরেই নড়নচড়ন বন্ধ। ওপর থেকে

নতুন-মা কাঁদতে কাঁদতে নিচে নেমে এলেন। বাবুজীর মুখে-চোখে জলের ছিটে দেওয়া হতে লাগল। এর পর, যে চাকরদের তিনি এতক্ষণ ধ'রে ঠেঙাচ্ছিলেন, তারাই এসে সেই বিরাট দেহ চ্যাংদোলা ক'রে তুলে নিল। আমি, নতুন-মা আর ওরা, আমরা সবাই মিলে তাঁকে ঘরে নিয়ে এসে শুইয়ে দিলুম। তখনও তাঁর জ্ঞান হয়নি; আমরা তার মুখে-চোখে জলের ঝাপটা দিতে লাগলুম। নতুন-মা মাথার কাছে ব'সে পাখা করতে লাগলেন। সময় বুঝে আমি সেখান থেকে স'রে এসে নিজের ঘরে ঢুকলুম।

এর পর থেকে নিত্যই এই হাঙ্গামা চলতে লাগল। একদিন, বেলা প্রায় দশটা, এমন সময় নতুন-মা আমাকে ডেকে বললেন—আমাকে তীর্থে নিয়ে যেতে পারবি?

বললুম—হ্যাঁ, পারব। কোন্ তীর্থে যাবেন?

তিনি বললেন—মথুরা-বৃন্দাবন। আগ্রা-দিল্লীও দেখব। তারপর কাশী-গয়া। সেখান থেকে দ্বারকা। প্রথমবারে এই ক'টা ঘুরে আসব।

আমি বললুম—তা বেশ, কিন্তু অনেক টাকা লেগে যাবে।

তিনি বললেন—ওঃ, টাকা আমার ঢের আছে। তুই কি আমায় গরীব লোক ব'লে মনে করিস?

এই ব'লে উঠে গিয়ে আলমারির ভেতর থেকে একটা আধ-হাত-টাক লম্বা চাবি বার ক'রে সিন্দুকটা খুলে ফেলে আমাকে বললেন—এই ডালাটা তোল্। দিশী ছোট সিন্দুক হ'লে হবে কি—জিনিসটা খুবই ভারী।

ডালাটা তুলতেই আমার চোখের সামনে রূপের ফোয়ারা খুলে গেল। দেখি, সিন্দুকের কানায় কানায় ভর্তি টাকা আর মোহরে জড়াজড়ি ক'রে রয়েছে। এমন রূপ এর আগে কখনো দেখিনি।

মাসীর ওখানে সাদায় কালোয় জড়াজড়ি রূপ দেখেছিলুম—এখানে রূপো আর সোনায় জড়াজড়ি দেখলুম।

আমি অবাক হয়ে দেখছি দেখে নতুন-মা বললেন—কি রে, নিবি? তোর যা দরকার তুলে নে।

আমি বললুম—না, আপনি আমায় পঁচিশটে টাকা তুলে দিন।

এই ব'লে আমি দুই হাত অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ালুম। নতুন-মা গুনে গুনে পঁচিশটি টাকায় আমার অঞ্জলি পূরণ ক'রে দিলেন। তারপর একখানি মোহর তুলে নিয়ে বললেন—এটাকেও রাখ্।

আমি বললুম—না, না—এখন ওটা ওখানেই থাক্। দরকার হ'লে আমি চেয়ে নেব। তিনি অবহেলা-ভরে মোহরখানা সিন্দুকে ফেলে দিলেন। আমি কোঁচার খুঁটে টাকাগুলো বেঁধে সিন্দুকের ডালাটা বন্ধ ক'রে দিলুম। তারপর নিজের ঘরে এসে ভাঙা প্যাঁটরায় একখানা ধোপদস্ত ধুতির খুঁটে টাকাগুলো বেঁধে রাখলুম।

টাকাটা পাবার পর আর আমার মন সেখানে টেঁকছিল না। কিন্তু ওদিকে নতুন-মা আবার তীর্থে যাবার ঢেউ তুলেছেন, এদিকে আমার মহাতীর্থ কলকাতা আমাকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করতে আরম্ভ করেছে। সেই কবে কৈশোরের প্রান্তে এসে ঘর ছেড়ে বেরিয়েছিলুম, এখন আমার বয়স উনিশ-বছর। এই দীর্ঘদিনের অনিয়ম, অনাহার, অনিদ্রা, অনিশ্চয়তা ও উদ্বেগে আমার দিন কেটেছে। এর থেকে মুক্তি পাবার জন্যে মনের মধ্যে হাহাকার উঠেছিল। কবির ভাষায় বলতে গেলে "চিরদিন আমি পথের নেশায় পাথেয় করেছি হেলা"। এবার কিছু পাথেয় সংগ্রহ করতে হবে। দেহমন আমার ক্লান্ত ও বিধ্বস্ত হয়ে গেছে, কিছু বিশ্রাম চাই। কিন্তু পথের নেশা আমার কাটেনি, তাই সারাজীবন কখনো পথ কখনো পাথেয়—এরই সাধনা করেছি। পথের নেশা আজও কাটল না, ওদিকে পাথেয়ও কিছু সংগ্রহ হল না।

যাই হোক, ঘরে ব'সে ব'সে ভাবতে লাগলুম—এখন এখান থেকে মুক্তি পাই কি ক'রে? নতুন-মায়ের সঙ্গে যদি তীর্থ-দর্শনে বেরুতে হয়, তাহ'লে ফিরতে সে তো ছ'মাসের ধাক্কা! কিন্তু যিনি অযাচিতভাবে আমার পাথেয় জুটিয়ে দিয়েছেন, তিনিই অভাবিতরূপে অচিরে আমাকে মুক্তি দিলেন।

আগেই বলেছি, বাক্সের মধ্যে টাকা রেখে আমি শান্তি পাচ্ছিলুম না—যখের মতো দিনরাত ঘরেই থাকবার ইচ্ছে করছিল। কিন্তু থেকে থেকে নতুন-মা ডেকে পাঠান আর তীর্থযাত্রা সম্বন্ধে আমি কি করছি, তার খোঁজখবর নিতেন। কিন্তু আমার কী-ই বা করবার ছিল? আমি একদিন বললুম—খরচের টাকার ব্যবস্থা করেছেন?

নতুন-মা জিজ্ঞাসা করলেন—কত টাকা লাগবে?

বললুম—তা হাজার-দুয়েক টাকা লাগতে পারে। পুরো না লাগলেও, কিছু টাকা কাছে থাকা দরকার।

—তা হ'লে সিন্দুক থেকে দু'জনে গুনে হাজার-দুয়েক টাকা বাইরে বার করতে হয়।

তাঁকে এ-কথাও জানালুম, নগদ হ'লে চলবে না। নোট নিতে হবে।

নতুন-মা বললেন—বেশ, নোট-ও আছে আমার কাছে। বাবুজীর সমস্ত টাকা আমার কাছে থাকে।

বললুম—তবে আর কি! দশটাকার নোটে দু'হাজার টাকা গুনে আলাদা ক'রে রেখে দেবেন।

নতুন-মা বললেন—আচ্ছা দেখ্, দীপচাঁদ আমার সঙ্গে যেতে চাইছে।

বললুম—বেশ তো, ভালোই হয় তাহ'লে।

—আর পার্বতীয়ার ইচ্ছা সেও আমাদের সঙ্গে যায়। ওকে আমি নেব না—ভারি বজ্জাত মাগী।

বললুম—আপনাকে কিছু বলেছিল নাকি?

—না, বলেনি। তবে আমি লোকের মনের কথা টের পাই কিনা! আর বাবুজীকেও এখনো বলা হয়নি।

নতুন-মা'র কথাগুলো কিরকম অসংলগ্ন মনে হতে লাগল। তবুও তাঁকে বললুম—বাবুজীকে ব'লে তাঁর অনুমতিটা নিয়ে রাখবেন। আমাদের তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়তে হবে।

পরদিন নতুন-মা'কে জিজ্ঞাসা করলুম—বাবুজীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন?

তিনি কোনো জবাব দিলেন না। দেখলুম তাঁর মাথার চুলগুলি রুক্ষ, বোধ হয় তিন-চারদিন স্নান করেননি। আর কথা না বাড়িয়ে নিজের ঘরে চ'লে এলুম।

ঠিক তার পরের দিনই দুপুরবেলা নতুন-মা'র ঘরের দিকে খুব একটা গোলমাল শুনে চমকে উঠলুম। শুনলুম পার্বতীয়া চিৎকার ক'রে কাঁদছে, সেইসঙ্গে নতুন-মা'র চিৎকারও শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। চাকরবাকর ছুটোছুটি করছে। আমি একরকম দৌড়তে-দৌড়তে নতুন-মা'র ঘরে গিয়ে দেখি, সে এক বীভৎস কাণ্ড। ঘরময় রুটি, তরকারি, থালা ছড়ানো। পার্বতীয়ার কপাল কেটে দরদর ক'রে রক্ত পড়ছে। নতুন-মা'র দুই চোখ দিয়ে আগুন ঠিকরে বেরুচ্ছে, আর তিনি চিৎকার করছেন—হারামজাদী আমাকে বিষ দিয়েছিস!

পার্বতীয়া প্রাণপণে প্রতিবাদ জানাচ্ছে আর কাঁদছে। চাকরেরা তাকে ধ'রে নিয়ে গেল। নতুন-মা আমাকে বলতে লাগলেন—ওকে তীর্থে নিয়ে যাব না জেনে কতদিন থেকে আমাকে বিষ খাওয়াবার চেষ্টা করছে—

আমি দেখলুম, দস্তুরমত ক্ষিপ্তাবস্থা। তখুনি মাসীকে খবর দেবার জন্যে একটি চাকর পাঠালুম।

কিছুক্ষণের মধ্যেই দীপচাঁদের মাসী এসে হাজির। নতুন-মা এতক্ষণ নিরবচ্ছিন্ন চিৎকার করছিলেন, মাসীকে দেখেই একেবারে শান্ত হয়ে গেলেন।

মাসী ঘরে ঢুকেই বোনকে জড়িয়ে ধরলেন। নতুন-মাও দিদিকে জড়িয়ে নীরবে কাঁদতে আরম্ভ করলেন। প্রথমে নিঃশব্দ কান্না—তারপর একটু একটু ক'রে কণ্ঠস্বর বাড়তে লাগল, শেষে চিৎকার ক'রে মড়াকান্না জুড়ে দিলেন।

ইতিমধ্যে দীপচাঁদ ছুটেছিল আদালতে। কিছুক্ষণের মধ্যেই বাবুজী এসে হাজির। বাবুজী এসেই ডাক্তারের কাছে লোক পাঠালেন। ডাক্তার এসে রুগী দেখেই বললেন—এঁকে পাগলা-গারদে পাঠাতে হবে। চার-পাঁচ মাসের মধ্যেই ভালো হয়ে যাবে।

বাবুজী তখুনি আগ্রায় গারদের কর্তৃপক্ষকে চিঠি দিলেন।

মাসী নতুন-মা'কে চান করিয়ে, খাইয়ে সন্ধ্যেবেলায় চ'লে গেলেন। সেই-দিনই কামতাপ্রসাদবাবুকে বললুম—এবার আমাকে বিদায় দিন।

তিনি বললেন—না, না—তুমি যেও না। তোমাকে বিশেষ দরকার। তুমি আর দীপচাঁদ ওঁকে গারদে দিয়ে আসবে। তীর্থে যাবার নাম ক'রে ওঁকে গাড়ি চড়াতে হবে। তুমি না থাকলে চলবে না।

এই কার্যটি আমি এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করছিলুম, কিন্তু ঘুরে-ফিরে ঠিক আমার ঘাড়েই এসে পড়ল।

ক্রমে তীর্থযাত্রার দিন এগিয়ে এল।

নতুন-মা'কে বললুম—আজ সন্ধ্যের গাড়িতে আমরা বেরুব তীর্থযাত্রায়।

শুনে তিনি মহা উৎসাহিত হয়ে গান শুরু করলেন—"আয়ি বদরিয়া সাবন কি—সাবন কি মনভাবন কি—"

যাই হোক, সন্ধ্যেবেলায় নতুন-মা'কে নিয়ে ট্রেনে চড়লুম। কোনো গোলমাল না ক'রে তিনিও আমাদের সঙ্গে ট্রেনে উঠলেন। সকাল প্রায় সাতটার সময় আমরা আগ্রা সিটি স্টেশনে নেমে একটা গাড়ি ভাড়া করলুম। নতুন-মা অদ্ভুত শান্তভাবে আমাদের সঙ্গে গাড়িতে উঠলেন আর বৃন্দাবনের কথা বলতে লাগলেন।

গাড়ি গারদে এসে পৌঁছল। গাড়ি থেকে নেমে দীপচাঁদ গারদের

লৌহকপাটের কাছে গিয়ে খবর দিতেই একজন নারী-শান্ত্রী বেরিয়ে এসে নতুন-মা'র হাত ধ'রে গাড়ি থেকে নামালে। আমিও নেমে পড়লুম।

নতুন-মা কোনো গোলমাল না ক'রে সেই শান্ত্রীর সঙ্গে ভেতরে চ'লে গেলেন। মোটা-মোটা লোহার-রড-দেওয়া লোহার কপাট, তার মধ্যে ছোট্ট আর-একটি সেইরকমই কপাট—তার ভিতর দিয়ে শান্ত্রী নতুন-মা'কে ভেতরে নিয়ে গেল।

হঠাৎ কি মনে ক'রে চারদিকে চেয়ে পোঁ ক'রে তিনি সামনের দিকে ফিরে দু'হাতে দু'টো লোহার রড ধ'রে তার ফাঁকে মুখ দিয়ে দাঁড়ালেন। দেখলুম তাঁর দুই চোখ জলে ভ'রে উঠেছে। ভেতর থেকে শান্ত্রী এসে আকর্ষণ করতেই তিনি ফিরে গুটগুট ক'রে ভেতরের দিকে চ'লে গেলেন।

আজও কখনো কখনো কোনো শ্রাবণ-দিনের আকাশে পুঞ্জীভূত মেঘের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে অকস্মাৎ আমার অজ্ঞাত মানসলোক থেকে দু'টি সজল চক্ষু চেতনালোকে ভেসে ওঠে। সে-দু'টি চোখের দিকে চেয়ে দেখতে দেখতে আমার চক্ষুও অশ্রু-ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে।

এই অশ্রুতেই তো জীবনের শেষপাতার কালির আখর ধুয়ে দিয়ে রহস্যময় মৃত্যুর দেশে গিয়ে উপস্থিত হবার জন্য প্রস্তুত হই। আজ জীবনের শেষপ্রান্তে পৌঁছেও ও-পারের রহস্যের যবনিকা উত্তোলিত হল না—ও-পারের ডাকের চিঠি এসে পৌঁছল কিন্তু চিঠির হরফ অজ্ঞাত র'য়ে গেল। মানুষের অহমিকা তার কল্পনার আলোকপাতে সে-রহস্য ভেদ করবার চেষ্টা করে—ফলে মণিরত্নের বদলে পায় ভাঙা শুক্তি-শামুক—পঞ্চভূতগত বা ভূতগত।

সকলের জীবনেই অবশ্য এমন কিছু কিছু ব্যাপার ঘটে, যা জীবনের অনুরূপ অথচ ঠিক এই জীবনের মানে দিয়ে তাকে বোঝা যায় না। তাতে মন ভরে না বটে, কিন্তু অবিশ্বাসের কালিমা কিছু ফিকে হয়ে আসে। আমার জীবনেও এমন দু'-একটি ঘটনা ঘটেছে।

একটি অভিজ্ঞতার কথা বলি।

আমাকে তখন দক্ষিণ ভারতবর্ষের এক দেশীয় রাজ্যে দিনকয়েক বাস করতে হয়েছিল। কারণ কর্মফল। আষাঢ়-শ্রাবণ মাস নাগাদ গিয়ে কাজে যোগ দিলুম। স্টেশনে নামতেই রঙচঙে পোশাক ও বিরাট পাগড়িধারী একদল লোক

আমাকে অভ্যর্থনা করলে। দেশীয় রাজ্য ঘুরে ঘুরে আমি ঝুনো হয়ে গিয়েছিলুম। এইরকম লাল-নীল আচকান ও পাগড়ি দেখা আমার অভ্যেস ছিল। কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে জিজ্ঞাসা করলুম—আমার বাসস্থান কতদূর ?

তারা বললে—কাছেই। আপাতত একটা স্টেট-গেস্ট-হাউসে আপনার থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে।

আমার সঙ্গে উড়িষ্যাবাসী পরিচালক শ্রীমান্ গোবিন্দ ছাড়া আর কেউ নেই। শ্রীমান্ গোবিন্দ তদারক ক'রে জিনিসপত্র তুলে নিয়ে তাদের জিম্মেয় দিয়ে আমার পেছু পেছু স্টেশন থেকে বেরুলো। স্টেশনের কাছেই বাসস্থান ঠিক হয়েছিল—হেঁটেই সেইটুকু রাস্তা পার হয়ে এলুম।

একটা বড় মাঠের চারদিকে তার দিয়ে ঘেরা। ওরই মধ্যে কাঠের দু'টো গেট, তাও ঝুলে পড়েছে। মাঠের মাঝখানটা বেশ উঁচু। এই উঁচু জায়গায় মানুষভর উঁচু পাথরের চাতালের ওপর পাথরের একতলা বাড়ি। পাঁচ-ছ'টা সিঁড়ি অতিক্রম ক'রে ওপরে উঠে একটা চওড়া বারান্দা—তার তিন দিক ঢাকা, সামনের দিকটা খোলা। বারান্দার গায়েই দু'টো বড় বড় ঘর—তার সঙ্গে এ-কোণে ও-কোণে চারদিকে আটটা-দশটা ঘর—পাথরের উঁচু দেয়াল, চাল খোলার। আমার সঙ্গে যেসব রাজকর্মচারী এসেছিল তারা বললে—ঘরগুলোয় সিলিং লাগানো নেই বটে, তবে সিলিং-এর অর্ডার হয়ে গিয়েছে। এখন দোকানদার কাপড় দিতে পারছে না, কাপড় পেলেই সিলিং হয়ে যাবে।

দু'টো বড় ঘরের পাথরের মেঝেতে মোটা শতরঞ্জি পাতা; খাট, মশারি, ইজি-চেয়ার, টেবিল, চেয়ার—কোনো জিনিসেরই কমতি নেই।

কিছুক্ষণ বাদে রাজকর্মচারীরা চ'লে গেল। আমার গোবিন্দ জিনিসপত্র সব তুলে এ-ঘরে ও-ঘরে জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখতে লাগল। রান্নাঘরে আমাদের জন্যে কিছু কাঠকয়লা রাখা হয়েছিল, আসবার সময় চাল ডাল আলু পেঁয়াজ ইত্যাদি সব নিয়ে এসেছিলুম—গোবিন্দ মহা আনন্দে উনুন ধরিয়ে খিচুড়ি চাপিয়ে দিলে।

আপিসে যাতায়াত আরম্ভ করলুম। আপিস থেকেই গাড়ি আসত, বাড়ি পৌঁছে দিত। দিনের মধ্যে পাঁচ-সাতবার বৃষ্টি হয়। জায়গাটা পাহাড়ে—এমনিতেই ঠাণ্ডা, বর্ষার সময় বেশ ঠাণ্ডা পড়ে। সবাই বলতে লাগল—এর চেয়েও ঢের বেশী ঠাণ্ডা পড়বে। আসলে এইটেই শীতকাল।

আমি গরম কাপড়-চোপড় সবই বোম্বাইয়ে রেখে এসেছি, আর বেশী ঠাণ্ডা

পড়লে কী যে করব বুঝতে পারছি না। এদিকে বৃষ্টি বেড়েই চলেছে। এর মধ্যে একদিন গোবিন্দ বললে—মাংসের দোকান খুঁজে পেয়েছি আজ্ঞে।

গোবিন্দ সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। কলকাতা ছেড়ে যখন বোম্বাই আসি তখন গোবিন্দ আমার কাছে এসে জোটে। জাতিতে করণ, মাতৃভাষা ওড়িয়া ছাড়া আর কিছুই জানে না। রোগা একহারা চেহারা, রং মোটামুটি কালো —বয়স পনেরো-ষোলো। একেবারে নিরামিষাশী। বোম্বাইয়ে আসবার সময় ট্রেনে তার জন্য রাইস-কারি আনিয়েছিলুম। সে উৎসাহ ক'রে খেলে বটে, কিন্তু ঘণ্টাখানেকের মধ্যে শুরু করলে বমি। বোম্বাইয়ে আমি অন্তত একবেলা মাংস খেতুম, নিজেই রাঁধতুম, কিন্তু গোবিন্দ উৎসাহ ক'রে আমার হাত থেকে রাঁধবার ভার কেড়ে নিলে।

আমাদের ফ্ল্যাটের পাশেই দু'টি মুসলমান পরিবার থাকতেন—গোবিন্দ কি ক'রে সে-বাড়ির বাবুর্চীর সঙ্গে ভাব ক'রে ফেললে। বাবুর্চীকে সে চাচা ব'লে ডাকত এবং তারই কাছ থেকে নানারকমের মাংস রান্না শিখত আর বাড়িতে এসে তারই মহড়া দিত। গোবিন্দ বলত—তার চাচা কলকাতার কোনো-এক শৌখিন মহারাজের বাড়িতে বাবুর্চী ছিল। সেখানে প্রায়ই লাটসাহেব আসত খানা খেতে। সেই বাবুর্চীর কাছ থেকে গোবিন্দ চপ-কাটলেট-বিরিয়ানি এবং আরো কয়েকরকম রান্না শিখে ফেললে। তরকারি তার মুখে আর রোচে না।

দু'টি বেলা মাংস সেবন ক'রে দেহটি তার বেশ পুষ্ট হতে লাগল। অবিশ্যি আমার পরিজনবর্গ এসে পড়ায় তার স্বাধীনতা কিছু খর্ব হয়ে পড়ল। কিন্তু রাঁধবার ভার সে কিছুতেই ছাড়বে না এবং তার হাতের রান্না খেয়ে এরাও যে-ক'দিন এখানে ছিল বেশ খুশিই ছিল। এখানে এসে গোবিন্দ একেবারে চারখানা হয়ে পড়ল! কোনো বাধা নেই, বলবার বা বারণ করবার কেউ নেই। নিজের ইচ্ছেয় বাজার করে, নিজের ইচ্ছেয় রান্না করে—এমনিভাবেই চলতে থাকল।

এদিকে বৃষ্টি দিনে দিনে বাড়ছে। সঙ্গে সঙ্গে ঠাণ্ডাও বাড়ছে। আপিসে সবাই বলে—বর্ষাকাল পার না হ'লে এখানে কাজকর্ম কিছুই আরম্ভ হয় না। এক-একদিন ভোর থেকেই সাংঘাতিক বর্ষণ শুরু হয়। মেঘগর্জন নেই, আকাশ-অন্ধকার-করা মেঘসঞ্চার নেই, বিনা সমারোহে ঝরঝর ক'রে শুধু ঝ'রেই চলে। এইসব দিনে ধরণী একান্তভাবে আত্মসমর্পণ করে মেঘলোকের কাছে। কাজকর্ম

সব বন্ধ, হাটবাজারও বসে না, ছেলেমেয়েরা ইস্কুল-কলেজে যায় না, দোকানদার দোকান খুলে বসলেও দোকানদারি করে না—কারণ খদ্দের নেই। এইরকম দিনে দ্বিপ্রাহরিক আহারাদি সেরে দরজার সামনে একটি ছোট ইজি-চেয়ার নিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে ব'সে পড়ি—কারণ আপিস থেকে গাড়ি আসবার তাড়া নেই।

চোখের সম্মুখে দৃষ্টি প্রসারিত ক'রে দিই। যতদূর দেখা যায়—ঝমঝম ক'রে জল প'ড়ে চলেছে। রাস্তায় লোকজন তো দূরের কথা—গাড়ি পর্যন্ত চলছে না। একশ' গজ দূরে একটা উঁচু টিলার ওপরে একখানা দু'চালার প্রকাণ্ড খোলার বাড়ি। দূর থেকে মনে হয় দু'দিককার চালা-দু'টো যেন মাটিতে এসেছে —যেন এক বিরাট কূর্ম হাত-পা-মুখ খোলের মধ্যে টেনে নিয়ে সারাদিন বৃষ্টিতে ভিজছে।

উঁচু-নিচু মাঠের মাঝখান দিয়ে সরু একটুখানি সাদা পথ চ'লে গিয়েছে এঁকে-বেঁকে। তারপরে কোথায় হারিয়ে গেছে। পথের কাঁকরগুলো বৃষ্টিতে ভিজে-ভিজে ধবধবে সাদা হয়ে গেছে। দূরে—অনেক দূরে যেন একটা আব্রোয়াঁর পর্দা টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে। তারই ভেতর দিয়ে পাহাড়ের সার দেখা যাচ্ছে আবছায়ার মতো।

মনে পড়ে, প্রথম-যৌবনে বেকার অবস্থায় আমরা কয়েকটি বেকার বন্ধু মিলে কাব্যগ্রন্থ নিয়ে বসতুম। কোথা দিয়ে দিন-রাত্রি কেটে যেত—তা আর হুঁশ থাকত না। কোথায় গেল আমাদের সেই দিনগুলি! অতীতের গর্ভ থেকে স্বরের রেশ কানে এসে লাগে—"এমন দিনে তারে বলা যায়, এমন ঘন ঘোর বরিষায়!"—'কারে' বলা যায়? কৈশোর যৌবন অতীত হয়ে গেছে, মনে পড়ে না—আয়ু চ'লে পড়েছে প্রৌঢ়ত্বের প্রান্তসীমায়। তবুও সেই 'তারে' পাবার আকাঙ্ক্ষায় অন্তর উন্মুখ হয়ে আছে। চিরবিরহী চিত্ত আমার 'তারে'-র দেখা এখনও পায়নি। এই বাসনার বোঝা বুকে নিয়ে দেশ থেকে দেশান্তরে ছুটে বেড়িয়েছি! কত লোক বন্ধু হয়েছে, কত অজানার সঙ্গে চিরপ্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছি; কিন্তু 'তারে' পাবার আকাঙ্ক্ষা অনির্বাণ দীপশিখার মতো অন্তরে জ্বলছে। মনে হয়, হয়তো এ-জন্মে যার দেখা পেলুম না—পরজন্মে তার সঙ্গে দেখা হবে; কিন্তু তখুনি মনে হয়, পরজন্ম কি সত্যই কিছু আছে?

প্রথম-জীবনে যে বিশ্বাস দৃঢ় ছিল, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশই তা শিথিল হয়ে আসছে। কত আপনার জন, আত্মীয়-স্বজন, প্রিয়তম ভাই-বন্ধু চ'লে

গিয়েছে—পরজন্ম যদি থাকত, সেখান থেকে কোনোদিনই কি আমার কাছে আসত না? এমন সংশয়ময় ঘননীল যবনিকা যদি ঘনতর হয়ে ওঠে তবে তো এ-জীবন বৃথাই কেটে গেল। ব্যর্থতার বেদনায় ব্যথিয়ে ওঠে মন—চোখ আপনি বন্ধ হয়ে আসে, তারই মধ্যে অশ্রুও এসে জোটে।…হয়তো এই পরম ক্ষণটিকে সমস্ত সত্তা দিয়ে উপভোগ করছি—এমন সময় গোবিন্দর কর্কশ-কণ্ঠে চট্‌কান ভেঙে যায়—চা এনেছি আজ্ঞে—

চোখ চেয়ে দেখি—ধূমায়মান পেয়ালা হাতে নিয়ে গোবিন্দ দাঁড়িয়ে আছে।

বলি—ওই বড় ইজি-চেয়ারটার হাতলে রাখ—আমি যাচ্ছি।

উঠেই মুখে-চোখে জল দিয়ে চা খেতে বসলুম। বাইরে বৃষ্টি তখনও ঝ'রে যাচ্ছে—ঝর ঝর ঝর।

চা-পানের সঙ্গে সঙ্গে আবার সংসারক্ষেত্রে নেমে আসতে হল। হাঁক দিলুম—গোবিন্দ—গোবিন্দ—

গোবিন্দর দেখা নেই। এখানে এসে অবধি আমার হয়েছে দিনান্তে গোবিন্দ নিশান্তে গোবিন্দ, দিনার্ধে গোবিন্দ, নিশার্ধে গোবিন্দ—

গোবিন্দ ছুটতে ছুটতে এলো—আজ্ঞে—

জিজ্ঞাসা করলুম—এ-বেলা কি পাকাচ্ছ?

গোবিন্দ বললে—আজ্ঞে, এখনও বিষ্টি পড়ছে, বাজার তো বসেনি।

জিজ্ঞাসা করলুম—আটা আছে?

উত্তর হল—আছে।

—আলু আছে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—প্যাজ আছে?

—আছে আজ্ঞে। 'আদা'-ও আছে।

—তবে আর কি আজ্ঞে! আটার লুচি বানাও আর আলুর দম বানাও। তাড়াতাড়ি খেয়ে লেটিয়ে পড়া যাক।

শ্রাবণ মাসের আর ক'টা দিন মাত্র বাকি। এখন বৃষ্টি অনেক কমেছে, তবু মাঝে মাঝে বড় জ্বালাতন করছে। এইরকম একটা দিনে ভোরবেলায় ঘুম ভেঙে দেখি—মেঘ। বেশ জমিয়ে বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে। আমিও চাদর-খানি মুড়ি দিয়ে জমিয়ে আর-একটি ঘুমের জন্য তৈরি হলুম। বোধ হয়

একটু ঘুমিয়েও পড়েছিলুম—এমন সময় গোবিন্দর চিৎকার—উঠে পড়ুন আজ্ঞে, সব্বনাশ হয়েছে।

ধড়মড় ক'রে উঠে বললুম—কি হয়েছে রে ?

গোবিন্দ মেঝের দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললে—এই দেখুন।

চোখ রগড়ে ভালো ক'রে দেখলুম—মেঝেটা একেবারে কালো হয়ে রয়েছে। বাইরের জলধারার সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে ঘরের মধ্যে শুঁয়োপোকার বৃষ্টি হচ্ছে। আর তাদের কী আকৃতি! মধ্যমাঙ্গুলির মতো লম্বা ও সেইরকম মোটা শুঁয়ো-পোকার বর্ষণ হচ্ছে চাল থেকে।

গোবিন্দকে বললুম—শীগ্‌গির ঝাঁটা নিয়ে আয়।

কিন্তু ঝাঁটা আনতে যাবে কি ক'রে? পা ফেলবার জায়গা নেই। বালিশের খোল দিয়ে শুঁয়োপোকা একটু একটু ক'রে সরিয়ে পথ ক'রে গোবিন্দ ঝাঁটা নিয়ে এলো। কিন্তু পরিষ্কার করলে কি হবে, বৃষ্টি একসময় থেমে গেল কিন্তু শুঁয়োপোকার বর্ষণ থামল না।

সেদিন আপিসে গিয়ে সকলকে এ-কথা বলতে তারা বললে—খোলার চালের বাড়িতে বর্ষাকালে ওইরকম হয়। দু'-চারদিন বাদেই থেমে যাবে।

দু'-চারদিন খুবই জ্বালাতন ক'রে শুঁয়োপোকারা নিরস্ত হলেন।

শ্রাবণ-ভাদ্র কেটে গেল। আবার ঝকঝকে আলোয় ধরণী হাসতে লাগল। আমারও কাজের চাপ পড়ল। সকালবেলা উঠেই আপিসে চ'লে যাই, এসেই সন্ধ্যেবেলায় খাওয়া-দাওয়া সেরে বিছানায় ঘুম। বেশ চলছিল। এমন সময় শহরে লাগল 'মায়ের অনুগ্রহ'।

আমাদের মধ্যে কয়েকজনের ওপর মায়ের দয়া হওয়ায় কাজ একদম বন্ধ হয়ে গেল। আবার এগারোটায় যাই, বিকেলবেলায় চ'লে আসি। দিন কাটে তো রাত কাটে না। গোবিন্দকে বললুম—হ্যাঁ রে, বাংলা শিখবি ?

সে জোর ক'রে ঘাড় নেড়ে উত্তর দিল—শিখব।

—তা হ'লে আজই বাজারে গিয়ে একটা সেলেট আর সেলেট-পেনসিল কিনে আনবি।

সেদিন থেকে রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর গোবিন্দকে বাংলা শেখাতে লাগলুম। গোবিন্দ বেশ মেধাবী ছাত্র—আমিও উৎসাহী শিক্ষক।

এমন সময় একদিন—

রাত্রি প্রায় এগারোটা হবে—আমাদের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার কাজ শেষ

হয়েছে—এবার বাতি নিবিয়ে শোবো। গোবিন্দ তার বিছানায় ব'সে, আমি আমার খাটে ব'সে—কালকের রান্না বা কি হবে, তারই কথাবার্তা হচ্ছে—এমন সময় দমাদ্দম ক'রে জানলা-দরজা খুলে গেল। ঘরের বাতিটাও নিবে গেল।

অন্ধকারে ব'সে ভাবতে লাগলুম—কি হল! প্রায় কুড়ি-পঁচিশ সেকেণ্ড বাদে গোবিন্দকে ডাকলুম, কিন্তু গোবিন্দর কোনো সাড়া নেই।

বিজলী-আপিসের কোনো গোলমালের দরুন বাতি নিবল কিনা ভেবে, উঠে গিয়ে সুইচে হাত দিয়ে দেখলুম—সুইচটা বন্ধ করা রয়েছে। বাতি জ্বালিয়ে দিলুম। কিন্তু বাতি জ্বালাবার সঙ্গে সঙ্গে জানলা-দরজা ধমাস ক'রে বন্ধ হয়ে গেল। খাটে গিয়ে বসেছি—এমন সময় আমার সামনের ঘরটায় আলো জ্বলে উঠল। গোবিন্দকে ডাক দিলুম—এই গোবিন্দ—

সে বিছানা থেকে উঠে ধীরে ধীরে এসে আমার খাটটি ঘেঁষে দাঁড়াল। দেখলুম ভয়ে তার মুখ শুকিয়ে গেছে—ঠোঁট কাঁপছে।

বললুম—কি রে, কি হয়েছে?

সে বললে—আজ্ঞে, এ যে দেবতা আজ্ঞে—

বেশ ক'রে এক-পাত্তর কড়া হুইস্কি টেনে গোবিন্দকে জিজ্ঞাসা করলুম—গোবিন্দ একটু খাবি?

সে বললে—না আজ্ঞে।

ওদিকে দরজা খোলা-বন্ধ ও থেকে থেকে আলো জ্বলতে-নিবতে লাগল। গোবিন্দ তার বিছানাটা টেনে নিয়ে এসে খাটে ঠেকিয়ে ব'সে পড়ল। তাকে বললুম—তুমি শুয়ে পড়, আমিও শুয়ে পড়ি। ও-দরজা খোলা-বন্ধ হতে থাক্ আর আলো জ্বলুক-নিবুক, দেখা যাক্ কতদূর কি হয়!

দু'জনে শুয়ে পড়লুম। দরজা কখনো বন্ধ হয়, কখনো খোলে—কখনো জোরে, কখনো আস্তে। শুনতে শুনতে আমি ঘুমিয়ে পড়লুম।

* * *

পরদিন উঠে দেখি বেলা অনেকটা গড়িয়ে গেছে—জানলা-দরজা হাট ক'রে খোলা। গোবিন্দ তখনও ঘুমুচ্ছে দেখে তাকে ঠেলে তুললুম—দেখলুম তার গা বেশ গরম। বললুম—তোর কিছু করতে হবে না—আমিই সব ক'রে দিচ্ছি।

কিন্তু সে মানলে না। উনুন ধরিয়ে চা ক'রে ফেললে। তখনই বাজারে ছুটল। বাজার থেকে মাংস তরি-তরকারি কিনে নিয়ে এসে রান্না চড়িয়ে দিলে।

সেদিন আপিসে গিয়ে গতরাত্রের অভিজ্ঞতার কথা বলা-মাত্র সকলে হো-হো ক'রে হেসে উঠল। কেউ কেউ উপদেশ দিলে—সোডা একটু বেশি খেয়ো। কেউ-বা বললে—নেশার ঘোরে ওরকম মনে হয়।

এই কয়েক দিনের মধ্যেই আমার একটি ডাক্তার বন্ধু জুটেছিল। তাড়াতাড়ি আপিস থেকে বেরিয়ে ডাক্তারের ওখানে গেলুম আড্ডা দিতে। তাকে রাত্রের অভিজ্ঞতার কথা বলতে সে বললে—ওরকম কিছু শুনিনি বটে। তবে ও-বাড়িটা ছেড়ে দাও—ওটা ভালো নয়।

ডাক্তারের ডিসপেনসারি থেকে একটা চার-আউন্স শিশিতে হুইস্কি ভ'রে নিলুম। কম্পাউণ্ডারকে ব'লে শিশিটায় আটটি দাগের কাগজ মেরে নিলুম।

বাড়ি এসে গোবিন্দকে জিজ্ঞাসা করলুম—হ্যাঁ রে, সোডা আছে?

সে বললে—হ্যাঁ আজ্ঞে। দু'টা সোডা এক্ষুনি এনেছি।

আমি তখন বললুম—যা, দু'টো জিঞ্জারেট নিয়ে আয়।

জিঞ্জারেট নিয়ে আসার পর তাকে জিজ্ঞেস করলুম—হ্যাঁ রে, কি খেয়েছিস?

সে বললে—আজ্ঞে, মাংস আর ভাত।

—বেশ ক'রে জ্বরের ওপরে মাংস-ভাত খেয়েছ? রাত্রিবেলার জন্যে খান-কয়েক আটার লুচি বানা, দু'জনেই খাব।

খাওয়া-দাওয়ার পর ব'সে ব'সে গল্প করতে লাগলুম। রাত্রি সাড়ে-দশটা নাগাদ গোবিন্দকে একদাগ ওষুধ এক-বোতল জিঞ্জারেট দিয়ে খাইয়ে দিলুম। মিনিট কয়েক পরে জিজ্ঞাসা করলুম—কিরকম লাগছে রে গোবিন্দ?

গোবিন্দর মুখখানা হাসিতে সমুজ্জ্বল। সে জোর ক'রে ঘাড় নেড়ে বলল—ওষুধটা খুব ভল্ আছে আজ্ঞে।

—দরজা-টরজা সব বন্ধ করেছিস তো?

—হ্যাঁ আজ্ঞে।

প্রেতলোকের ঘড়ি একেবারে সূর্যের বাচ্চা বললেও হয়। ঠিক এগারোটার সময় আবার সেই দড়াম ক'রে দরজা-জানলা সব খুলে গেল—সঙ্গে সঙ্গে ঘরের বাতি সব নির্বাপিত। টর্চটা আগে থাকতেই ঠিক ক'রে রেখেছিলুম। টর্চ জ্বালিয়ে ঘরের বাতি জ্বালিয়ে দিলুম। মুরগির ঘরটা বাইরে থেকেই শেকল দিয়ে বন্ধ ক'রে দেওয়া হ'ত। হঠাৎ ঝনাৎ ক'রে শেকল খুলে দরজাটা খুলে গেল—সঙ্গে সঙ্গে মুরগির পাল ত্রস্ত হয়ে পিক-পিক ক'রে মাঠময় ছুটে বেড়াতে লাগল। বেশ বুঝতে পারা গেল—কে যেন তাদের তাড়া দিচ্ছে। বোধ হয়

মিনিট দু'-তিন এইরকম চলেছিল। তারপর আবার তারা চিৎকার করতে করতে তাদের নিজেদের ঘরের ভেতর গিয়ে ঢুকল। ইতিমধ্যে আমাদের জানলার সশব্দ উত্থান ও পতন চলতে লাগল।

গোবিন্দকে জিজ্ঞাসা করলুম—কি রে, আর একটু ওষুধ দেব?

সে বললে—দিন আজ্ঞে।

তারপরে—মানে, গোবিন্দর ওষুধ-সেবনের পরে আমিও কিঞ্চিৎ ওষুধ সেবন ক'রে গোবিন্দকে বললুম—এবার শুয়ে পড়্।

সে উঠে গিয়ে দরজাটা বন্ধ ক'রে দিয়ে এসে শুয়ে পড়ল। কিন্তু বৃথা, তখুনি আরো জোরে আওয়াজ ক'রে দরজাটা খুলে গেল। দরজা-জানলা-খোলা এবং আলো-জ্বালা অবস্থাতেই আমরা ঘুমিয়ে পড়লুম।

পরদিন আপিস থেকে তাড়াতাড়ি ফিরেছি—গোবিন্দ হন্তদন্ত হয়ে এসে বললে—এই গাছটাতে বেহ্মদত্যি আছে আজ্ঞে।

আমাদের মাঠে কোণের দিকে একটা বড বটগাছ ছিল। গোবিন্দ সেই দিকে তাকিয়ে বলতে লাগল—আজ্ঞে, ওর তলায় ফুল আর এক-বাটি দুধ আজ সন্ধ্যেবেলায় রেখে আসব আজ্ঞে।

গোবিন্দকে জিজ্ঞাসা করলুম—এ সংবাদটি তোমায় দিলে কে?

সে বললে—চাচা দিয়েছে। চাচা বজরুগ লোক। তিনি নিজে দেখেছেন।

—বলিহারি বাপ!—এখানেও চাচা জুটিয়েছ? কোথায় থাকেন তিনি?

গোবিন্দ বললে—হাটের মধ্যে যে দরগা আছে, তিনি সে-দরগার মাতোয়ালী। তিনি আমাকে সস্তায় মুরগি ও ভালো মাখন কিনে দেন। তাঁকে সবাই মানে—কেউ ঠকায় না।

সন্ধ্যেবেলা একটা বাটিতে ক'রে দুধ আর ফুল গোবিন্দ আগেই কিনে এনে-ছিল—আমরা দু'জনে গিয়ে সেই গাছতলায় রেখে এলুম। মনে-মনে বললুম—বাবা ব্রহ্মদৈত্য, একটু নিশ্চিন্তে ঘুমুতে দিও বাবা।

গোবিন্দ তো সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলে।

সেদিন রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পরে গোবিন্দ নিশ্চিন্ত হয়ে সেলেট নিয়ে 'কর খল' ইত্যাদি লিখছে—সাবধানের মার নেই মনে ক'রে সাড়ে-দশটা নাগাদ তাকে একদাগ ওষুধও দিয়েছি, এগারোটার সময় শোবার ব্যবস্থাও হচ্ছে—আবার সেই দড়াম-দড়াম ক'রে দরজা-খোলা আর বন্ধ-করা, বাতি নিবে-যাওয়া

আর জলে-ওঠা, মুরগি মাঠে বেরিয়ে-যাওয়া আর ত্রস্ত হয়ে আবার ঘরে ঢুকে-পড়া ইত্যাদি সমানে শুরু হয়ে গেল।

গোবিন্দকে জিজ্ঞাসা করলুম—কি রে, তোর চাচা কি বলে?

গোবিন্দ জবাব দেবে কি, ভয়ে তার কথা বন্ধ হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি আর একদাগ ওষুধ তাকে দিয়ে বললুম—শুয়ে পড়্, কালই আমরা বোম্বে চলে যাব।

গোবিন্দ বললে—হ্যাঁ আজ্ঞে, তাই চলুন!

সকালবেলা ঘুম ভাঙতেই গোবিন্দ ছুটল মাঠে; একটু বাদে ফিরে এসে বললে—বেহ্মদত্যি-মশাই বাটি-সুদ্ধু খেয়ে ফেলেছেন আজ্ঞে।

তার সঙ্গে তক্ষুনি গিয়ে দেখলুম—গাছের নিচে সত্যিই বাটি নেই।

একটুখানি ভালো ক'রে দেখতেই বেশ বুঝতে পারলুম, কোনো লোক সকালবেলা মাঠে এসে দুধটা গাছের তলায় ঢেলে দিয়ে বাটিটা নিয়ে স'রে পড়েছে।

গোবিন্দকে বাজারে পাঠিয়ে দিয়ে ভাবতে বসলুম—কি করা যায়!

একটু পরেই সে বাজার থেকে ফিরে বললে—চাচা বলেছেন আজ দুপুরবেলায় এসে বাড়িতে মন্ত্র প'ড়ে দিয়ে যাবেন। তিনি বলেছেন যে, এবার সব ঠিক হয়ে যাবে।

অনেকদিন আগে, আমার ওস্তাদের বাড়িতে এইরকম সব উপদ্রব আরম্ভ হয়েছিল, বন্ধ ঘরের মধ্যে ঝরঝর ক'রে ময়লা এসে পড়ত। সেখানেও এক 'চাচা' মন্ত্রতন্ত্র প'ড়ে কি-সব লিখে দেয়ালে কাগজ মেরে দিয়েছিলেন, কিন্তু তাতে কিছুই হয়নি। শেষপর্যন্ত তাদের ও-বাড়ি ছেড়ে চ'লে যেতে হয়। এই কারণে মন্ত্রতন্ত্রের উপর আমার বিশেষ আস্থা ছিল না। যাই হোক, সেদিন দুপুরবেলা আপিসে গিয়ে জানিয়ে দিলুম—দু'-একদিনের মধ্যে যদি আমার জন্যে অন্য বাড়ির ব্যবস্থা না করা হয়, তাহ'লে চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে চ'লে যাব।

এতদিন আমার রাতের অভিজ্ঞতা শুনে যাঁরা হেসেই উড়িয়ে দিতেন, দেখলুম সেদিন তাঁদের অনেকেই আমার কথা শুনে মুখ গম্ভীর করলেন। দু'-একজন এমন কথাও বললেন—ও-বাড়িটার সম্বন্ধে অনেক আগে নানা কথা শুনতে পাওয়া যেত বটে, কিন্তু কিছুদিন থেকে ওসব বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

এইসব মন্তব্য শুনে বেশ খুশি হয়ে ডেরায় ফিরে এলুম। ঘরের মধ্যে ঢুকে ধূপধুনো ও লোবানের গন্ধ পেয়ে গোবিন্দকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলুম—কি রে, গন্ধ কোত্থেকে আসছে?

গোবিন্দ বললে—চাচা এসেছিলেন আজ্ঞে, তিনি নেমাজ প'ড়ে, ওই দেখুন দেয়ালে মন্তর মেরে দিয়ে গেছেন।

সেদিন রাত্রে আহারাদির পরে আশা হল—আজ একটু নিশ্চিন্তে ঘুমোনো যাবে। কিন্তু সেদিন আবার এক নতুন উৎপাত ঘটে গেল।

আমার ঘরের পাশের ঘরটিতে বাক্স-পেঁটরা রাখা ছিল। আমার ট্রাঙ্কটার তলায় দু'টো চাকাও লাগানো ছিল। দেখলুম, পাথরের মেঝে দিয়ে ঘড়াক্-ঘড়াক্ ক'রে স্বয়ংচালিত হয়ে সেটা আমার ঘরে এসে ঢুকল। তারপর শতরঞ্চির ওপর দিয়ে সেইভাবে ঘষড়াতে ঘষড়াতে এসে আমার খাটের সামনে স্থির হয়ে এসে দাঁড়াল। গোবিন্দের দিকে চেয়ে দেখলুম, সে বিস্ফারিত-লোচনে ট্রাঙ্কটার দিকে চেয়ে আছে, অর্থাৎ এর পরে কি হয় বোধহয় তারই দিকে নজর রাখছে। জিজ্ঞাসা করলুম—কি গোবিন্দ, তোর চাচা কোথায়?

ওদিকে চ্যাঁ-চ্যাঁ ক'রে একটা আওয়াজ কানে যেতেই সামনের দিকে চেয়ে দেখি, ওদিককার ঘর থেকে গোবিন্দর টিনের বাক্সটা এগিয়ে আসছে। ডাকলুম —গোবিন্দ—ও গোবিন্দ—

কিন্তু গোবিন্দ হতবাক্। বলা বাহুল্য, গোবিন্দর বাক্স গোবিন্দর সামনে এসে দাঁড়াল। গোবিন্দকে ডেকে তাকে তাড়াতাড়ি এক-ডোজ ওষুধ তোয়ের ক'রে দিলুম। তাকে বললুম—তোর বাক্সটা ঘরের কোণে রেখে দে। আর আমার ট্রাঙ্কটাও ঠেলে ঘরের একপাশে রেখে দে।

কিন্তু তখুনি গোবিন্দর বাক্স গোবিন্দর কাছে আর আমার ট্রাঙ্ক আমার কাছে এসে পড়ল। এইরকম রাত্রি প্রায় বারোটা অবধি ভূতের সঙ্গে খেলা ক'রে সর্বাঙ্গ টাটিয়ে গেল। আবার আমরা এক-এক-ডোজ ওষুধ খেয়ে শুয়ে পড়বার মতলব করছি—এমন সময় দেখি পায়খানা থেকে কমোড্‌টা সুরতে সরতে ঘরের মধ্যে এসে উপস্থিত। অবশ্য অবস্থাটা কমোডে বসবার মতোই হয়েছিল কিন্তু ভরসা ক'রে আর বসতে পারলুম না—কাজেই শুয়ে পড়া গেল।

* * *

তখনো ভালো ক'রে ভোর হয়নি। দারুণ চিৎকারের চোটে আমরা দু'জনেই ধড়মড় ক'রে উঠে পড়লুম। দেখি, আমাদের মাঠের মধ্যে গোটা-দশেক গাধা ঢুকে প্রাণপণে গলা সাধছে। এতদিন ভূতের অত্যাচারে যা না হয়েছে, একদিন গাধার চিৎকারে তা হয়ে গেল অর্থাৎ কিনা আমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। গোবিন্দকে বললুম—গোবিন্দ, বিছানাপত্তর বাঁধ্, বাসন-কোসন তুলে ফেল্। সুদ্ধ এ-বেলা

রাঁধবার জন্তে ছু'-একখানা বাসন বাইরে রাখ্। একটা মুরগি মেরে ঝোল বানা, আর ভাত। আজই আড়াইটার কিংবা সন্ধ্যের গাড়িতে চ'লে যাব।

গোবিন্দ বললে—মুরগি তো নেই আজ্ঞে।

—সে কি রে! অতগুলো মুরগি কি করলি?

—চাচাকে দিয়ে দিয়েছি আজ্ঞে।

—বেশ করেছ আজ্ঞে। তাহ'লে আর রেঁধে কাজ নেই আজ্ঞে। আমরা হোটেলেই খেয়ে নেব আজ্ঞে। একটা গাড়ি ডাক্, এক্ষুনি আপিসে যাব।

গোবিন্দ গাড়ি ডেকে নিয়ে এলে তখুনি বেরিয়ে পড়লুম। তাদের আপিসে গিয়ে জানালুম—আমি আজই চ'লে যাচ্ছি, বাড়ি ঠিক ক'রে আমায় টেলিগ্রাম করবেন—আমি চ'লে আসব।

ওরা বললে—বাড়ি তো ঠিক হয়ে গিয়েছে।

একজন লোককে ডেকে আমাকে আরো বললে—এর সঙ্গে যান। এ আপনাদের নতুন বাড়ির দরজার তালা খুলে দেবে। এ-ক'দিন বাড়িটা ধোয়া হচ্ছিল ব'লে আর আপনাদের জানানো হয়নি।

মনে-মনে ভাবলুম—এখানে সবই ভূতগত ব্যাপার দেখছি।

ফিরে এসে তখুনি গোবিন্দকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে জিনিসপত্তর তুলে নতুন বাড়িতে গিয়ে ওঠা গেল।

দিব্যি বাড়ি—দোতলা। সামনে খানিকটা জায়গায় বাগান। ঘরে ঘরে আসবাবপত্র ঝকঝক করছে। বিশিষ্ট অতিথিদের জন্য দরবার থেকে এই বাড়িটাই নির্দিষ্ট আছে।

ভূতের কল্যাণে এখানেই কায়েমি হয়ে বসা গেল। এখানে ভূতগত নতুন অভিজ্ঞতা কিছু হয়নি বটে, তবে মানুষের জীবনে নিত্যই নতুন অভিজ্ঞতা যা সঞ্চিত হয়ে থাকে তাও কম কৌতুকপ্রদ নয়, কম মর্মন্তুদ নয়।

এবার আমার দ্বিতীয় অভিজ্ঞতার কথা বলি।

এ আমার সেই প্রথম অরণ্যবাসের প্রায় ত্রিশ বছর পরের ঘটনা। আমি তখন এক ভারতীয় নৃপতির রাজ্যে চাকরি করি। সেখানকার নিয়মানুসারে রাজ্যের প্রত্যেকটি উচ্চপদস্থ কর্মচারীকে প্রতিদিনই মহারাজার কাছে সেলাম বাজাতে যেতে হয়।

মহারাজা ও রাজ-পরিবারের মহিলারা আমাকে খুবই কৃপার চক্ষে দেখতেন। তার ফলে রাজ্যের অনেক উচ্চপদস্থ কর্মচারীর বিরাগভাজন হতে হয়েছিল।

এদিকে রাজ-পরিবারের লোকেদের ফাইফরমাশ খাটতে হয় ব'লে দিন-রাতের অধিকাংশ সময়ই রাজপ্রাসাদে কাটাতে হয়। আসল যে-কাজের জন্য নিয়োজিত হয়েছি, সে-কাজ অবহেলিত হয়। কিন্তু রাজ-পরিবারের অনুগৃহীত ব'লে কেউ সাহস ক'রে আমাকে কিছু বলতে পারে না।

একটা ব্যাপার আমি বরাবরই লক্ষ্য ক'রে আসছি যে, চাকুরি-স্থানে মনিব-সম্প্রদায় আমার চালচলন দেখে ও বাক্যিটাক্যি শুনে প্রথমটা খুবই খুশি হন এবং কেন যে আমি প্রায়ই বেকার ব'সে থাকি তার কারণ নির্ণয় করতে পারেন না। এদিকে চাকরিতে ঢুকেই মনিবের নেকনজরে পড়লে সহকর্মীরা যায় চ'টে, তাতে ক্ষেত্র খানিকটা তৈরি হয়ে থাকে। তার পরে মনিবের চোখে আমি নিজেই যত আবিষ্কৃত হতে থাকি—অর্থাৎ আমার অকর্মণ্যতা, আলস্য এবং কাজের প্রতি ঔদাস্য যতই প্রকাশ পেতে থাকে ততই মনিব মনে-মনে চটতে থাকেন। তারপর হঠাৎ একদিন আমার চট্‌কা ভাঙিয়ে সোজা পথ দেখিয়ে দেন। সহকর্মীদের কাছ থেকে একটুখানি সহানুভূতি বা একটা সমবেদনার কথা শুনতেও পাওয়া যায় না। এতাবৎকাল এই চলছিল। কিন্তু এখানে এসে দেখলুম সবই উল্‌টো। কাজের লোকেরা প'ড়ে থাকে সবার পেছনে, কথার লোকেরা যায় এগিয়ে। ইতিপূর্বে দু'টি-তিনটি ভারতীয় রাজ্য সম্বন্ধে আমার কিছু অভিজ্ঞতা হয়েছিল, এখানে তা কাজে লেগে গেল।

আমাদের মহারাজার কোনো বিলাস-ব্যসন নেই বললেই চলে। কাপড়-চোপড়ে তিনি বাবু নন। দেহ বিপুল মোটা। আহার করেন অপরিমিত, তারই ফলে তাঁর দেহযন্ত্রটি একটি চিনির কলে পর্যবসিত হয়েছে। আহার সম্বন্ধে ডাক্তার তাঁকে প্রতিদিনই সতর্ক করেন, কিন্তু কে কার কথা শোনে!

মহারাজার মোটর-গাড়ির শখ। প্রতিবৎসর তিনি ইউরোপ ও আমেরিকা থেকে তাঁর জন্য বিশেষ ক'রে প্রস্তুত গাড়ি আমদানি করেন আর সেইসব গাড়িতে চ'ড়ে, অনেকগুলি রাজকর্মচারীকে সঙ্গে নিয়ে সারা দিন ও সারা রাত্রি সবেগে শহর পরিক্রমা ক'রে থাকেন। দৈহিক যন্ত্রণায় একমুহূর্ত স্থির থাকতে পারেন না। 'চরৈবেতি' শব্দটি এমন নিষ্ঠার সঙ্গে অনুষ্ঠিত হতে ইতিপূর্বে আর দেখিনি।

মহারাজার রাজ্যে পুরুষানুক্রমে বাঘ-সিংহ প্রভৃতি নরখাদক জন্তু পরম স্নেহে

প্রতিপালিত হয়। সে এক আশ্চর্য দৃশ্য! দলে দলে খোলা বাঘ এক-এক খাটে এক-একটি ক'রে থাবা গেড়ে বসে আছে। কারো নাম ভবানীপ্রসাদ, কারো নাম ভবানীশঙ্কর ইত্যাদি। প্রত্যেকের আলাদা চাকর, দিনরাত্রি বাতাস ক'রে চলেছে। গায়ে তাদের মাছিটি বসবার জো নেই। খাটের নিচে বড় বড় গামলা, তারা বসে-বসেই মলমূত্র ত্যাগ করে। এইসব বাঘ আফ্রিকা থেকে বহুমূল্যে সংগ্রহ করা হয়, এদের নাম চিতা। এদের হরিণ শিকার করতে শিক্ষা দেওয়া হয়। এইখান থেকেই শিক্ষিত চিতা ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজারা কিনে নিয়ে যায়। এই বাঘের দ্বারা হরিণ-শিকার একটা দর্শনীয় ব্যাপার। তা ছাড়া সিংহ, ভাল্লুক, এমনকি নানা জাতের বেড়াল পর্যন্ত এখানকার চিড়িয়াখানায় সংগৃহীত হয়েছে। আর হরিণ তো আছেই। এসব কথা লিখতে গেলে আর-একখানি কেতাব হয়ে যাবে।

মহারাজা এইভাবে যে শুধু ঘুরে বেড়ান তা নয়, মধ্যে মধ্যে কারুর-না-কারুর বাড়িতে গিয়ে হানা দেন।

একদিনের কথা বলি।

রাত্রি দ্বিপ্রহর। বিছানায় শুয়ে ঘুমুচ্ছি। হঠাৎ দরজায় যেন ডাকাত পড়ল। ধড়মড়িয়ে উঠে বসলুম। দমাদ্দম দরজা-ধাক্কা চলেছে। তাড়াতাড়ি গিয়ে দরজা খুলে দেখি চার-পাঁচ মূর্তি দাঁড়িয়ে। তাঁরা সকলেই উচ্চপদস্থ কর্মচারী।

শুনলাম, মহারাজা এসেছেন, আমায় ডাকছেন।

কি সর্বনাশ!

তাড়াতাড়ি জামাজুতো প'রে বেরিয়ে দেখি—বাড়ির সামনেই দাঁড়িয়ে আছে এক স্টেশন-ভ্যান। তাঁরা বললেন—মহারাজা ওই গাড়িতে রয়েছেন—চলো। গাড়িতে উঠে গিয়ে দেখলুম, মহারাজা একটা বেঞ্চিতে কাত হয়ে শুয়ে রয়েছেন। একজন কর্মচারী তাঁর একখানি নগ্ন পদ কোলের উপর তুলে নিয়ে পায়ের তলায় জুতো-বুরুশের মতো হাত চালিয়ে যাচ্ছে। আর-একজন পায়ের গোড়ালি থেকে কোমর অবধি দু'হাতে সমান তালে কিল মেরে চলেছে।

মহারাজা আমায় দেখে বললেন—এসো শর্মা, কি করছিলে?

হাত জোড় ক'রে বললুম—আজ্ঞে মহারাজ, একটু বিশ্রাম করবার চেষ্টা করছিলুম।

মহারাজা বললেন—দূর! তার চেয়ে এখানে ব'স। একটু গল্পসল্প করি।

ব'লে, মহারাজা যত-সব আঁায়-বাঁায়-সাঁায় বাজে-কথা—যেমন—কলকাতার লোকসংখ্যা কত, কালীঘাট কলকাতা থেকে কতদূর, আমরা শীগ্‌গিরই তীর্থ করতে যাব কালীঘাটে—ইত্যাদি ইত্যাদি ব'লে চললেন।

মনে-মনে বললুম—মহারাজ! তীর্থাদি করবার যদি ইচ্ছে থাকে তা হ'লে এই বেলা বেরিয়ে পড়ুন। দেহের যে অবস্থা দেখছি—তাতে এর পরে যাওয়া নাও ঘটতে পারে।

ঘণ্টা-দু'-তিন এইরকম সব বাজে-কথায় সময় কাটিয়ে প্রায় ভোরবেলায় তিনি আমাকে ছেড়ে দিলেন।

বাড়িতে ঢুকে বিছানায় শুতে-না-শুতে আবার দরজায় ধাক্কা!

তাড়াতাড়ি উঠে আবার দরজা খুললুম।—একজন রাজকর্মচারী।

তিনি একদম বাড়ির মধ্যে ঢুকে বললেন—দরজাটা বন্ধ করুন।

ভদ্রলোকের কথাবার্তা বলবার ধরন-ধারণ দেখে তো ভড়কেই গেলুম। খানিকটা দম নিয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—মহারাজ এসেছিলেন না?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, মহারাজ ব'লেই তো মনে হল।

—কিরকম কথাবার্তা হল?

প্রশ্ন শুনে পেটের মধ্যেকার সুপ্তপ্রায় ও লুপ্তপ্রায় হুইস্কি ফোঁস-সোঁস ক'রে গর্জে উঠল। কিন্তু তা চেপে গিয়ে বললুম—এইসব নানান কথা আর কি—

—তবু—তবু—

—মহারাজ শীগ্‌গিরই তীর্থ করতে কলকাতায় যাবেন এইসব নানান কথা—

কর্মচারীটি তারপর অনেকক্ষণ ধানাই-পানাই ক'রে অবশেষে আসল কথাটি প্রকাশ ক'রে বললেন—আচ্ছা, আমার কথা কি বললেন?

—কিছুই বলেননি।

কর্মচারীটি আমার কথা বিশ্বাস করল ব'লে মনে হল না। তবু আরো খানিকক্ষণ নানারকম প্রশ্নে আমাকে ব্যতিব্যস্ত ক'রে তিনি যখন বিদায় হলেন তখন ভোরের বাতাস ছেড়েছে।

শুধু মহারাজ নন, রাজমাতা ও মহারাজার ভগিনী—এঁরাও আমাকে খুবই অনুগ্রহ করতেন। 'রাজভগিনী' শুনে আশা করি কেউ স্বপ্নাতুর হবেন না—কেননা তাঁর ঘর নাতি-নাতিনীর কলগুঞ্জনে মুখরিত।

রাত্রিবেলা বাড়িতে ঘুমুচ্ছি, রাজবাড়ি থেকে গাড়ি এসে হাজির। রাজমাতা-মহারাজ ও ভগিনী-মহারাজ তলব করেছেন। হুইস্কির ঢেঁকুর

তুলতে-তুলতে প্রাসাদে গিয়ে উপস্থিত হওয়া গেল। দেখলুম, রাজমাতা ও রাজভগিনী আমার অপেক্ষায় ব'সে আছেন।

আমাকে দেখে খুশি হয়ে রাজমাতা বললেন—এসো শর্মা, কি করছিলে?

—হুজুর, ঘুমোবার চেষ্টা করছিলুম।

রাজভগিনী বললেন—কী ঘুমোবে! এসো গল্প করি।

বসতে-না-বসতেই চায়ের পট ও এক-প্লেট গ্ল্যাক্সো-বিস্কুট এসে হাজির। এখানে পরোক্ষে ব'লে রাখি, যতদিন রাজমাতা ও রাজভগিনী আমাকে প্রাসাদে ডেকে এনেছেন, এই গ্ল্যাক্সো-বিস্কুট ও চা ছাড়া আমার কিছু জোটেনি। অবশ্য অন্য কোনো বিশেষ উৎসব ছাড়া।

প্রাসাদের মনুষ্যের সংখ্যা খুবই কম। যিনি আসল মহারানী তিনি অন্য প্রাসাদে থাকেন। মহারাজা কালেভদ্রে সেখানে যান দেখা করতে।

প্রাসাদে বালক ও বালিকা নামে একপাল ছেলে-মেয়ে মানুষ হয়। রাজমাতা, রাজভগিনী ও উচ্চকর্মচারীর অনুগৃহীত পরিবারের সন্তান এরা। তারা এখানেই মানুষ হয়, এখান থেকেই তাদের বিবাহ হয়। কিছু যৌতুকও পায় জমিদারি হিসাবে এবং এরা যখন বড় হয় তখন রাজ্যের যত কূট ব্যাপার সেইসবে লিপ্ত থাকে। কেউ কেউ অবশ্য উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী'ও হয়।

রাজভগিনী যিনি, তাঁর বিয়ে হয়েছিল অন্য এক দেশের রাজার সঙ্গে। কিন্তু সেখানে স্বামীর সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায় প্রথমে বাপের বাড়িতে, পরে ভাইয়ের বাড়িতে ফিরে এসেছেন এবং সমারোহ সহকারে বাস করছেন। রাজমাতা মধ্যে মধ্যে মেয়ের এই অদৃষ্ট নিয়ে আমার কাছে দুঃখ করতেন। মেয়ের দুঃখে মাতার চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হয়ে উঠতে দেখেছি।

প্রাসাদের কক্ষে কক্ষে কুকুরের দল। তাদের পিতা-প্রপিতামহদের ঠিকানা দরজায় ঝুলছে। পরম সমাদরে তারা প্রতিপালিত হচ্ছে।

প্রাসাদ-সংলগ্ন প্রকাণ্ড বাগানে বড় বড় গাছে উঁচু-নিচু ডালে দামী দামী ভুবন-বিখ্যাত পাখিদের বাসা ক'রে দেওয়া হয়েছে। তারা পুরুষানুক্রমে পুত্রকলত্রাদি নিয়ে নিজস্ব বাসায় বাস করছে। এদের প্রত্যেকের চরিত্রবৈশিষ্ট্য, প্রয়োজন ও অভাব এবং প্রতিদিন তারা বাসায় আসছে কিনা বা এলো কিনা রাজকুমারী নিজে তা জানেন এবং খোঁজ রাখেন।

একদিনের কথা বলি।

শেষরাত্রে প্রাসাদ থেকে জরুরী তলব এলো—এখুনি যেতে হবে সেখানে।

তখুনি যাত্রা করা গেল।

গিয়ে দেখি, প্রাসাদ-সংলগ্ন বাগানে রাজ্যের অধিকাংশ কর্মচারী ছুটোছুটি করছেন। রাজকুমারী ও রাজমাতা উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করছেন। ব্যাপার দেখে আমার প্রথমেই মনে হল—বোধ হয় মহারাজা তাঁর বিরাট দেহটি রক্ষা করেছেন। রাজকুমারী অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে আমায় বললেন—আমাদের একটা মদ্দা ম্যাকৃঅ বাসায় ফিরে আসেনি।

শুনেই আমার বুকের মধ্যে গান বেজে উঠল—"জঙলা পাখি পোষ না মানে শিকলি কেটে উড়ে যায়।"

দেখি মাদী ম্যাকৃঅ-টাকে একটা খাঁচায় ভ'রে রাখা হয়েছে। সে-বেচারী জড়োসড়ো হয়ে অপরাধীর মতো খাঁচার এক কোণে ব'সে রয়েছে। রাজকুমারী চেঁচাতে লাগলেন—সে আসবে, ফিরে আসবে, নিশ্চয়ই আসবে। তবে কিনা দিনকয়েক একটু ফুর্তি-টুর্তি ক'রে নিয়ে তবে ফিরবে।

মাদীটাকে দেখিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম—এটাকে খাঁচায় ভ'রে রাখা হয়েছে কেন?

রাজকুমারী হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন—না হ'লে এটাও যে পালাবে মদ্দার খোঁজে।

রাজকুমারী আকুল হয়ে বলতে লাগলেন—শর্মা, তুমি এক্ষুনি যাও কলকাতায়। সেখানকার টেরেটি-বাজার থেকে এর একটা মদ্দা কিনে নিয়ে এস।

মাথায় বজ্রাঘাত হল—কী সর্বনাশ!

ভয়ে ভয়ে বললুম—মহারাজ, আমি তো পাখি চিনি না, শেষকালে কি হতে কি হবে!

রাজকুমারী বললেন—চেনবার কোনো দরকার নেই।

এই ব'লেই তিনি একজনকে হুকুম দিলেন—এই অমুককে ডাকো তো।

অমুক ব্যক্তি প্রাসাদেই উপস্থিত ছিলেন। তাকে ডেকে বললেন—এর জোড়া মদ্দাটার একটা ছবি এখুনি এঁকে দাও।

সে-ব্যক্তি তখুনি কাগজ-রং-তুলি এনে আমাদের সামনেই ছবি আঁকতে লাগল। ঘণ্টা-খানেকের মধ্যেই ছবি তৈরি হয়ে গেল, দেখলুম মদ্দা ও মাদী পাখিতেও চেহারার অনেক তফাত!

রাজকুমারী আমায় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বুঝিয়ে দিতে লাগলেন—কোথায়

কি রেখা, কোন্‌খানে কি রং, জোয়ান পাখি কতটা লম্বা হবে, মুখ কিরকম হবে, সে চাইবেই বা কিরকম ভাবে—ইত্যাদি ইত্যাদি। আমার মনে হতে লাগল—পক্ষিতত্ত্বে এঁদের জ্ঞান কত গভীর! আরো মনে হচ্ছিল—যিনি বনের পাখিকে এমন ক'রে চেনেন এবং পোষ মানান, একটি মাত্র স্বামীকে তিনি পোষ মানাতে পারলেন না কেন ?

যাই হোক, ভোর হবার আগেই পলাতক ম্যাকৃঅ-র ছবি তৈরি হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে যাত্রার উদ্যোগ হল। আমি কিন্তু সে-যাত্রা কোনোরকমে কাজটা অন্য লোকের ঘাড়ে চাপিয়ে অব্যাহতি পেয়েছিলুম। হপ্তাখানেকের মধ্যেই টেরেটি-বাজারের এক ম্যাকৃঅ প্রাসাদে এসে শিক্ষানবিসি করতে লাগল।

আর একটি কথা ব'লেই এই রাজকীয় ব্যাপারের বর্ণনা শেষ করি।

সেবার গরমের সময় শহরের চতুর্দিকে কলেরা রোগ দেখা দিল। মহারাজা স্থির করলেন—শহর থেকে স'রে অন্যত্র গিয়ে বাস করবেন। রাজধানী থেকে মাইল-পঞ্চাশেক দূরে পাহাড়ের নিচে ছিল বিরাট জঙ্গল। সেখানে লোক চ'লে গেল পাঁচ-সাতটা হাতি নিয়ে জঙ্গল সাফ করবার জন্য। তিন-চার মাইল জায়গা সাফ ক'রে সেখানে দর্মার প্রাসাদ তৈরি হয়ে গেল।

মহারাজা যাবেন, সুতরাং রাজ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসকও চললেন সঙ্গে। ওষুধপত্র, ঘোড়া, প্রিয়পাত্র যত লোক—সবাই চলল মহারাজার সঙ্গে। ক'দিনের মধ্যেই জঙ্গল শহরে পরিণত হয়ে গেল।

নতুন দর্মা-শহরে কারুর কোনো কাজ নেই। সকালবেলা পুরুষেরা উঠে এক-এক পেট খেয়ে ঘোড়ায় চ'ড়ে বেরিয়ে গেলেন শিকারে। জঙ্গল খেদিয়ে শূয়োর তাড়া ক'রে বার করবার লোক আগেই সেখানে পৌঁছে গেছে। ফাঁকা জায়গায় শিকার বেরুতেই বল্লম হাতে শিকারী তাড়া করলেন তাকে।

সে এক উত্তেজনাপূর্ণ ভয়াবহ দৃশ্য। পাহাড়ের ঢাল দিয়ে শূয়োর ছুটেছে নিচের দিকে তীরবৎ, আর তারই পেছনে ঘোড়ায় চ'ড়ে তাকে খোঁচাতে-খোঁচাতে আসছেন শিকারী। ঘোড়ার পা যদি একটু স্খলিত হয় কিংবা জিনের পেটি যদি ছিঁড়ে যায়—কিংবা বামকরধৃত রশ্মি যদি একটু আলগা হয় তাহ'লে শিকারী কোথায় গিয়ে যে পড়বেন তার কোনো ঠিকানা নেই। ওদিকে মেয়েরাও বেরিয়েছেন ঘোড়ায় চ'ড়ে বল্লম হাতে নিয়ে। তাঁরা মারবেন হরিণ—খুঁচিয়ে।

শহর থেকে অনেকদূরে এই জঙ্গল-নগর। এখানে দু'শ' লোকের

আহারের জন্য নিত্য ছাগশিশু যোগানো সম্ভব নয়। তাই সেই ঘোড়ার মতো বিরাট আকারের শম্বর আর হাতির মতো শূয়োর মারিয়ে দু'বেলা সেই দু'শ' লোকের আহার তৈরি হ'ত এবং সেখানকার নিয়ম অনুসারে দু'বেলাই আমাদের সকলকেই মহারাজার সঙ্গে আহারে বসতে হ'ত। কাঁচা শালপাতা জোড়া দিয়ে তাতে অন্ন পরিবেশন করা হ'ত। এই জঘন্য খাদ্য দিনকতক খেয়েই আমার অসুখ ক'রে গেল।

আগেই বলেছি, পুরুষেরা একদল প্রতিদিনই সকালবেলা শিকার করতে যেত। এই শিকারের পর্ব শেষ হলেই আহারের পর্ব শুরু হ'ত। তখন আবার শিকারের গল্পই চলতে থাকত। একদিনের আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল শিকার পালিয়ে-যাওয়া; আর, শিকার হাতে এসে পালিয়ে-যাওয়াটা শিকারীর পক্ষে ছিল অত্যন্ত অসম্মানজনক। তা ছাড়া সেদিন একজন শিকারীর হাত থেকে শিকার ফস্‌কে যাওয়ায় খুবই আফসোস চলছিল, এমন সময় 'বীটার'রা এসে খবর দিলে যে, সেই শূয়োরটা জঙ্গল থেকে বেরিয়ে পড়েছে।

শোনা-মাত্রই যাঁর হাত থেকে শিকার ফস্‌কেছিল, তিনি তড়াক ক'রে লাফিয়ে উঠেই বেরিয়ে গেলেন। বাইরে ঘোড়ারা বিশ্রাম করছিল। তিনি ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে বর্শা-হাতে ছুটলেন সেই শিকারের উদ্দেশে।

ঘণ্টা-খানেক বাদে, খাওয়ার পর্ব তখন মিটে গিয়েছে, লোকেরা শিকার-ক্ষেত্র থেকে একতাল মাংসপিণ্ড নিয়ে এসে উপস্থিত করলে। তার মধ্যে শিকারী, শিকার এবং ঘোড়া, তিনেরই মৃতদেহ জড়িয়ে আছে। সন্ধ্যের মধ্যে শিকারীর দেহ সৎকার হয়ে গেল। তারপর আর তার নামও কেউ করলে না।

রাজা এবং রাজকীয় ব্যাপার সম্বন্ধে এত লম্বা ক'রে বলবার কারণ হচ্ছে—স্বাধীনতা পাবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশে রাজা এবং রাজ্য লোপ পাওয়ায় রাজাদের এইসব খামখেয়ালিপনা—যা গল্পকথার শামিল—ভারতবর্ষ থেকে চিরকালের জন্য অন্তর্হিত হয়েছে। সে-যুগের রাজকথা এ-যুগে রূপকথায় পর্যবসিত। ধনতন্ত্রবাদ অস্তাচলের অভিমুখে এবং গণতন্ত্র-আগমনের আগমনী পূর্বগগনে ধ্বনিত। গণতান্ত্রিক রাজারা যে কী অবস্থায় এসে দাঁড়াবে তার একটু-আধটু প্রমাণও পাওয়া যাচ্ছে।

যে-কথাটি বলবার জন্য এই রাজা ও রাজ্যের গোলকধাঁধায় ঢুকে পড়েছিলুম, তাই ব'লে এখানকার পালা শেষ করি।

আমাদের শহর থেকে কিছুদূরে একটা পাহাড় ছিল। পাহাড়টা বেশী

উঁচু না। মাত্র চারহাজার ফুট। তার মাথাটা বেশ থ্যাবড়া আর পরিষ্কার। চারপাশের লোকেরা এইখানে এই পাহাড়ের চুড়োয় চড়ুইভাতি করতে যেত। আমরাও কয়েকবার সেখানে গিয়েছিলুম।

চমৎকার দৃশ্য সেখানকার। যাবার মতো জায়গা বটে! ওপরে কোনো বসতি নেই, কেবল মহারাজার একটি প্রাসাদ মাত্র। দরকার হ'লে প্রাসাদের বাইরের দিককার দু'-একখানা ঘরও পাওয়া যেতে পারে। সেবার আমাদের বাড়ির সবাই এবং কাছাকাছি আরো দু'টি-তিনটি পরিবার মিলে ব্যবস্থা করলেন—সেখানে গিয়ে একদিন চড়ুইভাতি করতে হবে।

দিন তারিখ ঠিক হয়ে গেল। জিনিসপত্র কেনা-কাটা শেষ। এমন সময় রাজবাড়ি থেকে এত্তেলা এলো—সেইদিনই রাত্রের ভোজসভায় আমায় উপস্থিত থাকতে হবে। ঠিক হল—আমার আর চড়ুইভাতিতে যাওয়া হবে না।

নির্দিষ্ট দিনে রাত্রি চারটের সময় উঠে বাঁধা-ছাঁদা শুরু হয়ে গেল। বলা বাহুল্য, বাড়ির আর-সবাইয়ের সঙ্গে আমিও উঠে তাদের কাজে সাহায্য করতে লাগলুম। আধঘণ্টার মধ্যেই গাড়ি এসে উপস্থিত হতেই সবাই চড়ুইভাতিতে চ'লে গেলেন, আমার আর যাওয়া হল না।

সকলে বিদায় হয়ে যাবার কিছুক্ষণ পরেই, কেন জানি না, আমার মনটা অত্যন্ত খারাপ লাগতে লাগল। মনে-মনে কারণ অনুসন্ধান করতে লাগলুম, কিন্তু কোনো কারণই খুঁজে পেলুম না। বেলা যত বাড়তে থাকে—আমার মনের ভারও ততই বাড়তে থাকে। মনে আশঙ্কা হল—এ কোনো অশুভ ঘটনার পূর্বাভাস নয় তো!

যাই হোক, আহারাদি সেরে কাজে চলে গেলুম। কাজের ভিড়ে সারাদিন ডুবে থাকায় মনের কোনো খোঁজ পাইনি ; কিন্তু বিকেলবেলা বাড়িতে আসবার পর আবার সেই অবস্থায় ফিরে এলুম।

অগত্যা বেশ বড় দেখে একটি পাত্র চড়িয়ে দিলুম। ওদিকে সন্ধ্যে হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই বাড়ির সবাই পাহাড় থেকে ফিরে এলো। মন তখন কতকটা নিশ্চিন্ত হওয়ায় প্রাসাদে যাওয়ার ব্যবস্থায় মন দিলুম।

আমাদের মহারাজা কিছুকাল পূর্বে নিমন্ত্রিত হয়ে অন্য এক রাজার রাজত্বে গিয়েছিলেন। ফিরবার সময় তিনি সেখানকার রাজাকে নিমন্ত্রণ ক'রে এসে-ছিলেন। অনেকদিন পরে সেই রাজা সপারিষদ নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে আমাদের

রাজ্যে এলেন। প্রায় পনেরো দিন ধ'রে পান-ভোজন ও নানা উৎসবের ঠেলায় একেবারে নাজেহাল হয়ে পড়েছিলুম।

আজ উৎসবের শেষরাত্রি।

আজকে বিদায়ভোজের পর কাল তাঁদের যাত্রার পালা শুরু হবে। ভারতবর্ষে এইসব রাজন্যবর্গ ধরাধামে অবতীর্ণ হতেন শুধু মর্ত্যলোকে ইন্দ্রত্ব করবার জন্য। পেয় ও অপেয়, খাদ্য-সুখাদ্য-অখাদ্য-কুখাদ্য, বাছা বাছা দিব্যাঙ্গনা, পশুহত্যা, নরহত্যা, নারীহত্যা, ঘোড়দৌড়, নানাপ্রকার ক্রীড়ামোদ, সুরা, সৌন্দর্য ও সঙ্গীতের মধ্যে জীবনটাকে পুঁতে দিয়ে উত্তরাধিকারীদের স্কন্ধে তাঁদের এইজাতীয় অসম্পূর্ণ কর্তব্যভার চাপিয়ে দিয়ে চ'লে যেতেন অমর্ত্যধামে। এক-একজনের খেয়াল-খুশি ও কল্পনার কুহক চরিতার্থ করবার জন্য লক্ষ-লক্ষ কোটি-কোটি টাকা ব্যয় হয়ে যেত।

ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার পর তৎকালীন শাসনকর্তারা প্রথমেই এই অভিশাপের মূলে কুঠারাঘাত করেছিলেন। দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েও টিকটিকির ল্যাজ যেমন কিছুক্ষণ লাফালাফি করে, তেমনি রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েও কোনো কোনো রাজা কিছুকাল তুরতুর ক'রে লাফালাফি করেছিলেন বটে, কিন্তু ক্রমেই ঠাণ্ডা হয়ে আসছেন। ভবিষ্যতে কোনো ঐতিহাসিক ইংরেজদের প্রশ্রয়ে বেড়ে-ওঠা এই রাজন্যবর্গের কথা যদি লিপিবদ্ধ করতে পারেন তবে তা যে জগতের একটি বিস্ময়কর গ্রন্থ হবে সে-বিষয়ে সন্দেহমাত্র নেই। এখন সে-কথা যাক।

সেদিন আমাকে একটু তাড়াতাড়িই বেরুবার হুকুম করা হয়েছিল। এর কারণ আর কিছুই নয়, সেজেগুজে গিয়ে তাঁদের হুল্লোড়ে যোগ দেওয়া। মহারাজা হাসলে হাসা, মুখ গম্ভীর করলে নিজের মুখ গম্ভীরতর করা, আর বিলিয়ার্ডের টেবিলে অতিবিচ্ছিরি মার-কেও ব'লে ওঠা—মহারাজ, এরকম অদ্ভুত মার খুব কম লোকের হাতেই বেরোয়!

আমাদের মহারাজা একেই তো অসুস্থ, ডায়বেটিস-জনিত গাত্রদাহে দিন-রাত ছটফট ক'রে বেড়ান। তার ওপর এই ক'দিনে অভ্যাগত রাজা এবং তাঁর পারিষদবর্গের সঙ্গে একত্র আহার্য গ্রহণের ফলে ভোজন-ব্যাপারে কিঞ্চিৎ আধিক্য ঘটায় তিনি শয্যা নিয়েছিলেন। কাজেই আজকের ভোজসভায় অতিথি-আপ্যায়নের ব্যাপারে তাঁর নিন্দে যেন না হয় সে-বিষয়ে আমাদের বিশেষ ক'রে সাবধান ক'রে দেওয়া হয়েছিল।

যথাসময়ে টেবিলে এসে বসা গেল। সেদিন টেবিলে কোনো মহিলা ছিলেন না। যখন অভ্যাগত সবাই টেবিলে এসে বসলেন তখন সকলের অবস্থাই ট্যাঁ। অনেককেই বেয়ারারা ধ'রে এনে চেয়ারে বসিয়ে দিল। অনেকেরই পাগড়ি কপালের উপরে ঝুলে পড়েছিল। তুররা প্রায়ই নিম্নগামী।

আমাদের আসল অভ্যাগত যিনি, তাঁর অবস্থাও বিশেষ সুবিধার নয়। আমার আসন নির্দিষ্ট হয়েছিল টেবিলের ল্যাজের দিকে। নিজে বেশ বুঝতে পারছিলুম যে, বিকেল থেকে পাত্র সেবন ক'রে ক'রে আমার অবস্থাও বিশেষ সুবিধার নয়। ছুরি-কাঁটা হাত থেকে ছুটে বেরিয়ে যেতে চায়—এমনই অবস্থা।

অভ্যাগতেরা কিছুক্ষণ চুপ ক'রে খানা খাচ্ছিলেন। ইতিমধ্যে মহারাজা-সাহেবকে চাকরেরা ধ'রে তাঁর ঘরে নিয়ে চ'লে গেল। তিনি চ'লে যেতেই পারিষদদের মুখ ছুটল, প্রথমে আস্তে আস্তে, তারপরে সরবে উচ্চহাস্যে।

মিনিট-দশেকের মধ্যে খানা-কামরা ফুটবলের ময়দানে পরিণত হল।

আমার সামনে মাতালদের রকম-সকম দেখে মনে-মনে হাসছিলুম বটে, এদিকে আমার অবস্থা দেখে যে অন্যদের হাসির উদ্রেক হচ্ছিল তা বোঝবার মতো অবস্থা আমার ছিল না। ঢুলতে ঢুলতে একবার টেবিলে মাথাই ঠুকে গেল। তারপরে কখন যে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেছিলুম তা জানি না।

হঠাৎ চট্‌কা ভেঙে দেখি, আমার দেহের কোমর অবধি টেবিলের তলায় চ'লে গিয়েছে। চেয়ারের হাতল-দু'টো দু'হাতে আঁকড়ে রয়েছি। সম্বিৎ ফিরতেই ধড়মড় ক'রে চেয়ারে উঠে বসলুম। অভ্যাগতদের অধিকাংশকেই টেবিল থেকে চাকরেরা তুলে নিয়ে গিয়েছে। দু'-চারজন এদিকে-ওদিকে যাঁরা তখনও খাবার ভান করছেন অথবা খাচ্ছেন, তাঁদের অবস্থাও বিশেষ সুবিধার নয়। আমি উঠে বসতেই দু'-একজন 'বয়' এগিয়ে এসে আমায় বললে—আপনি তো বসেই ঢুলতে আরম্ভ করলেন। খাওয়া-দাওয়া তো কিছুই হয়নি, কিছু খাবেন?

আমি বললুম—নিয়ে এস তো কিছু খাবার।

বলতে-না-বলতে তারা ব্যবস্থা ক'রে দিলে, আমিও খেতে আরম্ভ করলুম।

খেতে খেতে একবার মুখ তুলে সামনের দিকে চাইতেই মনে হল—আমার দৃষ্টিটা যেন ঝাপসা হয়ে আসছে, কেমন যেন সব আবছায়ার মতন! এই আবছায়ার ভেতর দিয়ে জোর ক'রে দৃষ্টি প্রসারিত করবার চেষ্টা করছি—দেখতে দেখতে হঠাৎ তারই মধ্যে গাছপালা, চষা মাঠ, দূরের পাহাড় ফুটে উঠল।

মনে হতে লাগল—তখনও যেন সূর্যের আলো পৃথিবীতে স্পষ্ট ফোটেনি, স্বচ্ছ সেই প্রতিচ্ছায়ার ভেতর দিয়ে দেখতে লাগলুম, লোকজন ঘুরে বেড়াচ্ছে।

টেবিলে ব'সে কেউ কেউ খাচ্ছেন তখন।

দেখতে দেখতে ধাঁ ক'রে আমার মনে প'ড়ে গেল—এ-যে কৈশোরের সেই অরণ্যভূমি! ওদিকে স্বচ্ছ প্রতিচ্ছায়ার ভেতর দিয়ে দলে দলে অরণ্যবাসী নরনারী শ্রমিকের দল আসতে আরম্ভ করেছে। তারা টেবিলের ওপর দিয়ে সিধে এসে আমার দু'পাশে অদৃশ্য হয়ে যেতে লাগল। সেই নিরন্ন শ্রমিকের দল বহুমূল্য স্বর্ণ ও রৌপ্যপাত্র এবং বিবিধ ভোজ্য ও পানীয়ের ওপর দিয়ে হেঁটে চ'লে আসছে। সবার শেষে দেখলাম আমার সেই অরণ্যমাতাকে। দীর্ঘ কৃশদেহ, জীবনব্যাপী কঠোর শ্রম ও অর্ধ-উপবাসজনিত কঠিন মুখমণ্ডল। দেহের উত্তরার্ধ এবং নিম্নার্ধ প্রায় উলঙ্গ। সম্মুখে দৃষ্টি প্রসারিত, যেন বর্তমানকে উপেক্ষা ক'রে কোন্ সুদূর ভবিষ্যতে সে-দৃষ্টি গিয়ে পড়েছে। মুখে কোনো ভাব নেই, দৃঢ়পদক্ষেপে অগ্রসর হতে হতে আমার কাছে এসে সে-মূর্তি মিলিয়ে গেল।

অরণ্যের প্রতিচ্ছায়া অন্তর্হিত হবার সঙ্গেই আমার নেশা চড়াক ক'রে যেন মাটিতে নেমে মিলিয়ে গেল। আমি চেয়ারে একবার নড়ে-চড়ে ঠিক হয়ে বসলুম। এইমাত্র যে-দৃশ্য দেখলুম, আমার মনে তার প্রতিক্রিয়া হল আতঙ্কমিশ্রিত বিস্ময়। এতদিন ধ'রে যে-কথা মনের কোনো গোপন স্তরে থিতিয়ে প'ড়ে ছিল, হঠাৎ তা এমন অবস্থায় আজ আমার সামনে ফুটে ওঠার তাৎপর্য কি? একটা বেদনাকর অস্বস্তিতে দেহ-মন পীড়িত হতে লাগল।

হয়তো বাইরেও আমার মনের অবস্থা প্রকাশ পেয়েছিল। কারণ একজন 'বয়' এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলে—হুজুর কি কিছু বলছেন?

লোকটি আমার পরিচিত। ইতিপূর্বে রাজবাড়িতে বহুবার তার সঙ্গে দেখাশুনো হয়েছে। আমি তাকে বললুম—দেখ, ড্রাইভারকে আমার গাড়ি নিয়ে আসতে বলো। আমি বাড়ি যাব।

ওদিকে আমার মন সেই অরণ্যের ছবির কথা ভাবছিল, হঠাৎ মনে প'ড়ে গেল—এইখানে একদিন মুমূর্ষু অবস্থায় অরণ্যমাতার জীর্ণ কুটীরে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিলুম। সেখানে তারই সেবায় ও যত্নে প্রাণ ফিরে পেয়ে মনে-মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলুম—এদের কল্যাণের জন্যই আমি আমার জীবনকে উৎসর্গ করব। সেই কথা মনে করিয়ে দেবার জন্যই হয়তো প্রকৃতিদেবী আজকের এই খেলা খেললেন।

সঙ্গে সঙ্গে বুকের মধ্যে হাহাকার ক'রে উঠল—হায়! হায়! জীবনটাকে তো ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়েছি। এতদিন কী ক'রে সেই প্রতিজ্ঞার কথা ভুলে ছিলুম!

ইতিমধ্যে 'বয়' এসে বললে—গাড়ি এসে গেছে হুজুর!

টেবিলে মন্ত্রী-শ্রেণীর একজন উচ্চ-রাজকর্মচারী তখনও ব'সে খেয়ে বাকি সবাইকে সঙ্গদান করছিলেন। আমি তাঁকে ব'লে সিধে গাড়িতে এসে বসলুম।

বাড়ি এসে কাপড়-চোপড় ছেড়ে শুয়ে পড়লুম বটে, কিন্তু চোখে ঘুম কোথায়! মনের মধ্যে তখন দারুণ অন্তর্দাহ শুরু হয়েছে। এ-পাশ ও-পাশ করতে করতে রাত্রি কাবার হয়ে গেল। সকালবেলা শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত, কিন্তু মনের মধ্যে চড়াক চড়াক ক'রে সেই দৃশ্যের কথা জাগতে লাগল।

সে-কথা কাউকে বলবার উপায় নেই। কে আমার কথা বিশ্বাস করবে? সেদিন যারা আমার সঙ্গী ছিল, তাদের মধ্যে পরিতোষ অনেকদিন আগেই লোকান্তরে চ'লে গিয়েছে। কালী কোথায় আছে তা জানি না। তার সঙ্গে অনেকদিনই কোনো সম্পর্ক নেই। নিজের মনকে জিজ্ঞাসা করলুম—এখানকার কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে এই কাজে লেগে যাব নাকি?

কিন্তু মন সঙ্কুচিত হয়ে উঠল। এই প্রশ্নের কোনো সাড়াই পেলুম না। ছেলেবেলার সেদিন আর নেই—যেদিন মনে কোনো কথার উদয় হলেই সম্ভব-অসম্ভব বিবেচনা করিনি, আপদ-বিপদের বা ভবিষ্যতের চিন্তা করিনি।

কিন্তু আজ আর সেদিন নেই। আয়ুসূর্য মধ্যগগন পার হয়ে কবে যে অস্তাচলের দিকে ঢ'লে পড়েছে তার সন্ধান রাখিনি। রোগ-শোক, বিরহব্যথা ও ব্যর্থতায় দেহ ক্লান্ত, মন জর্জর। মনের সে-শক্তি কোথায়, যেদিন চিত্তমরাল স্বচ্ছন্দে, অনায়াসে মানস-সরোবরে কেলি করত! আজ কল্পনার রাজপথ অভিজ্ঞতার কণ্টক-তরুতে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। তার ওপর স্বেচ্ছাঘটিত নানা দায়িত্বে হস্তপদ শৃঙ্খলিত—সযত্নপালিত নানা অভ্যাসদোষে জীবন দূষিত! এ অবস্থায় কি ক'রে নতুন কাজ আরম্ভ করব?

তবুও—তবুও একটা কিছু করবার জন্য মন ছটফট করছিল। সামনেই ছিল আমার মা'র মৃত্যুদিন। আমি শহরে ঢেঁড়া পিটিয়ে দিলুম—সেইদিন আমার বাড়িতে কাঙালীভোজন হবে।

নির্দিষ্ট দিনে নরনারায়ণ-দেবতার সেবা শেষ হয়ে গেলে আমি ও আমার পরিবারের সকলে সেই অন্ন ভাগ ক'রে আহার করলুম।

কিন্তু নিশ্চিন্ত সুখে রাজভোগে থাকা আমার আর সহ্য হচ্ছিল না। আমি কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দিলুম—আমি আর চাকরি করতে চাই না।

মহারাজা আমাকে ডেকে বললেন—তুমি তো বলেছিলে, এই দেশকেই তোমার দেশ বানিয়ে নেবে? কি হল তার? তোমায় আমি জমি দিচ্ছি, বাড়ি তৈরি করবার ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি। এইখানেই থাকো।

আমি চুপ ক'রে রইলুম। আমার জীবনদেবতা হাতছানি দিয়েছেন—আমি জানি, আমার এখানে থাকা আর চলবে না। মনের মধ্যে চড়াক ক'রে ভেসে উঠল ভোজসভার স্মৃতি—বহুমূল্য স্বর্ণ ও রৌপ্যপাত্রে স্তরে স্তরে সজ্জিত বিবিধ সুস্বাদু ভোজ্য ও পানীয়ের উপর দিয়ে চলে যাচ্ছে নিরন্ন শ্রমিকের দল—যাদের সবার পিছনে আছে আমার সেই কৈশোরের অরণ্যমাতা—দীর্ঘ কৃশ-দেহ, জীবনব্যাপী কঠোর শ্রম ও অর্ধ-উপবাসজনিত কঠিন মুখমণ্ডল—দেহ প্রায় উলঙ্গ—দৃষ্টি সম্মুখে প্রসারিত, যেন বর্তমানকে উপেক্ষা ক'রে কোন্ সুদূর ভবিষ্যতে সে-দৃষ্টি গিয়ে পড়েছে।

মনে পড়ল সেই কৈশোরের প্রতিজ্ঞা—এদের অবস্থা—এদের দারিদ্র্য দূর করবার চেষ্টা করতে হবে। এদের নগ্ন অঙ্গে বস্ত্র দিতে হবে। অত্যাচারের বিরুদ্ধে শক্তি জাগিয়ে তুলতে হবে এদের বুকে। কিন্তু কোথায়—মনের কোন্ অতলে তলিয়ে গেল তাদের অস্তিত্ব! তাদের স্থানে কত লোককে ভাই বললুম, কত শয়তানকে আলিঙ্গন করলুম ভাই ব'লে, কত মহৎকে পদাঘাত করলুম শত্রু ব'লে। এমনি ক'রে মানবজীবনের তৃতীয়াংশ ক্ষয় ক'রে আজ জীবন-তরণী চড়ায় আটকে গেল।

আজ এই জাতক লিখতে-লিখতে মনে হচ্ছে, আর কেন। এইখানেই শেষ হোক। জীবনকে দেখলুম, মানুষকে দেখলুম। তবু নরনারীচিত্তে যে আদিম রহস্য আত্মগোপন ক'রে আছে, আজও তার হিসাব শোধ করতে পারিনি। কেউই পারে না। সেইজন্যেই প্রতিটি যুগ আসে নতুন ভাবের ডালি নিয়ে। আজ সর্বসমক্ষে এই কথা ব'লে যেতে পারি যে, প্রান্তরের গান আমার এই জাতকে আমি কোনো কৃত্রিম ঘরবাড়ি বসাইনি। মানুষকে দেখেছি, কিন্তু তাকে সাজাইনি। তার বিষ ও তার অমৃত দুই-ই দু'হাতে ভ'রে নিয়ে সর্বাঙ্গে লেপেছি। কোনো ছেঁদো-কথার জাল ফেলে উড়ন্ত-পাখির ডানা বাঁধতে চাইনি।

সম্মুখ দিয়ে ব'য়ে গেছে জগৎসংসার। তার তীরে ব'সে তৃষ্ণায় আকুল হয়ে কেঁদেছি, কিন্তু সে-তৃষ্ণা মেটাবার পানীয় বাইরে থেকে কোনোদিনই যে

পাওয়া যায় না, এ-কথাও মর্মে মর্মে অনুভব করেছি। এমন সংশয়ও এসেছে—এই-যে অসংখ্য নরনারীর জনতা আজ সামনে দিয়ে চ'লে গেছে, তাদের সঙ্গে সংযোগের সূত্রটি পূর্ব-নির্ধারিত ছিল কিনা! কোন্ যন্ত্রী অলক্ষ্যে ব'সে আমাদের নিয়ে যোগ-বিয়োগের আঁক কষছেন কিন্তু ফল-নির্ণয়ে এখনো পৌঁছতে পারেননি! জীবন তো সে-চক্রীর হাতের কোনো সুপরিকল্পিত কাহিনী নয় যে, ল্যাজ-মাথা এক দড়িতে বেঁধে ড্যাডাং-ড্যাং ড্যাডাং-ড্যাং ক'রে দেহটাকে ঝুলিয়ে নিয়ে যাব!

আজ মোহের কাজল চোখ থেকে অশ্রুজলে ধুয়ে গেছে, তাইতো কোনো তত্ত্বের জ্ঞানশলাকায় এ নেত্রতারকা বিদ্ধ হতে দিইনি। সেই খোলা-চোখে মানুষ-দেখার ইতিহাস এই জাতকে আমি বার বার জন্মেছি—বার বার মরেছি। আমার সেই অসংখ্য জন্ম-মরণের কথাই পাঠকের হাতে তুলে দিয়ে আজ বিদায় নিলুম।